ড. জাকির হোসেন

জাতীয় জীবনী গ্রন্থমালা

ড. জাকির হোসেন

এম. মুজিব

অনুবাদ

পার্থ সরকার

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	....	(vii)
পারিবারিক প্রেক্ষাপটে ছেলেবেলার দিনগুলি	....	11
শিক্ষানবিশীর কাল	....	19
জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া গঠন	....	31
শিক্ষা : ভাব ও ভাবনা	....	54
বুনিয়াদি শিক্ষা প্রসার	....	68
চরম বিপর্যয়ের পথে	....	85
পুরাতন ব্যবস্থা : নতুন ভাবনা	....	102
অন্তবর্তী সময়ে	...	122
মাতৃভূমির ভাবমূর্তি গঠনে	....	131

মুখবন্ধ

তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. ভি কে আর ভি রাও-এর সুপারিশ মতো জাকির হোসেন স্মৃতি রক্ষা কমিটি এই জীবনীগ্রন্থ রচনার দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করেন। জাকির হোসেনের জামাই খুরশিদ আলম খানের কাছে শুনেছি, ড. হোসেন চাইতেন আমি যেন এই কাজটি করি। সাধারণভাবে যে সময় লাগে, এই বইটি লিখতে তার চাইতে বেশি সময় লেগেছে। অন্য কেউ হয়তো আরও ভালভাবে এ কাজ করতে পারতেন। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম। আর এ কাজে আমি যে একেবারে আনাড়ি নই, সে কথা প্রমাণ করতে আমার যতটুকু সামর্থ্য আমি করেছি।

অন্যদের চাইতে আমি ড. হোসেনের বেশি ঘনিষ্ঠ এমন দাবি আমি করি না। তিনি প্রায়শই আমার বিরুদ্ধে তাঁকে এড়িয়ে যাবার অভিযোগ করতেন। তিনি বিশেষ ভুল বলতেন না। তাঁর আলোচনার মান এত উঁচু পর্যায়ের ছিল, অত্যন্ত মামুলি ব্যাপারে তাঁর বিস্ময়কর আগ্রহ, তাঁর প্রগাঢ় উপলব্ধির জন্যে তাঁর কাছে গিয়ে আমি সাধারণভাবে খুব অস্বস্তি বোধ করতাম। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে শিক্ষা প্রশাসন এবং লেখালেখির সমস্ত কাজ করতাম। এ সমস্ত কাজে তিনি আমার ওপর নির্ভর করতেন। কাজই আমাদের সম্পর্কের সেতু 'কাজ'। কাজই আমাদের একসূত্রে বেঁধে রেখেছিল। কাজ ছাড়া তাঁর কাছে কখনও কিছু চাইনি। আমার কাছে তাঁর সাহায্যই যথেষ্ট ছিল।

আমি স্বীকার করছি, প্রাসঙ্গিক অনেক বিষয়ে আমি খুব কঠোর হয়েছি। যে সমস্ত ঘটনা ড. হোসেনের জীবন ও কর্মধারায় প্রভাব ফেলেছে এই বইতে শুধু সেগুলিরই উল্লেখ করেছি। জীবনীগ্রন্থে উল্লেখ করা যায় এমন কয়েকটি ভাষণ ব্যতিরেক আর সব বক্তব্য বাদ দিয়েছি। বইটি যাতে অযথা ভারাক্রান্ত না হয় সেজন্যে ড. হোসেনের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে এমন ব্যক্তিদের অবস্থান ও প্রভাব সম্পর্কে কোনও উল্লেখ বইটিতে করা হয়নি। এজন্যে অনেকে আশাহত, এমনকী ক্ষুব্ধও হতে পারেন। কোনও রকম পার্থক্য করা বা কাউকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া রদ করতে, এটুকু ঝুঁকি তো নিতেই হবে।

গান্ধী স্মারক নিধি, নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম ও গ্রন্থাগার সহ অন্যান্য অনেক সংগঠনের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছি। আমার সহকারী জগন্নাথ সহায় ড. হোসেনের অফিসে কাজ করত। জাকির হোসেনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সে প্রচণ্ড উৎসাহ ও অধ্যবসায় নিয়ে কাজ করেছে। আমার ব্যক্তিগত সহকারী এ এল আজমি, জাকির হোসেনের স্কুল ও কলেজ জীবনের তথ্য সংগ্রহ করেছে। আমার স্টেনোগ্রাফার এম এনাস খুব দ্রুত সুন্দরভাবে সব টাইপ করেছে। তাদের দুজনকে অশেষ ধন্যবাদ।

ড. জাকির হোসেন

আমি ভেবেছিলাম এই জীবনীগ্রন্থের খসড়া পাণ্ডুলিপি আমার কয়েকজন বন্ধুকে তাদের অভিমতের জন্য পাঠাতে পারব। প্রথম দুটি পরিচ্ছেদ পড়েছিলেন আমার ভাই প্রয়াত অধ্যাপক এম হাবিব ও অধ্যাপক কে এ নিজমি। তাদের সমালোচনায় যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি।

পরিশেষে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক ও ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করার জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন হয়েছে তার ব্যবস্থা করে তাঁরা আমার কাজটা শেষ করতে সাহায্য করেছেন।

এম. মুজিব

পারিবারিক প্রেক্ষাপটে ছেলেবেলার দিনগুলি

ভারতের ইতিহাসে পাঠানরা অনেক খারাপ কাজ করেছে। আবার বেশ কিছু ভাল কাজও তারা করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল তাদের বাসভূমি ছিল। খাইবার কুরাম ও বোলান গিরিপথ পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। শত্রুদের হাত থেকে গিরিপথগুলি রক্ষা করা হতো এবং ব্যবসাবাণিজ্যের জন্যে ব্যবহার করা হতো। কোনও শক্তি তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে পাঠনরা গায়ের জোরে তা প্রতিরোধ করত, এমনকী আইনশৃঙ্খলার প্রাথমিক শর্তগুলি মানতেও তারা নারাজ ছিল। যে সময় থেকে ঘটনার লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়, সেই বারোশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে এই ঘটনা চলছে। ক্ষমতা থাকলেই যুদ্ধের সময় দিল্লির সুলতান বা পরবর্তিকালের মোগল সম্রাটরা পাঠানদের স্বায়ত্বশাসনের আকাঙ্ক্ষাকে ধ্বংস করত। কিন্তু তা কিছু কালের জন্যে। যখন বিদেশি আক্রমণের আশঙ্কা নিস্ফলা, নিষ্কর ওই অঞ্চলে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখার মধ্যে যে কোনও একটিকে বেছে নিতে হতো। পাঠানদের সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ এবং বাড়তি জনসমষ্টিকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বাস করার ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি সমাধান পাওয়া গিয়েছিল। পাঠানরা এইভাবে তাদের যুদ্ধের তৃষ্ণা মেটাত। যারা বয়সের ভারে যুদ্ধে যেতে পারত না, তারা নিজেদের উপনিবেশে ফিরে যেত, চাষাবাদ করত, বাগান করত, এবং শিশুদের পাঠানআদর্শে মানুষের মতো মানুষ হবার প্রেরণা দিত। উপনিবেশ যেখানেই হোক না কেন, প্রেরণার জন্যে পাঠানরা জন্মভূমির দিকে তাকিয়ে থাকত। বংশ পরম্পরায় তাদের ভাষা ছিল পুরাতন। তাদের আদি সংস্কৃতি নিয়ে গর্ববোধ করত। হিন্দুস্তানি সংস্কৃতির সঙ্গে পাঠানদের সংস্কৃতির অনেক তফাত। পাঠানরা হিন্দুস্তানিদের নিজেদের সমকক্ষ বলেই মনে করত না।

স্বদেশে পাঠানরা শক্তিমান প্রতিপক্ষের কাছে মাথা নোয়াতে অস্বীকার করলেও, একবার তারা স্বদেশ ছেড়ে এলে যে সরকার তাদের নিয়োগ করত, তার প্রতি তারা একক বা দলগত আনুগত্য প্রকাশ করতে কোনও দ্বিধা করত না। উপনিবেশের জায়গা নির্বাচনে পাঠানদের একমাত্র বিবেচ্য ছিল গ্রামীণ বিক্ষুব্ধ মানুষকে দাবিয়ে রাখা। এ কাজে তারা কখনও ব্যর্থ হয়নি। প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনায় তারা যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছিল। স্থাপত্যবিদ্যায় নিজস্ব ধারা চালু করেছিল। শের শাহ সুরি (মৃত্যু

1545) হুমায়ুনকে ভারতের বাইরে পাঠিয়েছিলেন পাঠানদের সমস্ত গুণের প্রতিনিধিত্ব করতে। হুমায়ুনকে যিনি ভারতছাড়া করেছিলেন, সেই শের শাহ সুরি, যৌবনে পিতার তাঁর প্রতি অবিচারের অভিযোগ আনার ঘটনা বাদ দিলে, তাঁর মধ্যে সমস্ত পাঠান গুণাবলি বজায় ছিল। যুবা বয়সে তাঁর প্রতি পিতার অবিচারের অভিযোগ ছাড়া তিনি ছিলেন দক্ষ রাজনীতিবিদ। তাঁর সময়ের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজন সম্পর্কে তাঁর সম্যক ধারণা ছিল। বিচার ছিল অত্যন্ত কঠোর। সৌন্দর্যবোধ ছিল অগাধ। স্থাপত্য-সৃষ্টিতে তাঁর ক্ষমতার রূপ সৌন্দর্য হয়ে উঠত।

যাই হোক যুদ্ধ, প্রশাসন, জমিদারির ব্যবস্থাপনা পাঠানদের সব শক্তি নিঃশেষ করতে পারেনি। শরীরের উত্তাপ কমাতে রক্তপাত স্বাস্থ্যবান যুবকদের স্বাভাবিক আচরণ ছিল, যদিও এতে তাদের মেজাজ ঠাণ্ডা হতো না। দোষ ধরতে ওস্তাদ, বদলাও নিত বেপরোয়াভাবে। পণ্ডিত বা সাধু ব্যতীত যে কোনও দুর্বল চিত্তের শান্ত স্বভাবের মানুষ দেখলে তারা বিরক্ত বোধ করত। প্রতিটি পাঠান উপনিবেশেই আগ্রাসী মনোভাব প্রকট ছিল। ব্যক্তিগত ও সংগঠিত দাঙ্গায় মাঝেমধ্যে তা প্রকাশ পেত। জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা সহ শান্তির বাতাবরণ পাঠানদের কাছে ছিল অকল্পনীয়। মোগল বাজ খান নামে এক পাঠান সর্দার 1930 সালে পঞ্জাব রাজ্য পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য ছিলেন। লাহোরে এসে প্রথম প্রথম রাতে তিনি ঘুমোতে পারতেন না। আক্রমণকারীকে সতর্ক করার জন্যে রাতে বন্দুক ছুড়তেন শূন্যে। সশস্ত্র প্রহরীরা তাঁর বাড়ির চারপাশে ঘোরাঘুরি করত। লাহোরের সরল সিধাসাধা আপাত শান্ত পরিবেশে তাঁর দম ফেলাতে কষ্ট হতো।

পাঠানরা অকপট ছিল এবং সৎ আচরণকে শ্রদ্ধা করত। কথার খেলাপ করত না, 'নমকের' প্রতি এদের অগাধ আনুগত্য। নিজের গোষ্ঠী-বন্ধু ও উপকারীর প্রতি আনুগত্য পাঠান পুরুষকারের নিদর্শন। তাদের আতিথেয়তার কোনও মাত্রা ছিল না। বলা হয়, পাঠানবাড়িতে কোনও অতিথির আগমন হলে গৃহকর্তা একটা লাঠি, এক পেয়ালা জল, কিছু টাকা ও একটি হুকো নিয়ে দরজা খুলতে যাবে। অতিথির যা প্রয়োজন—ধূমপান, নগদ অর্থ, পানীয় জল অথবা লড়ায়ের অস্ত্র, তা সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে। পাঠানরা বিনোদনে প্রচুর খরচ করত। সংকীর্ণতাকে প্রতিহত করত। শত্রুর চক্রান্তকে স্বাভাবিক ভাবত কিন্তু গুপ্তচক্রান্তে বিরক্ত বোধ করত। একজন পাঠান কি ধাতের মানুষ তা সারা পৃথিবীকে জানাবার বাসনা তাদের আচরণে প্রকাশ পেত। আত্মপ্রকাশের জন্যে কেউ ভুল পথ গ্রহণ করলে সকলে দুঃখবোধ করত।

অকারণে অতীতকাল ব্যবহার করা হয়নি। প্রাচ্যের অধিকাংশ মানুষের মতো পাঠানরাও তাদের অতীত সম্পর্কে বিভোর ছিল। অধিকন্তু যারা স্থায়ীভাবে ভারতে এসেছিল তারা একদিকে তথাকথিত শান্তির বাতাবরণে, ক্রমশ তাদের উগ্রতা হারিয়ে ফেলেছিল, অন্যদিকে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হতো। ক্ষয়রোগ তখন মহামারীর আকার

ধারণ করেছিল। তাই পাঠানদের সম্পর্কে অতীত ক্রিয়াই ব্যবহার করতে হয়। নাগরিক হিসাবে তারা অন্য যে কোনও জাতি গোষ্ঠীর মতোই ভদ্র। নিজেদের পৃথক সত্তা বজায় রাখার ইচ্ছা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে আঘাত করত না। একথা 1947 সালের আগে বা পরে যারা ভারতে এসেছে তাদের সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হিন্দু ও মুসলিম পাঠানদের মধ্যে তফাত এটুকু যে, হিন্দুরা মুসলিমদের মতো বিপজ্জনক জীবন যাপন করত না।

ফারুক্কাবাদ জেলার কাইমগঞ্জ শহরকে আদর্শ পাঠান-উপনিবেশ বলা যায়, 1713 সালে মহম্মদ খান বানগাস এর পত্তন করেছেলে কাইম খানের নামে নামকরণ করেন। এখানকার বেশির ভাগ মানুষ আফ্রিদি সম্প্রদায়ের। অধিকাংশ পরিবারকে সীমান্ত অঞ্চল থেকে এখানে বাস করার আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসা হয়। হাসান খানের পরিবার এই রকম একটি পরিবার। হাসান খান সঙ্গে এনেছিলেন তাঁর ভাই হুসেন খানকে। মাদহ আসন বা প্রাজ্ঞ শিক্ষকরূপে পরিচিত ছিলেন হুসেন খান। ড. জাকির হোসেনের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষ তিনি।

1713 থেকে 1900 সালের মধ্যে কাইমগঞ্জ, সময়ের সঙ্গে তাল রেখে পালটে গেছে। মূল পেশা ছিল সামরিক বিভাগের চাকরি এবং অবসরের পর জোতজমির দেখভাল করা। শিক্ষার প্রচলন ছিল। সুফি ও ফকিররা যে তাত্ত্বিক শিক্ষার কথা বলত, তার প্রতি শ্রদ্ধাও ছিল। বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে কোনও জ্ঞান ছিল না, অধিকাংশ মানুষই স্থানীয় বিষয় নিয়ে কলহে মেতে থাকত। নিজেদের উন্নতি বজায় রাখা বা বাড়াবার জন্যে চিরাচরিত পন্থা ব্যতীত অন্যও কোন প্রচেষ্টা ছিল না। ধনসম্পত্তি ও পার্থিব সম্মানের চাইতে আত্মসম্মানকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। উগ্রতা নানা ধরনের রূপ নিত। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে কাইমগঞ্জে মানু খান বাস করত। গায়ের জোরে সে নিজের এবং আশেপাশের উপনিবেশগুলিকে আতঙ্কিত করেছিল। প্রশাসন ও ব্রিটিশ পুলিশ তার কিছু করতে পারেনি। সে সব রকম অপরাধ করত। সমস্ত তথ্যপ্রমাণ লোপ করে নিখুঁতভাবে কাজ হাসিল করত বলে, কোনও বিচারালয়ে তার কোনও শাস্তি হতো না। যে যখন বাজারের রাস্তায় হাঁটত তখন সমস্ত দোকানদার উঠে তাকে সেলাম জানাত। ট্রেনে করে কোথাও যাবে বললে স্টেশনমাস্টারকে তার অপেক্ষায় ট্রেন আটকে রাখতে হতো। মানু খান একটি চরম ঘটনা ছিল। কিন্তু সাধারণভাবে পাঠানরা অপরাধের গুরুতর বিচার করত না, যে ঘটনা অপরাধ সংঘটিত করতে প্ররোচনা দিয়েছে সেই ঘটনার বিচার করত। একটা গল্প আছে, ডোলি[1] করে যাবার সময় এক মহিলা বাইরে উকি দিয়েছিলেন। তাই দেখে একজন পুরুষ তার গুলেল[2] থেকে তীর ছোড়ে মহিলার একটি চোখ নষ্ট

1. পালকি
2. দুই তার বিশিষ্ট ধনুক, গুলি খেলার জন্যে ব্যবহার করা হয়।

হয়ে যায়। সেই মহিলার প্রতি কেউ সহানুভূতি দেখায়নি। পর্দানসীন থাকার আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি দেবার জন্যে সবাই সেই পাঠানকে বাহবা দিয়েছিল। ড. জাকির হোসেনের পিতামহ গোলাম হোসেন খান দেখেন একটি লোক তার পুকুর থেকে মাটি তুলছে। কয়েকবার বারণ করা সত্ত্বেও সেই লোকটি কথা না শোনায়, গোলাম হোসেন খান তাকে ছুরি মারেন। একজন দুর্বিনীত লোককে সঠিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে বলেই তাঁর পাঠান প্রতিবেশীরা মনে করেছিল।

আমাদের প্রাচীন সামাজিক জীবন নিয়ে বহু নাটক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা হয়েছে। পাঠান সমাজ থেকে সংগৃহীত উপাদান ছিল মূল বিষয়বস্তু। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠান মায়েদের নমনীয়তা বাড়ত, যা ছিল কঠোর পাঠান মেজাজের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই চিন্তাধারা প্রকাশ পেত তাদের চরিত্রের মধ্যে। গোলাম হোসেন খান ছিলেন সৈনিক, রেগে গিয়ে একজনকে ছুরি মারতে পারতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও গরিব ও সাহায্যপ্রার্থীদের প্রতি তিনি সদয় ছিলেন। শোনা যায় মহল্লার বিধবাদের জন্যে তিনি বাজার করে দিতেন। কাইমগঞ্জের সুফি কারাম আলি শাহর শিষ্য গোলাম হোসেন খান ওয়াদা-আল-উজুদ ও সুলহে কুল[3] মতবাদের হিন্দু প্রবর্তক বংশবিহারিরও ভক্ত ছিলেন। পাঠানদের চিরাচরিত জীবনধারা থেকে তাঁর ছেলে ফিদা কাইমগঞ্জের ওয়াদা-আল-উজুদ মতবাদের প্রবর্তক কারাম আলি শাহর শিষ্য হয়েও, গোলাম হোসেন খান সুলহে কুল মতবাদের প্রবর্তক বংশবিহারিরও ভক্ত ছিলেন। হোসেন খানের মুখ ঘুরিয়ে থাকাটা তাই অস্বাভাবিক ছিল না।

ফিদা হোসেন খানের বেশি সম্পত্তি ছিল না। সামন্ত, প্রভু হিসাবে তাঁর বিশেষ গুরুত্বও ছিল না। কুড়ি বছর বয়সে 1888 সালে তিনি হায়দ্রাবাদে (দাক্ষিণাত্য) চলে আসেন। বছর খানেক মোরাদাবাদে পিতলের ব্যবসা করেন। তারপর বন্ধুর কাছ থেকে আনা বই পড়ে উৎসাহিত হয়ে তিনি আইন পড়তে শুরু করেন। পড়াশোনায় তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি দেখান এবং কিছুদিনের মধ্যে আওরঙ্গাবাদে ওকালতি শুরু করেন। আইনজীবীর সাফল্য তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তিনি হায়দ্রাবাদ হাইকোর্টের রায়গুলি প্রকাশ করতে শুরু করলেন এবং এই কাজের আর্থিক লাভ কি পরিমাণ বুঝতে পারলেন। তিনি হায়দ্রাবাদের বেগমবাজার অঞ্চলে জমি কিনে দোতলা বাড়ি তৈরি করেন। এই বাড়ির নিচের তলায় ছাপাখানা পাঠাগার এবং অফিসঘর ছিল। দোতলায় নিজেরা বাস করতেন। নিজের আইনি-প্রতিবেদন প্রকাশ ছাড়া তিনি অনেক আইন বিষয়ক বই প্রকাশ করেন। বলা যায় আইনসাহিত্যে হায়দ্রাবাদ শহরে তার অবদান সবচেয়ে ছিল

---

3. বাস্তব পৃথিবীর বৈচিত্র্যের মধ্যে ভগবানের ঐক্য নিহিত আছে—এই বিশ্বাস। সকলের জন্য শান্তি ঐক্যের এই মতবাদ আকবরের আমলে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিলো।

বেশি। উনচল্লিশ বছর বয়সে 1907 সালে যখন তিনি মারা যান তখন সন্তানদের শিক্ষার জন্যে অনেক ধনসম্পত্তি রেখে যান।

অন্য পাঠানদের মতো আঠারো-উনিশ বছর বয়সে ফিদা হোসেন বিয়ে করেন নি। এই ঘটনা ফিদা হোসেন খানের চারিত্রিক গঠনের ইঙ্গিত দেয়। তেইশ বছরে যখন তিনি আওরঙ্গাবাদে ওকালতি করছিলেন, তিনি বিয়ে করেন। তার স্ত্রী বেগম নাজনিনের খুব কন্যা সন্তানের শখ ছিল। শখ হিসাবে এটি খুবই অস্বাভাবিক। ভাগ্য তাকে সাতটি পুত্র সন্তান দিয়েছিল। সবচেয়ে বড় ছিলো মুজফ্‌ফর হোসেন, জন্ম 1893 সালে। নম্র স্বভাব ব্যক্তিত্বময় মুজফ্‌ফর ভায়েদের কলহ থামাতেন এবং তাদের মধ্যের শান্তি ও শুভেচ্ছার মানসিকতা গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। এক উজ্জ্বল জীবনের শুরুতেই যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান দুই পুত্র ও এক কন্যা রেখে। দ্বিতীয় পুত্র আবিদ হোসেনও আলিগড়ে পড়াশোনা করার সময় যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তৃতীয় পুত্র ড. জাকির হোসেন। চতুর্থ সন্তান জাহিদ হোসেন এবং পঞ্চম সন্তান জাফর হোসেন যৌবনের প্রাক্কালে ওই একই রোগে মারা যান। ষষ্ঠ ও সপ্তম ভ্রাতা ড. ইউসুফ হোসেন এবং ড. মেহমুদ হোসেন আজও জীবিত এবং সম্মানীয় পদে অধিষ্ঠিত।

নজর লেগে যেতে পারে এই ভয়ে, নাজনিন বেগমের কাউকে ছেলেদের সংখ্যা বলতেন না। একই ভয়ে তাদের জন্ম নথিকরণ করা হয়নি। জন্মদিন পালন করাও হতো না। এজন্যেই ড. জাকির হোসেনের জন্মতারিখ নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। 1907 সালের 8 ডিসেম্বর তিনি এটাওয়ার ইসলামিয়া হাইস্কুলে ভর্তি হন। স্কুলের খাতায় দেখা যায় তাঁর বয়স তখন দশ বছর এক মাস। চার বছর পর স্কুল পরিদর্শক এফ. জে. মর্স পূর্বোক্ত তারিখ বাতিল করে নতুন তারিখ ঠিক করে দেন, ফলে তার বয়স দশ মাস বেড়ে যায়। এই সংশোধনীর কারণ জানা নেই। এমন হতে পারে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ন্যূনতম বয়স না থাকার জন্যে তাঁর বয়স বাড়াতে হয়েছিল অথবা প্রথমে দেওয়া তারিখে কিছু তথ্যগত বিভ্রান্তি ছিল। স্কুলে নথিপত্র ঘাঁটা অত্যন্ত বিরক্তকর বলেই ড. জাকির হোসেন পাসপোর্টে তাঁর জন্মতারিখ লেখেন 24 ফেব্রুয়ারি 1897, পরে জন্মদিন নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বিরক্ত হতেন: 'তুমি আমায় দেখতো পাচ্ছ। আমি নিশ্চয় জন্মেছি। আমি মনে করি এই জানাই যথেষ্ট।' কিন্তু সরকারিভাবে তাঁর জন্মদিন মর্সের দেয়া তারিখটি।

মাত্র দশ বছর বয়সে তাঁর বাবা মারা যান। 1911 সালে[4] কাইমগঞ্জে তাঁর মা মারা যান প্লেগ রোগের মহামারিতে। এইজন্যে ড. জাকির হোসেন তার বাবা মায়ের

---

4. তাঁর অসুখের সময় পরিবারের লোকেরা, তিন ছেলেকে যাদের মধ্যে দুজন আলিগড়ে এবং জাকির হোসেন এটোয়ায় পড়াশোনা করছিল; বাড়ি আনতে চাইছিল। পড়াশোনা ব্যাহত হবে বলে তিনি তা হতে দেননি।

কথা খুব বেশি মনে করতে পারেন না। কিন্তু তিনি আমায় বলেছিলেন যে হায়দ্রাবাদের প্রচলিত প্রথার জন্যে তিনি পায়ে হেঁটে কোথাও যেতে পারতেন না। এমনকী রাস্তার বিপরীত দিকে আত্মীয়দের বাড়ি যাবার জন্যে গাড়ি চড়তে হতো। কাইমগঞ্জে ছবিটা ছিল ভিন্ন। তাছাড়া বাবার মৃত্যুর পর তাঁদের অবস্থাও খারাপ হয়। তাঁর কাইমগঞ্জের প্রত্যাবর্তন প্রাচুর্য থেকে আচারনিষ্ঠ জীবনে ফেরার তুল্য। এই পরিবর্তন বোঝার পক্ষে জাকির হোসেন তখন খুবই শিশু। ছোটভাই জাহিদকে সামলানো ছিল তখন তার প্রধান কাজ। কোনও ভুল না করার জন্যে তিনি বাল্যকাল থেকেই সচেষ্ট। সমবয়সী বন্ধু এবং বড়রা আর তাকে মান্য করবে না, এই আশঙ্কা তাঁর হতো। জাহিদ হোসেন ছিলেন কলহপ্রিয়, আধিপত্যকারী প্রকৃতির। গায়ে যথেষ্ট জোর ছিল। জাকির হোসেনকে একদিকে তাঁর স্নেহপ্রবণ নম্রস্বভাব ও অন্যদিকে জাহিদের আক্রমণাত্মক মেজাজের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার কথা ভাবতে হতো। গায়ের জোরে নয়, বুদ্ধিবৃত্তির তিনি ওপর বেশি আস্থা রাখতেন। বড়ভাই মুজফ্‌ফর হোসেন তাঁকে খুব ভালবাসতেন। জাহিদ নিজের হাতে আইন তুলে নেবে এমন আশঙ্কা সব সময় থাকত।

বড় হলে সব ভাইকে এটোয়ার ইসলামিয়া উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি করা হলো। মৌলবি বসিরউদ্দিন আবাসিক এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। কঠোর ইসলামিক জীবন ও ইংরাজি সাহিত্য শিক্ষার মিশ্রণে তিনি বিশ্বাস করতেন। 1888 সালে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। তার আচার-আচরণ ছিল খুব গোঁড়া। প্রার্থনার সময় হাজির থাকতে হবে, ছোট করে চুল ছাটতে হবে, মোটা জামাকাপড় পরা, শক্ত বিছানায় শোয়া এবং সর্বোপরি নিম্নমানের খাওয়া প্রভৃতি নিয়ম মানা অল্পবয়সীদের পক্ষে খুব কঠিন ছিল। জাকির হোসেন পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। অভিজাত মুসলমান পরিবারের রীতি অনুযায়ী তাঁকে বাড়িতে পড়ানো হয়েছিল। চার বছর চার মাস চার দিন বয়সে একটি শিশুকে বিসমিল্লাহ[5] আবৃত্তি করতে হতো। গৃহকর্তার সামনে কোরান পাঠ করতেও হয়েছিল। আরবির বর্ণ পরিচয় শেখা এবং কোরান পাঠ করার জন্যে 'বাগদি প্রাইমার' দিয়ে শিক্ষা শুরু হতো। যখন বেশ কয়েকটি অধ্যায় বা পুরো কোরান পড়ানো হয়ে যেত তখন পার্শি শিক্ষা শুরু হতো। এই বিষয়ে বেশ কিছু ভাল বই আছে। উর্দু সব শেষে পড়ানো হতো। এই ক্রমপর্যায়ে মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশ ও মুসলিমরা কোন পথে ভারতে এসেছিল তা তুলে ধরে।

নিয়ম মেনে চলার জন্যে স্কুলে জাকির হোসেনের খুব খাতির ছিল। তিনি নিয়মিত প্রার্থনায় হাজির থাকতেন এবং সব রকমের বিবাদ বিসম্বাদ এড়িয়ে চলতেন।

---

5. সর্বশক্তিমান, মহান ঈশ্বরের নামে।

স্কুলে পাঠান ছাত্ররা অনমনীয় ও অবাধ্য ছিল। তিনি তাদের সঙ্গে ছিলেন না আবার তাদের বিরুদ্ধেও ছিলেন না। মধ্যপথে চলতেন। সহপাঠী ও শিক্ষকদের আস্থা অর্জন করেছিলেন। বিতর্ক ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় স্কুলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে তাঁকেই মনোনীত করা হতো। বক্তা হিসাবে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেন। সব শিক্ষকের, বিশেষ করে প্রধান শিক্ষক মৌলবি আলতাফ হোসেনের খুব প্রিয় ছিলেন। তিনি জাকির হোসেনের মেধা ও সম্ভাবনার কথা বুঝতে পেরেছিলেন সেজন্য তাকে সঠিকভাবে উৎসাহ দিতেন। খ্যাতনামা কেউ স্কুলে পরিদর্শনে আসলে তাঁকে অভর্থ্যনার দায়িত্ব দেওয়া হতো জাকির হোসেনকে। স্বাগতভাষণও দিতেন তিনি। একবার আলিগড় থেকে একজন কলেজ শিক্ষক স্কুলে এসেছিলেন। তাঁর বিষয় ছিল আরবি, কিন্তু কোনও দাড়ি ছিল না। স্বাগতভাষণে জাকির হোসেন অতিথির প্রতি সম্মান দেখিয়ে দাড়ি কামাবার গুণগুলি নিয়ে আলোচনা করেন।

জাকির হোসেনের মা তাঁকে বড়দের সম্মান করতে শিখিয়েছিলেন। এজন্যে তিনি নম্র, বিনয়ী ও বাধ্য হয়েছিলেন। ছাত্র ও স্কুল কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রায়স বিরোধ বাঁধত। ছাত্রদের বক্তব্য সঠিক মনে করলে সেই বিরোধে তিনি ছাত্রদের পক্ষালম্বনে দ্বিধা করতেন না। মোটা জামাকাপড় ও শক্ত বিছানা ছাত্ররা সহ্য করছিল। কিন্তু অস্বাদু অল্প আহার তাদের চঞ্চল করে তুলেছিল। সবচেয়ে খারাপ ছিল পাঁচটি প্রার্থনার কোনও একটিতে গরহাজির হলে শাস্তি হিসাবে খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হতো। একবার অনেক ছাত্রকে একসঙ্গে এই শাস্তি দেওয়া হয়। গুরুতর গণ্ডগোলের আশঙ্কা ছিল। জাকির হোসেনকে মধ্যস্থতা করতে বলা হয়। তিনি স্কুল কর্তৃপক্ষকে বোঝান ছাত্রদের খাওয়া বন্ধ করা বেআইনি। ছাত্ররা খাবারের জন্যে পয়সা দিয়েছে। এর ফলে, এই শাস্তি দেওয়া কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করে দেন। ছাত্রদের তিনি সংগঠিত করেছিলেন এবং নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। তাদের যৌথ আন্দোলনের ফলে স্কুল কর্তৃপক্ষ নীতি পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছে দেখে ছাত্ররা খুশি হয়েছিল। বিবদমান দুই পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং শিক্ষণীয় সমাধান আবিষ্কারের এটাই ছিল জাকির হোসেনের প্রথম প্রচেষ্টা।[6]

জাকির হোসেন মানসিকভাবে খুবই সতর্ক ছিলেন। ইসলামি বিশ্বের আন্দোলন ও ঘটনা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট প্রতিবেদনশীল ছিলেন। এই সময় ট্রিপোলিটন ও বলকান যুদ্ধ চলছিল। তুরস্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভারতীয় মুসলিমরা বিক্ষুব্ধ ছিল। একজন স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইয়োরোপীয় আগ্রাসনের প্রতিবাদ জরুরি বলে

---

6. মৌলবি ফায়েজ খান (জন্ম 1988) এ খবর দেন। তিনি শিক্ষকতা করতেন। ছাত্রাবাস ও রসুইখানার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন 1910 থেকে 1920 পর্যন্ত।

তাঁর মনে হয় এবং সহপাঠীদের তিনি সে কথা বলেন। যত দ্রুত সম্ভব যুদ্ধের খবর জানার উৎকণ্ঠায় তিনি রেল স্টেশনে ছুটে যেতেন পাইয়োনিয়ার পত্রিকা সংগ্রহের জন্যে। পত্রিকা নিয়েই সহপাঠীদের পড়ে শোনাতেন। স্থানীয় মসজিদ শুক্রবারের প্রার্থনার পর তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন এবং তুরস্ক সাহায্য তহবিলের জন্যে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। একবার সাহায্য সংগ্রহের প্রাক্কালে সমবেত উপাসকদের উদ্দেশ করে তিনি বলেন, তাদের দানের পয়সা বুলেটে রূপান্তরিত হবে এবং ইসলামের শত্রুর বুক ঝাঁঝরা করে দেবে। একথা শুনে এক বৃদ্ধ কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং তার সর্বস্ব জাকির হোসেনকে দিয়ে দেন।[7]

1911 সালে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় ছাত্রজীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা সম্পর্কে তিনি প্রবন্ধ লেখেন। যে চিন্তাভাবনা তার জীবনে প্রতিষ্ঠা এনেছিল সেই চিন্তাভাবনার সূচনা এই লেখা থেকেই।

'সন্দেহ নেই শিক্ষিত সকলের জীবনেই একটি লক্ষ্য আছে। কেউ ডাক্তার হতে চায়, কেউ আইনজীবী, কেউ সরকারি চাকুরে। সাধারণভাবে বলা হয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো ধনী হওয়া। এই লক্ষ্য শুরু থেকেই ছাত্রের চাইতে তার বাবা-মায়ের মাথাতেই বেশি থাকে। প্রতিটি ছাত্রের কতর্ব্য হচ্ছে পড়াশোনা করা যাতে সে বাবা-মাকে সাহায্য করতে পারে। এ কথা ঠিক যে মানুষের ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য জাতীয় সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু শুধু বড়লোক হবার জন্যে বা ভাল খাবারের জন্যে পড়াশোনা করা ছাত্রজাতির পক্ষে অপমানকর। একজন ছাত্রের পড়াশোনার অর্থ, ভাল জামাকাপড় পরা, গাড়ি চড়া, সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে করমর্দন বোঝায়, তাহলে তাকে আর ছাত্র বলা যায় না। সংক্ষেপে, বড়লোক হওয়া একজন ছাত্রের জঘন্যতম লক্ষ্য বলেই বিবেচিত।

'ধনী হওয়া একজন ছাত্রের যেমন সঠিক লক্ষ্য নয়, তেমনি ছাত্রদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ পরিত্যাগ করা উচিত। আরামপ্রিয় জীবনের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে, বিশেষভাবে ছাত্রদের, উন্নতির পথে বাধা দেয়।

'এতক্ষণ আমি সংক্ষেপে বলতে চেয়েছি ছাত্রদের জীবনে কি লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। এখন আমি একজন ছাত্রের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে বলব। সে কথা বলার আগে ছাত্রের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করা অবান্তর হবে না নিশ্চয়।

'ছাত্র অর্থে আমরা বুঝি সেই মানুষ যে তার বর্তমান অবস্থার উন্নতি ঘটাতে চায়, সাধ্যমতো নিজের কর্মক্ষমতা বাড়াতে চায়, কয়েকশো লোকের হাজার হাজার বছরে সঞ্চিত জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে মণিমুক্তা আহরণ করতে চায়, সূক্ষ্ম জ্ঞান, উন্নত

7. আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় গেজেট (খণ্ড 1 সংখ্যা 13-16, 1957 সাল) : হবিবুর রহমানের প্রবন্ধ।

চেতনা, প্রজ্ঞা যা সম্পর্কে তার কোনও ধারণা নেই অথচ জীবনে যুক্তিবাদী পথে চলতে গেলে যা তার প্রয়োজন তার অধিকারী হতে চায় সেই ব্যক্তিই ছাত্র। পার্থিব জগতে এই সচেতনতাই তাকে চালিত করে।

'ছাত্র হতে গেলে ভাল, মন্দ, উপকারী, অপকারী, কি চাইতে হবে, কি বর্জন করতে হবে প্রভৃতি বোঝার বুদ্ধি থাকা দরকার। সে নিজের মধ্যে মূল্যায়ন ও চিন্তা করার শক্তি সৃষ্টি করবে। জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ যা কিছু পেতে পারে সেই সব কিছু পাবার জন্যে সে সচেষ্ট হবে। কিন্তু সে অন্যের ওপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারবে না বা জীবনে কোন উন্নতি করতে পারেবে না যদি না জীবনের দুঃসময়ে যে নৈতিক মান ধরে রাখতে সচেষ্ট হয়। নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে গুরুত্ব দিয়ে যে পালন করতে না পারে, তাকে ছাত্র বলে ডাকা সম্ভব নয়। সে অকর্মণ্য এমন বোধ যেন তার মধ্যে না জাগে। এমন ধারণা হলে সে কিছুই করতে পারবে না। সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করে যাওয়া উচিত। যদি সে এই কাজ করতে পারে, তবে সে নিজের প্রচেষ্টায় সফল হবেই।

'তোমার আশাগুলিকে উঁচুতে তুলে ধরো ভগবান-মানুষের সামনে। তোমার সম্মান তোমার আকাঙ্ক্ষার মতো উঁচুতে উঠতে পারে।'

'একজন ছাত্রের জীবনের লক্ষ্য হবে কুসংস্কার ও মোহ ত্যাগ করা, সংকীর্ণতা পরিহার করা। তার অশিক্ষিত ভাইদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানো। শিক্ষা বিস্তারকে নিজের শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। জ্ঞানের জন্যে তাকে জ্ঞানার্জন করতে হবে, জীবনের প্রয়োজন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে না। এ সমস্ত প্রয়োজন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলে পরিবারের ভার বহন করতে পারবে না অথবা মানবজাতির প্রয়োজনে আসবে না। শিক্ষিত না হলে এই পৃথিবীতে সে কোনও কাজের কাজ করতে পারবে না। মনুষ্য নামের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।'

বিদ্যালয় ছেড়ে যাবার প্রাক্কালে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মৌলবি বসিরউদ্দিন জাকির হোসেনকে নৈশ ভোজে আমন্ত্রণ করেন। মৌলবি বসিরউদ্দিন যা শেখাতেন, নিজেও তা অনুসরণ করতেন। ঘরে আসবাবপত্র বলতে একটি দড়ির খাট ছিল। মৌলবি তার ওপর বিশ্রাম নিতেন আবার কাজকর্মও করতেন। জাকির হোসেনকে তিনি ওই খাটে বসার জায়গা করে দেন। তাঁকে শুধু মাংস খেতে দেওয়া হয়েছিল। মৌলবি তার মধ্যে জল ঢেলে দেন। জাকির হোসেন ব্যাপারটি খুব স্বাভাবিকভাবে নেন। বিস্বাদের কোনও অভিব্যক্তি প্রকাশ না করে মাংস খেয়ে নেন। খাওয়া শেষ করার পর মৌলবি বলেন, তিনি খাবারে জল মিশিয়ে ছিলেন এ কথা বোঝাতে যে, একজন জীবনে সব সময় যেন সুখের আশা না করে। তাঁর মতো সম্ভাবনাময় যুবক যেন একথা সর্বদা মনে রাখেন।

জাকির হোসেন 1913 সালে মহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজে (বর্তমানে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে) ভর্তি হন। 1957 সালের 24 জানুয়ারি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে তাঁর ছাত্র জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। ওই ভাষণে তিনি নিজের ছাত্রজীবনের মূল্যায়নও করেন।

'চুয়াল্লিশ বছর আগে যেদিন প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে আসি, সেই দুপুরের কথা বারবার মনে পড়ছে। আমার সময় যে শতাধিক ছাত্র ভর্তি হয়েছিল, তাদের তুলনায় আমার পরিচিতি বেশি ছিল কেননা আমার দুই দাদা তখন এখানকার ছাত্র। তারা এখানকার পরিবেশ ও রীতিতে অভ্যস্ত ছিল। আমি নতুন এসেছিলাম। বিকালে আমার এক দাদা আমাকে এক জোড়া জুতো, কিছু বই এবং একটি লণ্ঠন কিনে দেয়। আমরা শহরে হেঁটে গিয়েছিলাম। কিন্তু ফিরে এসেছিলাম এক্কা গাড়িতে। হাতে করে জিনিস বয়ে নিয়ে আসা ভদ্রলোকের মর্যাদা বিরোধী। ছাত্রাবাসে তার ঘরে আমায় পৌঁছে দিয়ে দাদা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে যায়। যাবার সময় বলে যায়, সূর্যাস্তের পর ঘণ্টা বাজলে আমি যেন রাতের খাবার খেতে যাই। একটু তাড়াতাড়ি ঘণ্টা বেজেছিলো। ষোলো বছর ধরে আমি টুপি কোট মোজা জুতো না পরেই খেতে অভ্যস্ত। এই সমস্ত পরতে আমার কিছুটা দেরি হয়ে গেল। আমি কি করব? আমি জুতোর ফিতে পরাতে পারছিলাম না। যতবার পরিয়ে টান দিই ততবার পুরে ফিতেটাই খুলে বেরিয়ে আসে! সেদিন বিকালেই দাদা আমাকে শিখিয়েছিল কেমন করে জুতোয় ফাঁস পরাতে হয়। বিহ্বলতায় আমি তা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম। বারবার চেষ্টা করতে করতে সেই কৌশল মনে পড়ে যায়। এত কিছুর পর আমি যখন জামাকাপড় পরে তৈরি হলাম, তখন যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। আমার সহপাঠীরা সবাই খেতে চলে গেছে।

'মুহূর্তের ভুলে জীবনের রাস্তা অনেক দীর্ঘায়ত হয়।'

'আমি ভোজনকক্ষ চিনতাম না, এদিক-ওদিক ঘুরে মরছিলাম। বেশ কিছু সময়ের ব্যর্থ চেষ্টার পর অবাক হয়ে দেখলাম ঘুরে-ফিরে আমি আমার ঘরের সামনেই হাজির হয়েছি। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। দাদার দেওয়া নতুন ঘড়িতে সময় দেখলাম। এর আগে স্কুলের ঘড়ি অথবা সূর্যের অবস্থান দেখে আমি সময় ঠিক করতাম। ঘড়িতে দেখলাম মাত্র আট মিনিট দেরি হয়েছে। আর এই আট মিনিট আমার অজ্ঞাতসারে কেটে গেছে। নিজেকে বোঝার চেষ্টা করেছি, লক্ষ্য খুঁজেছি, দিকের ভুল হয়েছে, চেষ্টা করতে সর্বত্র ব্যর্থ হয়েছি।

'শুধুমাত্র ঘড়ির কাঁটা দিয়ে সময় মাপা হয় না। মাপার অঙ্গ হিসাবে ব্যক্তির অবস্থানকেও বিচার করতে হয়। কখনও কখনও আশা নিরাশার কয়েকটি মুহূর্ত

একজনের কাঁধে পাহাড়ের মতো চেপে বসে। সত্যের অন্বেষণে, মহৎ কিছু করার তাড়নায়, দৃষ্টির স্বচ্ছতায়, সৎ কাজে জীবনপাতের আকাঙ্ক্ষায় মানুষের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবটাই চলে যায়। কখনও কখনও উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করে জীবন শেষ হয়। যাক, ফিরে আসি আমার অভিজ্ঞতায়। আট মিনিটে আমি যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানেই ফিরে এসেছিলাম। নিম গাছের কাছে যে ঘরটা ছিল তার সামনে কয়েকটি খাট পড়ে ছিল। আমি তার একটার ওপর বসে পড়লাম। এই সময় আমার বন্ধুরা ফিরে আসতে শুরু করল। কেউ হাত ধরাধরি করে, কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে বলতে, কেউ হাসতে হাসতে, কেউ চুপচাপ। বোঝা গেল খেয়ে দেয়ে ফিরে আসতে নয়-দশ মিনিট সময় লেগেছে। অন্য কোথাও না হলেও খাবার ব্যাপারে সামরিক শৃঙ্খলা বজায় ছিল। খাবার জন্যে বেশি সময় নষ্ট করা অসভ্যতা বলে বিবেচিত হতো। রান্নাঘরের দায়িত্বে যারা ছিল তারা খাবার টেবিলে বেশি সময় নষ্ট করার সুযোগ দিত না।'

এর পরে যা বলা হয়েছে তাকে স্বীকারোক্তি বলা যেতে পারে। জাকির হোসেন দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টায় বক্তব্য রাখার যে বিশেষ রীতিতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন সেইভাবে পরোক্ষ এবং সুপ্ত ইঙ্গিতে কথাগুলি বলা হয়েছে। যার ফলে খুব মুষ্টিমেয় কয়েকজন, যারা আগেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতেন, তারা ছাড়া অন্য কারও পক্ষে সে ইঙ্গিত ধরা সম্ভব ছিল না। অন্যেরা বাক্‌চাতুর্যে অবাক হয়ে যেত। তাদের অবস্থা আমেরিকান কবি এমিলি ডিকসনের ভাষায় : 'আনথিংকিং ড্রামস্—জড়ভরত।'

'সে দিনের ঘটনা এত বিশদভাবে আমি কী করে মনে করতে পারছি? সম্ভবত আমার জীবনের পরবর্তী চুয়াল্লিশ বছরের সূচনা সেইদিনই হয়েছিল যে-সময়ে আমার জীবনের অনেক কিছুই বদলে যায়। ব্যতিক্রম শুধু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। এই সম্পর্ক আমার মনের গভীরে জায়গা করে নিয়েছে। কোনও কিছুই এ যোগসূত্র নষ্ট করতে পারে না। আমি এখানে অনেক কিছু শিখেছি, আর অনেক কিছু না শিখতে পারার জন্যে অনুতপ্ত হতেও শিখেছি। জীবনে অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করার প্রেরণা আমি এখান থেকেই পেয়েছি। এখানেই আমি মত ও পথের পার্থক্য সত্ত্বেও, সহযোগিতা করে কাজ করতে শিখেছি। এইখানেই আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। আমাদের জাতীয় জীবন ও চরিত্রের দোষত্রুটি, জানতে পেরেছি দেশবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষার কথা। অপরিণত বুদ্ধি, অধৈর্য এবং সন্দেহপ্রবণতার জন্যে অনুতপ্ত হতেও শিখেছি। এখানেই আমি শুকনো পাতায় আগুনের মতো দপ করে জ্বলে উঠতে শিখেছি, আবার কয়লার ছাইচাপা আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলতেও শিখেছি। জীবনের ঝড়ঝাপটার বিরুদ্ধে কোনও কাজ নিশ্চিতভাবে করার বিচক্ষণতা আমি এখানে অর্জন করেছি। বসন্তের পত্ররাজির মতো দ্বিধাগ্রস্ত, সলাজ প্রবণতাগুলির বিকাশ এবং সামাজিক জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত মোকাবিলা করে

ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো এখান থেকেই শিখেছি। এখানেই আমি প্রথম অনুভব করি একাকীত্ব ও সংসর্গের শিক্ষামূলক ও গঠনমূলক গুণগুলি। এখানেই আমি মান্য করতে ও বাধ্য হতে শিখি। আমি এখানেই বড়দের, সমবয়সীদের, ছোটদের এমনকী নিজেকেও সম্মান করতে শিখি। নম্রতা ও আনুগত্য বোধ থেকেই এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আইনগুলি সচেতনভাবে মেনে চলতে শিখেছি। কিন্তু যখনই আমার বিবেক দংশনের সঙ্গে আইনের সংঘাত বাঁধত, জীবনের মূল্যবোধ আমাকে বিদ্রোহ করতে প্রেরণা দিত। আমি বিদ্রোহ করি। আমি বহিষ্কৃত হই। জীবনের পঁচিশটা বছর ব্যয় করে আমি আর একটা শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলি কিন্তু আমার হৃদয়ে নিজের শিক্ষাকেন্দ্র সম্বন্ধে কোনও তিক্ততা ছিল না।'

জাকির হোসেনের ছাত্রজীবনের অনেক দিক ছিল। স্বল্প পরিসরে তা বর্ণনা করা শক্ত। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অধ্যাপক রশিদ আহমেদ সিদ্দিকির বিবরণে জানা যায় তিনি ছিলেন হাসিখুশি দায়িত্বজ্ঞানহীন যুবক। অকপট মনের আড়ালে ছিল বুদ্ধির প্রাচুর্য। তাঁর পরিহাসপ্রিয় কথাবার্তা, খামখেয়ালি আচরণ চারপাশের পরিবেশকে প্রাণচঞ্চল করে তুলত। একদিন খাওয়ার সময় তিনি বন্ধুদের কাছে তিন মিনিট আগে খাওয়া শুরু করতে চেয়েছিলেন। বন্ধুরা সোচ্চারে অসম্মতি জানিয়েছিল, কারণ তারা জানত জাকির হোসেন শুরু করলে তাদের আর খাওয়া হয়ে উঠবে না। এক সন্ধ্যায় দেরি করে তিনি ঘরে ফেরেন। ভীষণ খিদে পেয়েছিল তাঁর। ঘরে আর কিছু না পেয়ে কক্ষ-সঙ্গীর লুকিয়ে রাখা এক বোতল মাজুন[৪] খেয়ে নেন পরিণাম না ভেবেই। সব সময় তিনি কিছু করেছেন বা বলছেন। সব সময় তরতাজা। অধ্যাপক সিদ্দিকির দেওয়া বিবরণ জাকির হোসেনের চরিত্রের একটি দিক মাত্র। বিদগ্ধ ব্যক্তি হিসাবে তাঁর বিভিন্ন দিক ছিল। সিডনস্ ছাত্র ইউনিয়নের সভায় তিনি প্রায়শ হাজির থাকতেন, বেশ কয়েকবার ভাষণও দিয়েছেন। 1917 সালে এই ইউনিয়নের সহ সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি সুবক্তা ছিলেন। প্রতিপক্ষের দুর্বলতা খুব সহজেই ধরতে পারতেন এবং নাটকীয়ভাবে সেই দুর্বলতা ব্যবহার করতেন। সুবক্তা হওয়ার জন্যে তাঁর অনেক অনুরাগী ছিল এবং অবশ্যই বেশ কিছু শত্রুও তৈরি হয়েছিল। বক্তৃতা মঞ্চ ছিল তাঁর সাহস এবং বুদ্ধিবৃত্তির ধারক যেমন অন্তরঙ্গ বন্ধুরা ছিলেন তাঁর সামাজিক গুণের বাহক। সমালোচনা ও বিরোধিতা হলে তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁর আধিপত্য বিস্তার করতেন। একবার তাঁর বিরোধীরা রটিয়ে দেয় যে, ইউনিয়নের বিতর্ক সভায় উপস্থাপন করার জন্যে তিনি বক্তব্য মুখস্থ করে এসেছেন। তিনি অনুরাগীদের হতাশ করে প্রস্তাবটি আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করে বলেন, বিরোধীদের বক্তব্যের পর তিনি তাঁর যুক্তি তুলে ধরবেন। শেষে বিরোধীদের তোলা সমস্ত যুক্তি

---

৪ ইউনানি টনিক। জেলির মতো মোটা। মিষ্টি স্বাদ। কামোদ্দীপক।

নস্যাৎ করে তিনি সমস্ত শ্রোতাকে নিজের দিকে টেনে আনেন। গোটা সভা হাততালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে।

জাকির হোসেন স্কুল পরীক্ষায় তিনবার প্রথম হয়েছিলেন। তিনি সাহিত্য অনুরাগী ছিলেন। 1915 সনে বিজ্ঞান বিষয়ে ইণ্টারমিডিয়েট পড়ার সময় উর্দু মাসিক পত্রিকা 'অল নাজিরে' তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন। অধ্যাপক ব্রাউনের *A Year Among the Persians* বইয়ের সংক্ষিপ্তসার ছিল প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু। 1917 সালে ভারতে মুসলিম শিক্ষার ওপর প্রবন্ধ লিখে তিনি 100 টাকা পুরস্কার পান। দুবছর পর তিনি ইকবাল পদক ও সরকারি মেধা-ছাত্রবৃত্তি পান। এই সময় তিনি প্লেটোর 'রিপাবলিক' অনুবাদ করতে শুরু করেন। কিন্তু আমার মনে আছে স্কুল-কলেজের শিক্ষাগত বিষয় নিয়েই তিনি শুধু কথা বলতেন। পরীক্ষাকে কখনও তিনি গুরুত্ব দিতেন না। তিনি আমায় বলেন যে স্কুল কলেজের পরীক্ষার সময় তিনি পড়াশুনায় খুবই ভাল এমন এক সহপাঠীর কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ের ওর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সহ খাতাগুলি নিয়ে আসতেন। সাধারণভাবে তিনি ওই বন্ধুর[9] চেয়ে ভাল ফল করতেন। ভেবে নেওয়া যেতে পারে তিনি ওই বন্ধুর কাছে যাচ্ছেন, অকপটে নিজের অবহেলার কথা বলছেন, বন্ধুর প্রচেষ্টা ও আগ্রহের প্রশংসা করছেন এবং ব্যর্থতার দায় থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে বন্ধুর অনুগ্রহ কামনা করছেন। সম্ভবত তিনি আরও ভালভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারতেন যদি ওই নোটগুলি না পড়ে তিনি বন্ধুর কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা শুনতে পেতেন। তাঁর মেধা, প্রয়োজনীয় অংশ বুঝে নেবার ক্ষমতা, সঠিক উত্তর দেবার পদ্ধতিও ভাষা দেখে যে কোনও পরীক্ষকেরই ধারণা হতো অধীগত বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান আছে।

রেডিয়োতে 'কেমন ভাবে আমি শিক্ষক হলাম' বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন নিজস্ব কায়দায় : 'পিছু ফিরে দেখলে আমি মনে করতে পারি, বাল্যকাল থেকেই আমি শিক্ষক হবার স্বপ্ন দেখতাম। আমার প্রথম অনভিজাত প্রেম। ছোটবেলার আকাঙ্ক্ষা সব সময় অন্তর-সহজ্ঞাত হয় না। হঠাৎ কোনও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তখন বাসনা হয়, আবার হঠাৎ করেই তা হারিয়ে যায়। আমার এক দাদা প্রথমে আমাকে ইঞ্জিনিয়ার পরে চিকিৎসক তৈরি করতে চেয়েছিলেন। আমার কাকা চাইতেন আমি বাবা-কাকার মতো আইন নিয়ে পড়ি এবং ওকালতি করে জীবন কাটাই। ওদের ইচ্ছা পূরণ হলে আমি এতদিন বিশ্রী ধরনের বাড়ি তৈরি করতে এবং নিজের সঞ্চয় বাড়াতে ব্যস্ত থাকতাম। অথবা; গরিব দুঃস্থদের নিজের সাধ্যমতো চিকিৎসা করতাম অথবা, তাদের দুঃখদুর্দশাকে আমার ব্যাঙ্কের সঞ্চয় বাড়াতে ব্যবহার

---

9. প্রয়াত অধ্যাপক হবিবুর রহমানের। মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় গেজেট (vi, 13-16, 1957)। শিক্ষক কলেজ আলিগড়ের অধ্যক্ষরূপে তিনি অবসর নেন।

করতাম। মন্দকে যুক্তির জালে ভাল প্রমাণিত করে আদালতের কৌশলে বড়লোক হয়ে ওঠার সমস্ত ধান্দায় মেতে উঠতাম। তা যখন হয়নি, আমি বলতে পারি সেই ছেলেবেলায় শিক্ষক হবার বাসনা ছিল আমার প্রধান শিক্ষকের[10] প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ। যা কিছু মহৎ তার প্রতিভূ হিসাবে তাকে দেখতাম। আমি তখন জানতাম না ওই ইচ্ছাই ছিল একটা আহ্বান যা অগ্রাহ্য করা যায় না। জীবনের চাহিদা এত বেশি নয় যে তাতে সাড়া দেয়া যায় না।

জাকির হোসেন ডাক্তারি পড়ার জন্যে ইন্টারমিডিয়েটে বিজ্ঞান নিয়ে পড়েন। কিন্তু, লক্ষ্ণৌ ক্রিশ্চিয়ান কলেজে বি.এস.সি ক্লাশে ভর্তি হবার পূর্বে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর পড়াশোনা এক বছর ব্যহত হয়। তারপর তিনি আলিগড়ের এম.এ.ও. কলেজে ভর্তি হন, কলা বিভাগে যোগ দেন। এম.এ পড়ার সময় তিনি অর্থনীতি[11] নেন। অর্থনীতি বিষয়েই গবেষণা করে জার্মানি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। অর্থনীতিবিদ নন, শিক্ষক হিসাবেই তিনি খ্যতি অর্জন করেন। আর বেশি না জানার জন্যে অসন্তুষ্টি তাঁর মধ্যে জন্মেছিল পরবর্তিকালে। বহুমুখী মনের কাছে এটাই স্বাভাবিক। কারণ তাদের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা কখনও তৃপ্ত হয় না।

তাঁর শিক্ষার অন্যদিকটাও উপেক্ষা করা যায় না। ছুটিতে বাড়ি গিয়ে দেখতেন হাসান শাহ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। হাসান শাহ একজন সুফি পরিব্রাজক ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। তাঁর পার্থিব জিনিসপত্র এবং বইপত্রগুলি বাঁকের দুই প্রান্তে ঝুলিয়ে বাঁক কাঁধে নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর বই কেনার সামর্থ্য ছিল না। অথচ যে সমস্ত বই তিনি ধার করতেন তার মধ্যে বেশ কয়েকটি নিজের কাছে রেখে দেবার ইচ্ছা হতো। জাকির হোসেনের ছুটির সময় তিনি কাইমগঞ্জে থাকতেন। জাকির হোসেনের কাছে এসে খুব নম্রভাবে একটা বই নকল করে দিতে বলতেন। জাকির হোসের হাতের লেখা ছিল খুব সুন্দর, পার্শি ভাষায় জ্ঞান উন্নত হয়েছিল, সুফি মতবাদ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছিলেন।

আমার বক্তব্য নির্ভুল এ কথা বলছি না, কিন্তু আমি মনে করি হোসেনের কলেজ জীবনের বন্ধুত্বও অবিমিশ্র আর্শীবাদের ছিল না। বিতর্ক বা নির্বাচনে বন্ধুরা তাঁকে সমর্থন করতেন। তাঁর সঙ্গ, তাঁর কথাবার্তা, তাঁর খামখেয়ালিপনা উপভোগ করতেন। এমন বন্ধুও ছিলেন যাঁরা জাকির হোসেনের মধ্যে সারা দেশের না হলেও অন্তত মুসলিমদের ত্রাণকর্তাকে দেখতে পেয়েছিলেন। আবার অপ্রয়োজনীয় কাজকর্মে তাঁর শক্তি ক্ষয় রোধ করতে তাঁরা কিছুই করেননি। ভাল জিনিসের সমাদার, এই

10. মৌলবি আলতাফ হেসেন, এটোয়ার ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

11 বি.এ-তে তাঁর বিষয় ছিল ইংরাজি সাহিত্য, দর্শন ও অর্থনীতি।

সুনাম বজায় রাখতে বেশি বেশি খেয়ে যখন স্বাস্থ্যের ওপর অত্যাচার করতেন তখন কেউ নিষেধ করত না। বন্ধুদের ধারণা ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব ও দক্ষতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তাঁরা এসব কিছু পুষিয়ে দিয়েছেন। আলিগড়ে থাকার সময় জাকির হোসেন বেশ কিছু বোকা, বিরক্তিকর, বাতিকগ্রস্ত এবং অতিভোজী লোকদের সম্পর্কে কৌতূহলী হন। তাঁর আগ্রহের জন্যে এ ধরনের কোনও ব্যক্তি যদি জাকির হোসেনের বন্ধু বলে দাবি করে, তবে সে দাবি প্রমাণ করার দায়িত্ব বর্তায় সেই বিশেষ ব্যক্তির ওপর।

এরকম বিভিন্ন ধরনের বন্ধুদের পটভূমিকায় আমরা আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনে জাকির হোসেনের দেওয়া ভাষণ বিচার করব। সেই যেখানে তিনি বলেছিলেন মত ও মেজাজের পার্থক্য সত্ত্বেও সবার সঙ্গে সহযোগিতা করাও বিভিন্ন ধরনের জীবন নিয়ে নিরীক্ষা করা তিনি আলিগড়েই রপ্ত করেছেন।

বাধ্যতা ও প্রকৃত স্বাধীনতার যে সংজ্ঞা ওই ভাষণে তিনি উল্লেখ করেন তা জার্মান দর্শনসঞ্জাত। এবং সম্ভবত বাড়িতে মায়ের কাছে, দাদার কাছে, এটোয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সৈয়দ আলতাফ হোসেন, হোসেন শহের মতো ব্যক্তিদের কাছে যে শিক্ষা তিনি পেয়েছেন তার আংশিক বাস্তব প্রয়োগ। আলিগড়ের শিক্ষাজগতে বা সে-সময়কার সামাজিক পরিমণ্ডলে এমন সৌজন্য দেখা যেত না। 'জাতীয় জীবন ও চরিত্রের অবক্ষয়' বলতে তিনি কি ভাবছিলেন আমরা সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করব, এবং দেখব কেমনভাবে তার প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আইনের সঙ্গে তাঁর বিবেকের সংঘাত ঘটেছিল।

একথা ঠিক যে জাকির হোসেনের সঙ্গে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক অটুট ছিল। সব সময় তিনি আলিগড়ের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সজাগ থাকতেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সনাতনী চরিত্রের পরিবর্তন করা যাবে না এমন কথা কখনও মনে করতেন না। 1948 সালে উপাচার্য হয়ে তিনি যে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন তার ফলাফল নিয়ে পরে আলোচনা করব। বিরোধী পক্ষে থাকা সত্ত্বেও আলিগড়ের স্বার্থে তিনি যে কোনও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেন। বিরোধী পক্ষের আবেদনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ড. জিয়াউদ্দিন। তাঁর মানসিকতায় উচ্চবিত্তের মুসলিম প্রভাব বিরোধীদের চাইতে বেশি ছিল। তার কাজ করা বা না করার একটা বিশেষ পদ্ধতি ছিল যার ফলে তার বিরোধিতা করায় উত্তেজনা ছিল যথেষ্ট, কিন্তু ফল হতো না কিছু।

আলিগড়ে অনেক আদর্শবাদী ও ভাবুক ব্যক্তি ছিলেন। তাদের মধ্যে আবদুর রহমান সিদ্ধি ও আবদুর রহমান বিনজোরি নিশ্চিত ছিলেন যে মহমেডান অ্যাংলো ওরিয়েণ্টাল কলেজের রক্ষণশীল সরকার সমর্থকদের হটানো সম্ভব নয়। তাঁরা অন্যত্র অনুরূপ একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করেন। কলেজের নাম দেওয়া হয়

সুলতানিয়া কলেজ। ভূপালের বেগমসাহেবা প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করবেন বলে মনে হয়েছিল। অর্থ সাহায্য আসেনি এবং কলেজ প্রতিষ্ঠা স্বপ্নই থেকে গিয়েছিল। আলিগড়ের পুরোনো ছাত্রদের মধ্যে লড়াকু ছিলেন মহম্মদ আলি। তিনি বহুদিন ধরে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন তিনি। যুদ্ধ ও তার পরবর্তিসময়ে তাদের বিক্ষোভ রাজনৈতিক চরিত্র পেলে, অধ্যক্ষ সহ অন্যান্য ইংরেজ সদস্যরা পদত্যাগ করেন। অভিভাবকরা ভীত হয়ে পড়েন, কলেজের ছাত্র সংখ্যা কমতে থাকে। 1911 সালের গরমের ছুটির সময় কলেজের ছাত্রসংখ্যা 181 তে নেমে আসে। ড. জিয়াউদ্দিন এ বছর অধ্যক্ষ হন। তিনি আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক ইংরাজ আধিকারিকদের তোয়াজ করে চলছিলেন। স্থগিত অর্থ সাহায্য পুনরায় চালু করার জন্যে সাহেবদের অনুরোধ করেন, এবং, সরকার কলেজকে আর অপছন্দ করছে না বলে মুসলিমদের আস্বস্ত করেন। বিরোধীরা সংঘর্ষের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। মহমেডান অ্যাংলো কলেজকে বিধিবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্যে প্রস্তাব করা হলে সংঘর্ষের সুযোগ পাওয়া গেল। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ড. জিয়াউদ্দিন যাই বলুন না কেন, ইতালির ত্রিপোলি অভিযান এবং 1910 সালের বালকান যুদ্ধের জন্যে উচ্চবিত্ত মুসলিমদের ব্যাপক অংশ সমস্ত ছিলেন ইতালির প্রবল উৎসাহ 1912 সালে তুরস্কে একটি চিকিৎসক দল পাঠানো হয়েছিল। 1915 সালে তুরস্ক যুদ্ধে যোগ দেয়। আর, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া ইরাক থেকে তুর্কিদের বিতাড়িত করা শুরু হয়। এই সময় ভারতীয় মুসলিমরা কার্যকরী পদক্ষেপ নেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল। উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্যে কিছু করা দরকার। ওয়ালায়েৎ আলির ডাকনাম ছিলে বাম্বুক[12]। সার হারকোর্ট বাটলরকে তিনি 'বটুলার সাহেব' বলে ডাকতেন। খিলাফত আন্দোলন বিকাশের সময় বাটলার ইচ্ছাকৃত কিছু প্রস্তাব দেন। খিলাফত আন্দোলন, রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং অসহযোগ আন্দোলন যখন অগ্নিগর্ভ; সে সময় তিনি মুসলিমদের বিভ্রান্ত করতে ও ইংরাজ সরকারের অস্বাভাবিক ঐক্য বজায় রাখতে সফল হয়েছিলেন।

তাঁর সময়কার শিক্ষিত মুসলিমদের অধিকাংশের মতো জাকির হোসেন এই সময় উর্দু পত্রপত্রিকায় আবেগপূর্ণ যে সমস্ত কবিতা প্রকাশিত হতো সব পড়তেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের অপূর্ব গদ্য আল হিলাল ও আল বালাগ তিনি

---

12. রফি আহমেদ কিদোয়াই-এর কাকা। ব্যঙ্গাত্মক রম্যরচনায় তার দক্ষতা ছিল। তিনি সাধারণত ইংরাজিতে লিখতেন 'কমরেড' পত্রিকায়; 1911 সালে যার প্রকাশনা শুরু হয়; আর উর্দুতে লিখতেন 'অবাধ পাঞ্চ' পত্রিকায়।

পড়েছিলেন। লেখাগুলি নিজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসঞ্জাত মহৎ কিছু করার জন্যে জাকির হোসেনকে উজ্জীবিত করেছিল। কিন্তু 1920 সালে তিনি মাত্র তেইশ বছরের যুবক। অর্থনীতিতে এম.এ পড়ছেন। আইন ক্লাশেও যাচ্ছেন। তাঁকে আংশিক সময়ের শিক্ষকের পদ দেওয়া হয়েছিল। তাই তিনি ছাত্রসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, আবার শিক্ষকদের মধ্যেও তাঁকে ধরা হতো না। খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনে তাঁর মানসিক যোগাযোগ কতটা ছিল, তা পরিষ্কার নয়। আমরা পরবর্তিকালে দেখেছি যে তিনি যে কোনও চরমপন্থার বিরোধী আবার, সুবিধাজনক এবং সহজে হয় বলেই, তিনি স্রোতের পক্ষে সাঁতার কাটার বিরোধী ছিলেন। সে সময়কার কথা বলার সময় তিনি আমায় বলেছিলেন যে গান্ধিজি সম্পর্কে তিনি কাগজে পড়েছেন। তাকে কখনও দেখেননি বা সব কিছু ত্যাগ করে তার অনুগামী হতেও ইচ্ছা করেননি। যাইহোক, বিরোধী ছাত্র নেতাদের বিরুদ্ধে তাঁর সাফল্য, বক্তা হিসাবে তাঁর সুনাম, ব্যক্তিগত প্রভাব ইত্যাদির জন্যে তাঁর অভিমত খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই জন্যেই কিছু ছাত্রের সন্দেহ হয়েছিল হোসেনকে নিজ পক্ষে রাখার জন্যে জিয়াউদ্দিন তাঁকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করেন।

সংকট দেখা দিল যখন একদল অতি উৎসাহী এম এ ও কলেজকে বিধিবদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় করা রোধ করতে মৌলানা মহম্মদ আলি ও গান্ধিজিকে বক্তব্য রাখার আমন্ত্রণ জানাল। গান্ধিজি সে সময় সমস্ত সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল কলেজ বর্জন করার কথা বলছেন আর মৌলানা মহম্মদ আলি, এম. এ. ও কলেজকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় করার প্রবল বিরোধিতা করছেন। দুজনের কাউকে এ ব্যাপারে যুক্তি পরামর্শ দেবার প্রয়োজন ছিল না। অপর দিকে সরকার সমর্থকরা দুই নেতার উপস্থিতি নিষ্ফল করার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠেন। জাকির হোসেন ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্যে উদ্গ্রীব ছিলেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং দিল্লিতে ড: আনসারিকে দেখানোর মনস্থির করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে দুটি ব্যাপার একই দিনে পড়ে যায়। সভা যতটা সম্ভব বিলম্বে শুরু করার জন্যে তিনি ছাত্র সংসদে তাঁর বন্ধুদের অনুরোধ করেন। তা করা সম্ভভ হয়নি। এবং অক্টোবরের 12 তারিখে যখন তিনি দিল্লি থেকে ফিরে আসেন, তখন গান্ধিজি তার বক্তব্য শেষ করে চলে গেছেন।

কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে তাঁর দেখা স্টেশনে। সকাল ও সন্ধ্যায় স্টেশন চত্বরে ধীরে সুস্থে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে তারা পার্কে অবসর কাটানোর আনন্দ উপভোগ করেছিল। এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভিড় হয়েছিল। কয়েকজন অশ্লীল মন্তব্য ও উপহাস করছিল। গান্ধিজি ও মহম্মদ আলির বিরক্তি সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুরাও জনগণের মনোভাব সমর্থন করছিল। তিনি আমায় বলেছিলেন, যেমন পাশবিক অশ্রদ্ধায় তারা গান্ধিজি সম্পর্কে কথাবার্তা বলছিল তাতে তিনি চূড়ান্ত লজ্জা বোধ করেছিলেন। এটা শিক্ষা ও সংস্কৃতির লজ্জা, যা কিছু মহৎ ও পবিত্র তার বিরোধী। অবশ্যই প্রতিবিধান

করা দরকার। জামিয়া মিলিয়ায় তাঁর পরিষেবা, ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁর দান, রাষ্ট্রের মর্যাদায় তাঁর অবদান সব কিছু সেই প্রতিবিধানের অঙ্গ।

পরের দিন 13 অক্টোবর। এই ঘটনার পর সেদিন সর্বত্র ঘরোয়া ও প্রকাশ্য আলোচনা যথেষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। চিন্তা ছিল না, বাঁধন ছিল না। বিবদমান গোষ্ঠী পরস্পরের বিরুদ্ধে অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে শুরু করে। মেজাজ মুহূর্তের মধ্যে পালটিয়ে যাচ্ছে। ছাত্র ইউনিয়নের সভায় হঠাৎ মৌলানা মহম্মদ আলি ও সৌকৎ আলি হাজির হন। তারা কোনও ভাষণ দেননি। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে তাঁরা ছাত্রদের কাছে বিদায় চান এবং বলেন, ভগ্ন মনোরথ হয়ে তারা চলে যাচ্ছেন। তাঁদের অকৃত্রিম হতাশা দেখে অনেক ছাত্র কেঁদে ফেলে। হোসেনও সেই দলে ছিলেন। তাঁর খুব জ্বর ছিল। বক্তৃতা দেবার কোনও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তিনি উত্তেজনা দমন করতে পারলেন না। একবার সঠিক কথা বলার জন্য জাকির হোসেন একটি ছাত্রকে সমর্থন করেন। সেজন্য তাঁকে চর অপবাদ দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষকের চাকরি ছেড়ে দেবেন এবং বৃত্তি আর নেবেন না, একথা ঘোষণা করে অধিকাংশ ছাত্রকে তিনি স্বপক্ষে নিয়ে আসেন। তাঁর ভিতরের গঠনশক্তি প্রকাশ হয় যখন তিনি বলেন, যারা স্কুল কলেজ বর্জন করতে বলছেন, তাদের উচিত জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা যাতে, ছাত্ররা তাদের পড়াশোনা সেখানে করতে পারে। তিনি কি করতে চান এই সভায় প্রকাশে তা বলেননি। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে দিল্লিতে হাজির হয়ে তিনি হাকিম আজমল খাঁ, ড. আনসারি, মৌলানা মহম্মদ আলি সহ বিভিন্ন খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করেন। জাতীয় শিক্ষালয় স্থাপিত হলে ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষক ও ছাত্র এম এ ও কলেজ ত্যাগ করে সেখানে যোগ দেবে বলে তিনি তাদের আশ্বাস দেন। নেতারা এর থেকে ভাল আর কিছু চাইছিলেন না। 29 অক্টোবর 1920 জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠিত হলো। দেওবন্দরে মৌলানা মামুদুল হাসান এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করে ভাষণ দেন।[13]

---

13. এই ঘটনা ড. জাকির হোসেনের কাছে শোনা। অন্য বক্তব্য অনুযায়ী, জামিয়া মিলিয়া আন্দোলনের প্রধান প্রেরণাশক্তি ছিলেন মৌলানা মহম্মদ আলি। জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় 29 অক্টোবর 1920। এম এ ও কলেজ কর্তৃপক্ষকে চরমপত্র দিয়ে মৌলানা মহম্মদ আলি লেখেন 29 অক্টোবরের মধ্যে কলেজকে জাতীয় শিক্ষালয়ে পরিবর্তন না করলে, ওই দিন নতুন প্রতিষ্ঠান জন্ম নেবে। অধিকাংশ ছাত্র মৌলানার নেতৃত্বাধীন ছিল। তাঁকে মান্য করত। মৌলানার সাফল্যের কারণ এটাই।

শিক্ষানবিশীর কাল

কলেজ মসজিদের সমাবেশ থেকে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া গঠিত হয়। এম এ ও কলেজ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার সময় কে সেখানে পড়ত আর কেই বা জামিয়া মিলিয়াতে যোগ দিয়েছে, বোঝা মুশকিল ছিল। কারণ, সবাই একই বাড়িতে বাস করত। ড. জিয়াউদ্দিন ও তাঁর সমর্থকরা প্রথমে কলেজ বন্ধ করে ছাত্রদের বাড়ি চলে যেতে বলেন। কেউ কেউ সেই মতো কাজ করে। অবশিষ্টদের নিরাপদ স্থানে পাঠাবার জন্যে তাদের অভিভাবকদের তার করা হয়। ছেলেদের উদ্ধার করতে বলা হয়। তারপর জামিয়া মিলিয়াতে যারা যোগ দিয়েছিল তাদের স্বমতে আনার চেষ্টা করা হয়। বিদ্রোহীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলে জাকির হোসেনকে নায়েব তহশিলদারের[1] পদ দেওয়া হবে বলে প্রলোভন দেখানো হয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ ডেকে কলেজ সংলগ্ন এলাকা থেকে বিদ্রোহীদের বিতাড়িত করত হয়। বিক্ষুব্ধরা মিছিল করে বেরিয়ে এসে তাঁবুতে আশ্রয় গ্রহণ করে। আলিগড় শহর থেকে রান্না-করা খাবার তাদের জরুরি ভিত্তিতে তৈরি বাসস্থানে পাঠানো হয়েছিল। যতদিন ছাত্ররা নিজেদের ব্যবস্থা করতে পারেনি ততদিন এই ব্যবস্থা কার্যকরী থাকে। এই ঘটনা জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল এবং আজকের তুলনায় সেই সময়ে এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেশ কয়েকজন উৎসাহী যুবক জাতীয় শিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয় পবিত্র উদ্দেশ্য ও আশা নিয়ে।[2]

জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া শিক্ষা বিষয়ক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যথার্থ রূপ পায় 22 নভেম্বর 1920 সালে। ট্রাস্টি বোর্ড, কার্য নির্বাহক সমিতি বা মন্ত্রণাসভা এবং শিক্ষা পরিষদ থাকবে ঠিক হয়। আচার্যের নেতৃত্বে একজন উপাচার্য, একজন

---

1. উপ-জেলার রাজস্ব আদায়কারী।

2. ইশাদুল হক এম এ-ও কলেজ ছেড়ে জামিয়া মিলিয়াতে যোগ দেন। তিনি আমাকে বলেন সুভাষচন্দ্র জামিয়া-তে যোগ দেবার বাসনা প্রকাশ করেন। সে সময় তিনি সি আর দাসের সচিব। তিনি সুভাষচন্দ্র বসুকে ছাড়তে রাজি হননি।

সহ-উপাচার্য, একজন কলেজ অধ্যক্ষ, একজন সচিব ও একজন নিয়মজ্ঞ থাকবে ঠিক হয়। হাকিম আজমল খান আচার্য এবং মৌলানা মহম্মদ আলি, উপাচার্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সমসাময়িক এ এম খাজা অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় খিলাফত সমিতি গোটা পরিকাঠামো নিয়ন্ত্রণ করত এবং সমস্ত অর্থভার বহন করত। জামিয়া মিলিয়ার নথিতে দেখা যায়, জাকির হোসেনের নাম প্রথম শিক্ষা-কর্মী হিসাবে 4 নভেম্বর 1921 প্রকাশিত হয়। পরবর্তিকালে 21 জানুয়ারি 1922 সালে কার্য নির্বাহক সমিতির সদস্যরূপে তাঁর নাম প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক হিসাবে তিনি শিক্ষা পরিষদেরও সদস্য। ছাত্রসমাজকে নিয়মিত শ্রেণী অনুযায়ী ভাগ করা হয়নি। পুরোনো ছাত্ররা নবাগতদের শিক্ষা দিত। শিক্ষা পরিষদের কার্য নির্বাহক সমিতি বা খিলাফৎ সমিতির কোনও বিশিষ্ট সদস্য যখন ভাষণ দিতেন, পুরোনো ছাত্ররা তাদের বক্তব্য শুনত। প্রায় এক বছর ধরে পুরাতন ছাত্রদের ছয়-সপ্তাহের পাঠক্রমে খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগিতা আন্দোলন সম্পর্কে তার আদর্শের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। তারপর বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে ছাত্ররা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ড. জাকির হোসেন এই রাজনৈতিক যাত্রার সামিল হননি। তিনি প্লেটোর 'দ্য রিপাবলিক' এর উর্দু অনুবাদ শেষ করেন এই সময়। এই অনুবাদের কাজ তিনি ছাত্রাবস্থায় শুরু করেছিলেন। কানানের 'এলিমেণ্টাল পোলিটিক্যাল ইকনমি'-র উর্দু অনুবাদও তিনি করেন। সাধারণভাবে লেখালেখির কাজ অপছন্দ হলেও তিনি এই অবসরে অন্য কিছু করণীয় না থাকায়, অনুবাদের কাজ শেষ করেছিলেন। এ সময়ের কোনও কাহিনী আমি তাঁর কাছে শুনিনি। এই সময়েই এ এম খাজার ভাগ্নে ড. কে এ হামিদ একরকম ঠেলেঠুলে বন্ধু জাকির হোসনেকে বিদেশে পাঠান। জামিয়া মিলিয়ার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ নেতাদের[3] বিরুদ্ধে নীরবতাই ছিল তাঁর প্রতিবাদ। একই কারণে হাকিম আজমল খান নিজেকে নেপথ্যে সরিয়ে নিয়েছিলেন।

কয়েক বছর পর আমি যা দেখেছিলাম সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এই নেতারা নিজেদের জাহির করতে এবং সমস্ত চিন্তা ও কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু, একথা ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন। জনগণের আশাআকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে পারলে, তাদের উজ্জীবিত করতে পারলে এ দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু নেতারা যদি মনে করেন তাদের যা কিছু করণীয়, সব তারা করে ফেলেছেন এবং সমর্থকদের কাছে নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখার জন্যে ফন্দিফিকির করেন, তাহলে সমাজের

---

3. এই শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে উর্দুভাষী উত্তর ভারতীয়রা 'লিডার' বলতে যা বোঝাতো তার সঙ্গে ইংরাজিতে লিডারের অর্থ ভিন্নতর ছিল, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে জনগণকে নেতৃত্ব দেওয়া বোঝাতো না। প্রভাব প্রতিপত্তি মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের 'লিডার' বলা হতো।

পক্ষে তা অতীব দুঃখজনক হয়। সমসাময়িক অধিকাংশ মুসলিম নেতাদের কাছে আরব্ধ কাজ কতটা তারা করতে সমর্থ হয়েছেন, তা বিচার্য ছিল না। কাজটা হাতে নেওয়ার জন্যে তাঁরা কতটা সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি পাচ্ছেন তাই ছিল একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। মৌলানা মহম্মদ আলি মূলত তার নিজের সম্পর্কেই ভেবেছেন। বলেছেন, এমনকী লিখেছেনও। খিলাফত আন্দোলনের সময় প্রশংসার বন্যায় তাঁর আত্মশ্লাঘার মনোভাব দৃষ্টির আড়ালে থেকে গেছে। আর একজন নেতা ছিলেন, যিনি কাজের গুরুত্বের ক্রমপর্যায় বুঝতেন না, ফলে কোনও কাজ হতো না। জরুরি বিষয়গুলি আসত শেষের দিকে অথবা আদৌ আসত না। নেতৃত্বে পরবর্তী স্তরে এমন অনেক ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা শুধুমাত্র আবেগতাড়িত হয়ে স্বীকৃত নেতাদের অনুসরণ করেছেন বলে মর্যদা দাবি করতেন। এই পটভূমিকায় অযোগ্যতা ও অলসতার অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে আনা যেত না। এবং নেতারা নেতৃত্বের প্রতি আস্থার কথা প্রচার করে নিজেদের অবস্থান আরও দৃঢ় করতেন।

বহুবর্ণের ছাত্রদের সংগ্রহ করে জামিয়া মিলিয়া গঠিত হয়েছিল। তারা ছিল উৎসাহী তরুণ, নেতাদের জ্বালাময়ী ভাষণে আবেগতাড়িত। তাঁদের অধিকাংশই ইসলাম ধর্মভাবে আচ্ছন্ন; আর অমুসলিম ছাত্রদের ছিল জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা। হৃদয় জ্বলন্ত কিন্তু মস্তিষ্ক অনুর্বর। চিন্তা করার ক্ষমতা বা মনের ভারসাম্য ছিল না। দেখা গিয়েছে, বিক্ষুব্ধ হলে তারা যা খুশি তাই করতে পারে। অন্য সময় কিছুই পারে না। ধকল ও ব্যর্থতা বহন করার মতো মানসিক দৃঢ়তা অবশ্য তাদের ছিল। শফিকুর রহমান কিদোয়াই এমনই একজন। 1920 সালে বি. এ. ক্লাশের শেষ বছরের ছাত্র। আরামপ্রিয়তা ও রুচিসম্পন্ন দামি পোশাক তাকে অন্যদের থেকে আলাদাভাবে চিনিয়ে দিত। পরিবর্তনের সময় সে তার পোশাকের বহ্ন্যুৎসব করে খদ্দরের জামাকাপড় পরতে শুরু করে। শান্ত ও লাজুক ছেলেটা হঠাৎ-ই রাজনৈতিক বক্তারূপে খ্যাতি লাভ করে। তার চরিত্রের জন্মগত মহত্ত্ব, ধৈর্য, একাগ্রতা হঠাৎ-ই আবিষ্কৃত হলো। ভাল খেলতে পারত, ভাল গান গাইত, প্রাণখুলে হাসতে পারত, অন্যকে উজ্জীবিত করতে পারত, সান্ত্বনা দিতে পারত। অন্যের বিশ্বাস অর্জনে সক্ষম তার হাসিতে লোকে মোহিত হতো। যথেষ্ট শক্তিমান ও কর্মঠ। পড়াশোনার নিয়মকানুনের ঝক্কি তাকে কাহিল করতে পারত না। সক্রিয় রাজনীতি করার জন্যে শীঘ্রই তাকে বন্দি করা হয়। ভেলোরে সে রাজাজির সহ-বন্দি ছিল। তার সৌজন্য আকর্ষণ শক্তি, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা রাজাজির প্রশংসা পেয়েছিল। ড. কে এ হামিদ ছিলেন ভিন্ন ধরনের। এলাহাবাদের বিজ্ঞানের ছাত্র, উচ্ছ্বাসের আধিক্যে তিনি এলাহাবাদ ছেড়ে জামিয়া মিলিয়াতে যোগ দেন। কিন্তু কল্পনা, সংগঠন শক্তি ও রূঢ় বাস্তবের সমন্বয়ে ধৈর্যহীন হয়ে পড়েন, তাঁর স্বাভাবিক গুণের বিকাশ ঘটে না নতুন পরিবেশে। উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিদেশ যাবেন বলে মনস্থির করেন। এবং বন্ধু জাকির হোসেনকে তার আগেই বিদেশ যেতে বাধ্য করেন।

1968 সালের ডিসেম্বর মাসে ড. হামিদের 70 তম জন্মবার্ষিকীতে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জাকির হোসেন বলেন : 'সে আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের দায়িত্ব নিয়েছিল। ঠিক করেছিল উচ্চশিক্ষার্থে আবার জার্মানি যাওয়া উচিত। আমার আপত্তি অসুবিধা আলস্য কিছুই গ্রাহ্য করেনি। আমাকে যেতেই হলো। পালাবার কোনও পথ ছিল না। সে-ই আমার যাওয়ার ভাড়া যোগাড় করে দেয়। আমি নিরাপদে জাহাজে আরোহণ করছি দেখার জন্যে বম্বে পর্যন্ত আমার সঙ্গী হয়। বম্বেতে অল্প কয়েকদিন একত্রে থাকার সময় সে বিদেশ জীবনযাত্রা কেমন করে রপ্ত করব, কেমন করে জামাকাপড় পরব, কেমন করে ছুরি-কাঁটা ধরব, কেমন করে ইয়োরোপিয় দেশ সমূহে আচরণ করব, সে সম্পর্কে আমাকে শিক্ষা দিত। সে নিরাশ হবে, এই আশঙ্কায় কোনও কিছুই আমি ভুলতে পারতাম না এবং আমার মনে হয় তার সব পরীক্ষায় আমি সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছি।'

জাকির হোসেনের ইংল্যাণ্ডে যাবার অনুমতি ছিল। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। কখন এই পরিকল্পনা করেছিলেন জানা নেই। অষ্ট্রিয়া হয়ে তিনি জার্মানি যান। পর্যটক হিসাবে ভিসা পান। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় জার্মান বিদেশ-দপ্তর ভিসার মেয়াদ বাড়িয়েছিল। সরোজিনী নাইডুর ভাই বীরেনবাবুকে তাঁর বন্ধুরা 'চ্যাটো' বলে ডাকতেন। সরকারি অনুমতি বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল অনেক পরে। ছাপ দেখে বোঝা যায় নিবন্ধভুক্তির জন্য তিনি প্রায়ই থানায় যেতেন কিন্তু তাঁকে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

বার্লিনের কাছে স্কালাসটেনসিসে শ্যোয়ানারদের বাড়িতে আমি জাকির হোসেনকে প্রথম দেখি। সেখানে আমি ও ড. আবিদ হোসেন থাকা খাওয়ার খরচা দিয়ে থাকতাম। আবিদের লম্বা, তাগড়াই চেহারা। পেশিবহুল নয়, দুবর্ল-ও নয়। ঢেউ খেলানো চুল, সুন্দর করে ছাঁটা দাড়ি। এসব কিছু অবশ্য পরে নজরে এসেছে। তাঁর চোখ দুটো মানুষকে আকর্ষণ করত। তাঁর সুন্দর চোখের ভাষায় অনেক কথা, ভাবের আদান প্রদান হয়ে যেত। যারা তাঁর চোখের ভাষা বুঝতে পারত না, তাদের জন্যে ছিল তাঁর ক্ষমাসুন্দর হাসি। মুখের কথা অনেক পরে হতো। কথাবার্তা অত্যন্ত অমায়িক, ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয়। তাঁর হেঁয়ালি ছিল খুব উচ্চাঙ্গের। মানসিক শক্তির প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও শারীরিকভাবে তিনি ছিলেন ভীষণ কুঁড়ে। পরিশ্রমের হাত থেকে বাঁচার জন্যে অপরের সাহায্য নেওয়া ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এজন্যে বেশ মজা হতো। আমার মতো অনেক অসতর্ক ব্যক্তিকে এই ফাঁদে বারবার পড়তে হয়েছে। আমি ভাবতাম তাঁর উচ্চতা ও ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও একজন মানুষের সাহায্য তাঁর সব সময় দরকার, যার হাত ধরে তিনি এগিয়ে যেতে পারেন। পরে বুঝতে পেরেছিলাম মানুষকে বুঝতে, পরিস্থিতি সামাল দিতে তাঁর যোগ্যতা দক্ষতা, অন্য অনেকে যারা এ বিষয়ে পারঙ্গম বলে দাবি করেন, তাঁদের চাইতে অনেক বেশি।

হোসেনের কোনও দিনপঞ্জি ছিল না। আলিগড়ে ছাত্রাবস্থায় তিনি বিশৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। পরবর্তী সময়ে এই ত্রুটি তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। অন্যের নিয়মানুবর্তিতা তিনি প্রশংসা করতেন এবং একজন শিক্ষক হিসাবে অক্লান্তভাবে তিনি এর গুরুত্ব ছাত্রদের বোঝাতেন। কিন্তু ব্যক্তিজীবনে নিয়ম মেনে চলা তিনি স্বাধীনতা-বিরোধী বলে ভাবতেন। একসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতেন।

তাঁর কাজকর্মের কালানুক্রমিক বিবরণ ফলপ্রদ হবে না কেননা তিনি যখন যেমন সুযোগ পেতেন তখন সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে সচেষ্ট থাকতেন। বিদেশে পাঠরত ভারতীয় ছাত্ররা তাদের গবেষণামূলক প্রবন্ধ, তত্ত্বালোচনা, বিতর্ক প্রকাশিত হলেই খুশি হতো। বার্লিনে থাকাকালীন জাকির হোসেন ফারসি ভাষায় গালিবের 'দিওয়ান' এর সংস্করণ প্রকাশ করেন। তিনি এক ইরানি ছাপাখানার মালিকের সঙ্গে আলাপ করেন এবং মুদ্রক কম থাকায় তিনি নিজেই ছাপার কাজে হাত দিয়েছিলেন। একটি বই বাঁধাই সংস্থার মালিকের সঙ্গেও তিনি আলাপ করেন। তাঁর সম্পাদিত দিওয়ানের পকেট সংস্করণ সেই সময়ে সব থেকে ভাল বলে বিবেচিত হয়েছিল। নিজস্ব সঞ্চয় ছাড়াও, আবিদ আলি ও আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে প্রকাশন ব্যয় মেটানো হয়েছিল। জামিয়ার প্রকাশন সংস্থা মাকতবা কিস্তিতে টাকা শোধ দেবে, এমন ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রচেষ্টার জন্যে যে আর্থিক অসুবিধা দেখা দেয়, তার জন্য তিনি কোনও কাজে বিরত থাকেননি। বরং অন্য আর একটি সুযোগকে কাজে লাগান। বাড়িওয়ালা প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্যে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তাঁর জামাই হেনট্রিক ভাল ইংরাজি জানতেন। ড. জাকির হোসেনের মনে হলো, গান্ধিজির ওপর জার্মান ভাষায় একটা বই প্রকাশ করলে ভাল হয়। হেনট্রিক ও জাকির হোসেন বিষয়বস্তু লিখে ফেলেন। গান্ধিজির ওপর বই প্রকাশিত হলো। দুই বন্ধুর যা কিছু সঞ্চয় ছিল, তা ব্যয় করতে তিনি তাদের আবার উদ্দীপিত করলেন। কিন্তু প্রকাশকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করার কোনও ব্যবস্থা করলেন না। কারণ তাঁরাও তাঁর বন্ধু ছিলেন এবং মুদ্রাস্ফীতির জন্যে তাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন ছাপার জন্যে এই অর্থে তাঁদের সাহায্য করা হয়েছে জাকির হোসেনের সৌজন্যে। জাকির হোসেনের সৌজন্য তাদের ভুল ভাঙতে দেয়নি। পরিণাম সহজেই অনুমেয়।

পুস্তক প্রকাশনা কেতাবি বিষয়, পশুপালন নয়। জাকির হোসেন পশুপালন বিষয়েও আগ্রহী হয়েছিলেন। শ্যোয়ানার পরিবারের অতিথি সুইডিস পিটারসন ডেনমার্ক ও সুইডেনের গবাদি পশুপালন ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের সংরক্ষণ বিষয়ে অনেক কিছু জানতেন। তিনি জাকির হোসেনকে প্রভাবিত করেন। 1924 সালের অক্টোবর মাসে তাঁরা দুজনে ওই দুটি দেশ ঘুরতে বেরিয়ে পড়েন। পথে কত খরচা হবে সে

সম্পর্কে দুজনেই খুব অজ্ঞ ছিলেন। স্টকহল্‌মের একটি হোটেলে যখন তাঁরা ছিলেন তখন হোটেলের খরচ মেটাবার পয়সাও তাদের হাতে ছিল না। পিটারসন জাকির হোসেনকে মহাত্মা গান্ধির ওপর ইংরাজিতে একটি প্রবন্ধ লিখতে বলেন। নিজে তা অনুবাদ করে স্থানীয় সংবাদপত্র অফিসে নিয়ে যান। পত্রিকায় ওই প্রবন্ধ জাকির হোসেনের ছবি সহ প্রকাশিত হয়। এই লেখার জন্যে পাওয়া টাকা থেকে তাঁরা হোটেলের খরচা মিটিয়ে জার্মানিতে ফিরে আসেন। জাকির হোসেন ওই প্রবন্ধের একটি অনুলিপি আমায় দিয়েছিলেন, আমি বহুদিন ওই লেখাটি আমার সংগ্রহে রেখেছিলাম।

যাই হোক, স্টকহল্‌মে থাকার সময় যেরকম আর্থিক দুরাবস্থায় পড়েছিলেন তেমন অবস্থায় পড়লে তিনি জার্মান সংবাদপত্রে লেখা দিতেন। যে সময় জার্মানরা ভারত সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। রাজনীতি ও সংস্কৃতি সচেতনতার জন্যে জাকির হোসেনের লেখাগুলি সাংবাদিকতার গণ্ডি পেরিয়েও আকর্ষণীয় হতে পারত। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে, যেখানে জাকির হোসেন জার্মান সংস্কৃতিকে অবদমন করার চেষ্টার বিরুদ্ধে জার্মানদের সাবধান করে তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন। এই বক্তব্যে খুশি হয়ে এক জার্মান ব্যবসায়ী তাঁকে চিঠি লিখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং জাকির হোসেন বা ভারতকে কীভাবে সাহায্য করতে পারেন, জানতে চান। চিঠিটা পড়ে আমি জানতে চেয়েছিলাম জাকির হোসেন এ ব্যাপারে কী ভাবছেন। জবাব এসেছিল কাঁধ-ঝাঁকুনি। অর্থাৎ এ ব্যাপারে আর কিছু করার কোনও প্রয়োজন নেই।

অর্থনীতিতে পি এইচ ডি করার জন্যেই জাকির হোসেন বিদেশে গিয়েছিলেন। ওয়ার্নার সোমব্রাট ও সেরিং-এর মতো জার্মানির বিখ্যাত অর্থনীতিবিদদের কাছে তিনি শিক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি বিশেষভাবে সোমব্রাটের অনুরাগী ছিলেন। এমন শিক্ষকরাও জাকির হোসেনকে একটি বিষয়ে আবদ্ধ রাখতে পারেননি। প্রাচীন ভাষা হিসাবে আরবি ছাড়াও তিনি দর্শন ও শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করেন। ভারতে ইংরেজদের কৃষিনীতি ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু। ব্রিটিশ জাদুঘর ও ভারতীয় গ্রন্থাগারে মূল দলিলগুলি পড়ার জন্যে তিনি তিনি লন্ডন গিয়েছিলেন। সেখানে পড়াশোনা করে তিনি যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছিলেন। শিক্ষার দর্শন সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর আগ্রহের তুলনায় এই সমস্ত বই পড়া যথেষ্ট অকিঞ্চিৎকর। আমি জানি না ব্যক্তিগত ভাবে জাকির হোসেনের সঙ্গে কারস্টেনমটেনিয়ার দেখা হয়েছিল কি না। কিন্তু তার সমস্ত লেখাই জাকির হোসেন বিশদভাবে পড়েছিলেন। তাছাড়াও তিনি রিকার্ট, ডিলথে ও স্কেলিয়ারমাচারের সব লেখাই পড়েছিলেন। এই সমস্ত লেখা পড়ে তিনি ইসলাম সহ বিভিন্ন সংস্কৃতির রীতিনীতি ও আদর্শ সমাজ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা বিষয়ে খ্যাতনামা প্রবক্তা স্প্রানজারের রচনাও তিনি পড়েছিলেন। জার্মান বুদ্ধিজীবীরা গভীরভাবে তাঁকে প্রভাবিত করেছিলেন। যুদ্ধ

পরবর্তী সময়ে চিন্তা ও জীবনযাত্রায় যে পরিবর্তন এসেছিল, সে সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করার জন্যে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলেন। পরীক্ষামূলকভাবে স্কুল চালাচ্ছেন এমন কিছু শিক্ষাবিদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন, তাদের স্কুলগুলি পরিদর্শন করেন। যে শিক্ষকরা স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার ওপরই স্কুলগুলির ভবিষ্যৎ নির্ভর করতো। ওয়ালডফ স্কুলগুলিই শুধুমাত্র টিকে ছিলো।

সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিজীবী পরিমণ্ডলে ঠাঁই পাবার জন্যে জাকির হোসেন গারদা ফিলিপস্‌বর্নের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন। আমরা তাকে প্রথম দেখি 'চ্যাটো'-র ছোট বোন শ্রীমতী নামবিয়ারের পার্টিতে। সমমনোভাবাপন্ন জার্মানদের ও ভারতীয়দের একত্রিত করার জন্যে শ্রীমতী নামবিয়ার প্রায়শই এমন সান্ধ্য-পার্টির ব্যবস্থা করতেন। তিনি যখন তার সান্ধ্য-পার্টি বন্ধ করে দেন, তখন আমাদের সামাজিক মেলামেশা বন্ধ হয়ে যায়। আমার মনে আছে, এক সন্ধ্যায় জাকির হোসেন যখন ভীষণ একাকীত্ব বোধ করছিলেন, সে সময় আমি তাঁর পাশে ছিলাম। তিনি নামবিয়ার-কে ফোন করে জানতে চান, কখন তাঁর সান্ধ্য-পার্টি অনুষ্ঠিত হবে। জবাব শুনে জাকির হোসেন অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং আমাকে বলেন নামবিয়ারকে বুঝিতে দিতে হবে, অন্তত আমার কাছে তিনি অপরিহার্য নন। 'কেন আমি ফিলিপস্‌বর্নকে ফোন করব না?' তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন। 'তুমি কি মনে করো আমরা যথেষ্ট পরিচিত?' আমি প্রশ্ন করলাম। দেখি কি হয় বলে তৎক্ষণাৎ তিনি ফিলিপসবর্নকে ফোন করলেন। তিনি বাড়িতে ছিলেন এবং বললেন, আমাদের সাক্ষাৎ পেলে খুব খুশি হবেন। বন্ধুত্বের শুরু সেদিন। এই বন্ধুত্বের গভীরতা মাপা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। 1943 সালে জামিয়া মিলিয়াতে গারদা ফিলিপস্‌বর্ন মারা যান। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এ বন্ধুত্ব স্থায়ী ছিল।

গারদা বার্লিনে সম্পন্ন এক ইহুদি, পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বহুমুখী শখ ছিল। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ সংগীতশিল্পী, সুরকার, নাট্যকারদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ ছিল। কেন তিনি বিয়ে করেননি, একথা আমায় কখনও বলা হয়নি। আমিও জিজ্ঞাসা করিনি। জার্মানরা তাঁকে মহিমান্বিত কল্পনাবিলাসী বলত। প্রতিষ্ঠা এবং ধনসম্পদ তাঁর যথেষ্ট ছিল। জাকির হোসেনকে গভীরভাবে জানবার পর তিনি তাঁর জন্যে বিশেষ কিছুই করতে পারেননি। তাঁর সান্নিধ্যে জাকির হোসেন ঐক্যতান বাদন, যাত্রা নাটক শিল্প প্রদর্শনী, বিদ্যালয় সব ভাল-ভাল জিনিস দেখেছিলেন। কিন্তু তাঁরা দুজনেই বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করতেন। জাকির হোসেনের তরফে কোনও রকম কল্পনাপ্রবণতা ছিল না। তাদের দুজনের আলোচনায় তৃতীয় ব্যক্তি হবার সুযোগ যখনই পেয়েছি, শুনেছি জাকির হোসেনের অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা। তাঁর আত্মপ্রত্যয়ী কথাবার্তা থেকে সহজেই বোঝা যেত তিনি এ ধরনের অনুরাগের বিরোধী।

তাঁর সঙ্গে কোনও আলোচনা না করতে এই ক বছর আমি অনুরাগমিশ্রিত বন্ধুত্ব সম্পর্কে জাকির হোসেনের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার চেষ্টা করতাম। আমার ধারণা, তাঁর সমস্ত আচরণ ইসলামিক অনুশাসন 'হায়া' নিয়ন্ত্রিত ছিলো। তাঁকে লাজুক বলা যেতে পারে। কিন্তু সৌজন্য ও ঔচিত্যের উঁচু তারে বাঁধা ছিল জাকির হোসেনের ব্যবহার, কখনও তরে অবনমন হয়নি। মুসলিম ঐতিহ্যানুসারে হায়ার অর্থ নারীসঙ্গ বা নারীদর্শন এড়িয়ে যাওয়া। এই প্রথার প্রয়োগে অপ্রীতিকর ও অসামাজিক পরিস্থিতি তৈরি হয়। এই ঐতিহ্যের মধ্যে মানুষ হলেও এবং ইয়োরোপ যাবার আগে মিশ্র সমাজ সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকলেও মহিলা সাহচর্যে তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন না। শীঘ্রই তিনি অনুধাবন করতে পারেন যে শিক্ষিত ইয়োরোপীয় মহিলারা তাঁকে খুব পছন্দ করেন। এবং শুধু শিক্ষিত মহিলারা নন। 1924 সালের মে দিবসের একটা ঘটনা আমার মনে পড়ছে। নতুন জীবনে, আবেগে গাছগাছালির কাঁপন শুরু হয়েছে, প্রকৃতিতে আনন্দ উচ্ছ্বাসের বান ডাকছে। এমন দিনে, প্রাত্যাহিক কাজকর্মে আবদ্ধ থাকা যায় না। আমরা চার পাঁচজন স্টাডবান স্টেশনে জড়ো হয়েছিলাম। বসন্তের সমাগম জাকির হোসেনকে খুবই নাড়া দিয়েছিল। তিনি পরেছিলেন একটা বুক খোলা জামা, সুন্দরভাবে ছাঁটা দাড়ি, চুলে হাওয়া খেলছিল, চোখে রোমাঞ্চপূর্ণ মৃদু দীপ্তি। আমরা সবাই কোথাও যেতে চাইছিলাম। কিন্তু কোথায় যাব ঠিক করতে না পেরে ওয়ানসে যাওয়ার জন্যে ট্রেন ধরলাম। ওয়ানসেতে হ্রদ আছে, বন আছে। আমরা দাঁড়াবার জায়গাই পেয়েছিলাম এবং জাকির হোসেন দরজার কাছে ছিলেন। শহরতলির একটি স্টেশনে কয়েকজন কর্মরত মহিলা হয় ট্রেনের জন্যে নয়তো সঙ্গীদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তারা জাকির হোসেনকে দেখে তাঁর নজর কাড়বার জন্যে ফিকফিক করে হাসছিল। তাদের হাসিতে যখন তিনি সাড়া দিলেন, তখন তারা আরও জোরে হাসতে শুরু করে। আমি তাঁর কাছেই ছিলাম এবং তাঁর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিলাম। তাঁর চোখে ছিল বিরক্তি, হতাশা। ট্রেন যেই চলতে শুরু করল, তিনি ফরাসি থিয়েটারের কায়দায় তাদের দিকে চুমু ছুড়ে দিলেন।

গারদা ফিলিপস্‌বর্ন ছাড়াও তাঁর অনেক বন্ধু ছিল। গ্যেটের চাইতেও তাঁর বান্ধবীর সংখ্যা বেশি এই বলে মাঝে মধ্যে আমি তাঁকে রাগিয়ে দিতাম। যাদের জানি তাদের নাম করতাম। তাঁর মেজাজ অনুযায়ী কখনও তিনি সেই তালিকায় নাম যোগ করতেন, কখনও বিষয়টি অগ্রাহ্য করতেন। তাঁর অধিকাংশ বান্ধবী ছিল ইহুদি। তাদের মধ্যে হেটু অবিবাহিত। বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। বিরাট মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল। দেহের ওজনের জন্যে সামনের দিকে ঝুঁকে থাকতেন। তাঁর কালো ডাগর চোখ দুটোয় ছিল বিষাদের ছায়া। তার দিকে তাকাতে গেলে আমার যথেষ্ট সাহসের দরকার হতো। এমনকী আমি কখনও তাঁর সঙ্গে কথা বলিনি। জাকির হোসেনের

প্রতি তিনি এতটাই মনোযোগী ছিলেন যে সবসময় তাঁর জন্যে কিছু করার কথা ভাবতেন। তিনি জাকির হোসেনের গবেষণাপত্রের অনুবাদ করেন এবং টাইপ করে দেন। তাছাড়াও অন্য অনেক কাজ করতেন। তার পক্ষে এটাই যথেষ্ট ছিল না। তিনিই যে জাকির হোসেনের একমাত্র বান্ধবী নন, এই ভাবনায় তিনি কষ্ট পেতেন। এই মর্মবেদনার কোনও প্রতিকারও ছিল না।

যে তিন বছর জাকির হোসেন জার্মানিতে ছিলেন নানা কারণে সেই সময়টা ছিল তাঁর জীবনে সবচেয়ে সুখের। তাঁর কোনও দায়িত্ব ছিল না, ছিল না বাঁধা ধরা জীবন। যুদ্ধে সব কিছু হারিয়ে আবার মাথা তুলে উঠে দাঁড়াতে চাইছে এমন লোকেদের সঙ্গে তিনি বাস করতেন। সমস্যাসচেতন এই লোকজন কিছু আবিষ্কার করতে, কিছু সৃষ্টি করতে তখন মরিয়া। খুঁটিনাটি বিষয়ে তাদের যথেষ্ট নজর, উৎকর্ষতা ছিল প্রধান বিবেচ্য। অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করত। বিবেকী কাজকর্ম ছিল তাদের আত্মোপলব্ধির সোপান। জার্মান জীবনযাত্রা নিয়ে যারা পড়াশোনা করেছে তারা সকলেই এই দিকে গুরুত্ব দেয়নি। একথা ঠিক যে জার্মানরা যে মূল্যবোধে বিশ্বাস করতেন, সে বিষয়ে তাদের নিজেদের যথেষ্ট সংশয় ছিল। সেজন্য অন্যকে প্রভাবিত করার বদলে তারা নিজেদের সীমারেখা বাড়াবার জন্যে ব্যগ্র থাকত। গান্ধিজির ওপর রোমা রোলার বইটি খুব বিক্রি হয়। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত ভারতীয় ছাত্ররা সে সময় ভারত সম্পর্কে জার্মানদের আগ্রহ বিষয়ে ওয়াকিবহাল। এই আগ্রহ জার্মানদের মূল্যবোধ ও বৈশিষ্ট্য। জাকির হোসেনের মতো আবেগপ্রবণ ভারতীয় এই আলোড়নের বাইরে থাকতে পারেননি। জার্মানদের বুদ্ধিদীপ্ত সৌন্দর্যবোধ তাঁকে নাড়া দেয়। তাঁর অবস্থা গালিবের অনুরূপ: 'অসংখ্য বাসনা। তাদের যে কোনও একটি পূর্ণ করার জন্যে জীবন বাজি রাখা যায়।' জীবনকে তিনি নতুন ভাবে দেখতে শেখেন, চিন্তাকে লাগাম ছাড়া করে তিনি পৃথিবীকে নতুন ভাবে গড়তে চান। প্রত্যেক মানুষকে ক্রীতদাস নয়, সৃষ্টিকর্তা রূপে দেখতে চান। অবহেলিত সাংস্কৃতিক সম্পদ নিয়ে জীবনকে সমৃদ্ধ করতে চান। সৃষ্টির বিলম্বে তাঁর অধৈর্য ও অসন্তুষ্টি বেড়ে যায় ঠিকই কিন্তু তিনি যখন ভারতে শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ধারণা প্রচার করছিলেন, সে সময় আগে পোঁতা বীজে অনেক চারা হয়েছিল।

দিগ্বলয়ে ততদিনে উৎকণ্ঠার মেঘ জমতে শুরু করেছে। জামিয়া মিলিয়া ভেঙে যাচ্ছে। জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে সরকার আক্রমণ হানতে শুরু করেছে। মৌলানা মহম্মদ আলি সহ বহু শিক্ষক ও ছাত্রকে যে সময় বন্দি করা হয়। এটা ছিল সাময়িক পশ্চাদপসরণ। 1922 সালের ফেব্রুয়ারিতে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়। ওই বছর সেপ্টেম্বর মাসে তুর্কিরা আনাটোনিয়া থেকে গ্রিকদের বিতাড়িত করে, সেভরেস চুক্তি বাতিল কাগজে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে তুর্কি জাতীয় পরিষদ খলিফার ক্ষমতা কমাতে শুরু করেছে। 1924 সালে খলিফার পদ নিয়ে ভারতীয় মুসলিমদের এক

প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে তিনি কামাল-আতা-তুর্কের কাছে তার যোগে অনুরোধ জানান। কিন্তু কোনও জবাব তিনি পাননি। হালিদে-এদিব-হামের কাছে শুনেছি খিলাফত কমিটি তুর্কিতে যে টাকা পাঠিয়েছিলেন কামাল-আতা-তুর্ক নিজের দল গড়তে সেই টাকা খরচ করেন। এরপর খিলাফৎ কমিটির কাজ চালিয়ে যাবার বা জনগণের অনুদান গ্রহণ করার কোনও মানেই ছিল না। খিলাফৎ কমিটির অনুদান ছিল জামিয়-মিলিয়ার একমাত্র আয়ের উৎস। সেই অনুদান কমে যাবার ফলে জামিয়া মিলিয়া অত্যন্ত অর্থসংকটে পড়ে। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় দখল করতে পারবেন না, বুঝতে পেরে মৌলানা মহম্মদ আলি প্রকাশ্যে জামিয়া মিলিয়ার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে বলে ঘোষণা করেন। দেশে হতাশা ও ব্যর্থতার যে মহামারী তখন চলছিল অন্য নেতারা তার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু হাকিম আজমল খান ও এ এম. খাজার মতো কয়েকজন কর্মকর্তা সহ কয়েকজন দৃঢ়-প্রত্যয়ী শিক্ষক ও ছাত্র জামিয়া মিলিয়ার প্রতি দায়বদ্ধতা বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। খিলাফৎ নেতাদের হতাশায় তাঁরা ভেঙে পড়েননি। গঠন কমিটির সভায় 1925 সালের 29 জানুয়ারি গান্ধিজি উপস্থিত থেকে তাঁর সমর্থন ঘোষণা করেন। তাঁর সমর্থনে উদ্বুদ্ধ হয়ে হাকিম আজমল খান আলিগড় থেকে জামিয়া মিলিয়া দিল্লিতে সরিয়ে আনেন। সে সময়কার দিল্লির অবহেলিত উপকণ্ঠ কেরলবাগে এর জন্যে জায়গা পাওয়া যায়।

বন্ধুরা জাকির হোসেনকে জামিয়া মিলিয়ার দুরাবস্থার কথা বলে। আমার সঙ্গে বা আমার উপস্থিতিতে অন্যের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তায় তাঁকে কখনও জামিয়া মিলিয়ার কাজকর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ বলে মনে হয়নি। চ্যাটো ব্যতীত অন্য কারও সঙ্গে তিনি বিশেষ রাজনৈতিক আলোচনা করতেন না। চ্যাটো জার্মানিতে বসবাসকারী অন্য ভারতীয়দের মতো তাঁকে সাম্যবাদে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। এই সমস্ত আলোচনায় তিনি গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করতেন বলে আলোচনায় যিনি প্রায়ই অংশ নিতেন সেই এন. জি. গনপুলের কাছে আমি শুনেছি। 1925 সালের প্রথম দিকে একদিন আমার উপস্থিতিতে ড. আবিদ হোসেনের সঙ্গে তাঁর জামিয়া মিলিয়া নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। জাকির হোসেন বলেন, যে কোনও মূল্যে জামিয়া মিলিয়াতে কাজ করার জন্যে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আবিদ হোসেন তাঁর সঙ্গে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমিও সম্মতি জানাই। জাকির হোসেন সন্দিগ্ধভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তোমার যোগ দেওয়া উচিত নয়।' আমি কারণ জানতে চাইলাম। তিনি বলেন জামিয়া মিলিয়া আমার পক্ষে উপযুক্ত জায়গা নয়। আমি পুনরায় বলি, জামিয়া মিলিয়া তাঁর পক্ষে উপযুক্ত হলে আমার পক্ষে নয় কেন। তিনি বলেন তাঁর কথা স্বতন্ত্র, কেননা তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ। আমি তারপরেও যোগ দেবার কথা বলায় তিনি তীক্ষ্ণ গলায় বলেন, 'দেখো, তোমাকে যদি একটা

গাড়িতে করে দিল্লি নিয়ে গিয়ে কোনও উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড় করিয়ে বলি এখানেই জামিয়া মিলিয়া, তুমি কি করবে?' আমি জানাই, কোনও উন্মুক্ত প্রান্তরকে তিনি জামিয়া মিলিয়া বলতে পারলে আমিও তাকে জামিয়া মিলিয়া বলতে পারব। ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। আমার শেষ কথা শুনে তিনি বলেন, 'ঠিক আছে, তুমিও যোগ দেবে।'

শীঘ্রই আমরা হাকিম আজমল খান এবং ড. আনসারির সঙ্গে দেখা করি। একটি তারবার্তায় আমাদের তিনজনের জামিয়া মিলিয়াতে কাজ করার সংকল্পের কথা জানিয়ে দিই। অনুরোধ করি আমাদের না ফেরা পর্যন্ত জামিয়া মিলিয়া সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করতে।

1926 সালে ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে আমরা এস. এম ডারফ্লিঙ্গার জাহাজে ফিরে আসি। কলম্বোতে নেমে সেখান থেকে ট্রেনে চড়ি। জাকির হোসেন সোজা জামিয়া মিলিয়াতে যান। সেখান থেকে ঝটিকা সফরে কাইমগঞ্জ। আমি দিন ছয়েক বাড়িতেই ছিলাম। তারপর ড. আনসারি তারযোগে আমাকে দিল্লিতে ডেকে পাঠান।

জামিয়া মিলিয়া কোনও ফাঁকা জায়গায় ছিল না। রাস্তার ধারে লতিফ মঞ্জিল নামে একটা লম্বা বাড়ির দোতালায় ছাত্রাবাস, কর্মচারীদের থাকার জায়গা, প্রার্থনা ও আহারের জায়গা। বিপরীত দিকের চারটে বাড়ির মধ্যে দুটিতে ছাত্রদের পড়ানো হতো, একটিতে ছিল পাঠাগার, অন্যটিতে কার্যালয়।

দণ্ডাদেশ থেকে রেহাই পেয়েছে এমন ভাবে জামিয়া সম্প্রদায় হোসেনকে স্বাগত জানায়। শাইকুল জামিয়া কার্যালয়ের পাশে একটা ঘর তাঁকে দেওয়া হয়। একের পর এক নেতারা গুরুভার বলে যে পদ ছেড়ে দিচ্ছিলেন কোনও রকম আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই তিনি সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জাকির হোসেন যখন উপস্থিত হন, সে সময় তাহির এস. মুহম্মদি সেই পদে কাজ করছিলেন। বিবেক বুদ্ধিমতো তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। যে-সব শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে কাজে শিথিলতা দেখা দিয়েছিল তাদের তিনি কাজে আগ্রহী করে তোলেন। জাকির হোসেন যোগ দেওয়ায় যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, তাতে মুহম্মদি ও তাঁর অবদানের কথা সকলে ভুলে যায়। এজন্যে তিনি খুবই ক্ষুব্ধ হন এবং জামিয়ার সমস্ত রকমের কাজকর্ম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে শুধু পড়ানো নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। জাকির হোসেনের সমস্ত রকমের আপোষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

অনিশ্চিত অবস্থার সঙ্গে আপোষ করা জামিয়া সম্প্রদায়ের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। আলিগড় থেকে দিল্লি স্থানান্তর প্রয়োজনীয় ও সঠিক সিদ্ধান্ত হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে অনেকেই তা মেনে নিতে পারেনি। 1925 সালের অগস্ট মাসে যখন জামিয়া মিলিয়া পুনরায় চালু হয় তখন ছাত্র-শিক্ষক মিলিয়ে মাত্র আশি জন ছিলেন।

এরা অতীতকে ভুলে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে ভালোবাসত। তাহির এম মুহম্মদির নির্দেশে শিক্ষাসংক্রান্ত নিয়মাবলি মেনে চলাই ছিল ধারাবাহিকতা বজায় রাখার একমাত্র উপায়। ভয়-ভীতি আশা-আকাঙ্ক্ষা আবেগ-উচ্ছ্বাস জামিয়ার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে কিছু করার মিনতি, সব মিলিয়ে এক পরিস্থিতির সামনে জাকির হোসেনকে পড়তে হয়। তাঁর অবস্থা সে, সময় বাড়ির ঠিকাদারের মতো। যার দক্ষ এবং আধা-দক্ষ কর্মীরা কাজ শুরু করার জন্যে তাগিদ দিচ্ছে, এমনকী আধা-বেতন বা বিনা বেতনে কাজ করতেও তারা আগ্রহী। শুধুমাত্র সাহসী নেতৃত্ব নয়, এক ধরনের আত্মবিস্মৃতি যা শারীরিক অস্তিত্বকে অলৌকিক করে তোলে, তাই মানুষ তাঁর কাছে চায়। লোকে আরও চাইত তাঁর কোনও ব্যক্তিগত চাহিদা থাকবে না, অন্যের ইচ্ছা ও প্রয়োজন মেটাবার জন্যে যে কোনও ব্যাপারে সান্ত্বনা ও উপদেশ দেবার জন্যে তিনি সর্বদা সকলের নাগালের মধ্যে থাকবেন, এমনকী অপর পক্ষ যতক্ষণ না ক্ষান্ত দেয়, অলস আলোচনা চালাতে হবে। নিজেদের সমস্যা নিয়ে যে সহকর্মীরা তাঁর কাছে গেছেন তারা সবাই প্রবাদতুল্য আরোগ্য-স্পর্শ পেয়েছে বলে স্বীকার করেন।

সহকর্মীরা যত উচ্চ ধারণা পোষণ করুন না কেন, জাকির হোসেন অনুভব করেছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর বিশেষ কোনও মর্যাদা নেই। তাঁকে বিশেষভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের কথা ভাবতে হয়েছিল কারণ, হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্কে যে চিড় ধরেছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে জামিয়া প্রশ্নে সহযোগিতা আশা করা অবাস্তব। মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে তাঁকে হাকিম আজমল খান ও ড. এম এ আনসারির ওপর নির্ভর করতে হয়। একাজ করার জন্যে তারা দুজনেই যথেষ্ট ব্যাগ্র ছিলেন। চিকিৎসক হিসাবে দুজনের পসার ছিল, রাজনৈতিক নেতা ও সমাজসেবী হিসাবে খ্যাতি ছিল, অসুবিধা সত্ত্বেও নানারকম প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল। জামিয়ার উপাচার্য হিসাবে হাকিম আজমল খানকে বেশি দায়িত্ব নিতে হয়। প্রকৃতি ও কৃষ্টিতে তিনি ছিলেন সতর্ক ও ধৈর্যশীল। তাঁর দিকে একবার তাকিয়েই দর্শনার্থীরা নিজেদের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ করতে বাধ্য হতো। সাক্ষাৎকার অনুমোদন করলে, সাক্ষাৎকারীকে তাঁর কাছে অমাত্যের মতো সৌজন্য ও সৌন্দর্যসচেতন হতে হতো। বয়সে ছোট বা কম পদমর্যাদাসম্পন্ন কারও সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করলে তিনি সব সময় উপস্থিত থাকবেন, এমন বাধ্যবাধকতা ছিল না। জাকির হোসেনকে অনেকবার কেরলবাগে থেকে শহরের কেন্দ্রস্থলে বল্লিরামনে হাকিম আজমল খানের বাড়ি এসে, তাঁর দেখা না পেয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। এ-সময় গাড়ি ভাড়া দেবার মতো পয়সা হোসেনের কাছে থাকত না। কিন্তু তিনি জানতেন এমন ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। তিনি আরও জানতেন যে তাঁর সততা আন্তরিকতা সাহস ও কৌশল সম্পর্কে হাকিম আজমল খান অত্যন্ত উঁচু ধারণা পোষণ করেন। জাকির হোসেনও তাঁকে যথেষ্ট

শ্রদ্ধা করতেন। এই জন্য সাক্ষাৎকার বানচাল হলেও তাদের সম্পর্কে কোনও চিড় ধরেনি। সংস্কৃতি সম্পর্কে আনসারির ধারণা ছিলো আধুনিক। তিনি স্পষ্টভাষী দিলদরিয়া ছিলেন। তাঁর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ছিল। নিজের উদারতার জন্যে অনেক সময় তাঁকে অসুবিধায় পড়তে হতো এবং রাজনীতিতে বেশি সময় দেওয়ার জন্যে তাঁর আয়ু যথেষ্ট কমে যেত।

জামিয়া সম্পর্কে কিছু করার সময় নেই, এমন নেতাদের ওপর অসহ্য নির্ভরতার কারণ হলো শুধু তাঁরাই রাজন্যবর্গ ও জমিদারদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারতেন। এঁদের দেখা পাবার জন্যে তাঁদের মর্জির ওপর নির্ভর করতে হতো। দৈবাৎ তাদের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থা ও শিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে এদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কেমন তা জানতে হতো। জামিয়া প্রসঙ্গ আলোচনায় উঠলেও এই প্রসঙ্গে ইংরাজ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে একজনকে সচেতনভাবে কথা বলতে হতো। আমার মনে আছে রামপুরের নবাবের এক পরিষদ একবার এই প্রশ্ন তুলেছিলেন। হাকিম আজমল খান এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ঘরের পর্দা সরিয়ে দেবার অনুরোধ করেন। ধারাবাহিকতা নষ্ট হওয়ায় আলোচনা সেদিন অন্য খাতে বইতে শুরু করেছিলো।

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া ধৈর্যের চরম পরীক্ষা ছিল। জাকির হোসেন তা জানতেন। অপর দিকে, সংগঠিত প্রচারের মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের সমর্থন যোগাড় করা এবং অর্থ সংগ্রহে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে, আশাপ্রদ ফল পাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু অল্প সংখ্যক শিক্ষক নিয়ে নিয়মিত শিক্ষাচর্চার সঙ্গে সঙ্গে অর্থ সংগ্রহ অসম্ভব। একথা মনে রাখা দরকার যে মুসলিম জনগণ ইসলামের ঐতিহ্য অনুসারে শিক্ষা প্রসারের বিরুদ্ধে ছিলেন না, কিন্তু জাতীয়তাবাদের তথ্য বা প্রয়োগের সঙ্গে শিক্ষার মিশ্রণকে তাঁরা অপছন্দ করতেন। জনসমর্থন পাওয়ার জন্যে তাঁদের মত পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল।

কখনও একা, কখনও হাকিম আজমল খানের সঙ্গে হোসেন অর্থ সংগ্রহ করতে যেতেন। টাকা থাক বা না থাক, আর অনেক করণীয় কাজ আছে। এই ভাবটা তাঁকে বজায় রাখতে হতো। দিনের পর দিন সাদা খদ্দরের মোড়া কার্পেটের ওপর পা মুড়ে বসে তাকে লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে, আফিসের কাজকর্ম করতে বা চিঠি লিখতে দেখা যেত। তাঁর কোনও সচিব ছিল না, এবং যারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন; তাঁরা কখন-ই আগে থেকে ব্যবস্থা করে আসতেন না। সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত তিনি একটানা কাজ করতেন। এর মধ্যে, এমনকী প্রকৃতির ডাকেও, সাড়া দিতেন না। তিনি কখনও কারও সঙ্গে কটু কথা বলতেন না, কারও ওপর রাগ করতেন না। কোনও কাজের পরিকল্পনা নিয়ে কেউ তাঁর কাছে এলে তিনি দর্শনার্থীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করতেন যে তাঁর মনে হতো তিনি জাকির

হোসেনকে অনুপ্রাণিত করেছেন। জাকির হোসেন যে পরামর্শ দিয়ে মূল পরিকল্পনায় পরিবর্তন করেছেন, একথা দর্শনার্থীর কখনও মনেই হতো না। সাধারণত অভ্যর্থনা, ঘরোয়া আলোচনা ও প্রদর্শনী এক তালে চলত। এই সমস্ত আলোচনায় জাকির হোসেন যে সমস্ত পরিকল্পনা পেশ করতেন তাঁর সবচেয়ে করিৎকর্মা সহকর্মী তা ভাবতেও পারতেন না। কাজের লোকদের তিনি যথেষ্ট কাজ দিতেন। অলস অথচ বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় তাঁর অনেকটা সময় নষ্ট হতো। তাঁর সৌজন্যবোধ সানন্দে বোকাদের এই অত্যাচার মেনে নিতো।

1926-এর জুন মাসে হোসেন, আবিদ হোসেন, শাফিকুর রহমান কিদওয়াই এবং আমি গান্ধিজির সঙ্গে দেখা করতে সবরমতি আশ্রমে যাই। বিশেষ কারণে, আমাদের যাবার সময় জানিয়ে তারবার্তায় আমার নাম দেওয়া হয়। আমার নাম ভুল করে মুনজে বলে পড়া হয়েছিল, যার সঙ্গে গান্ধিজির সবে মতপার্থক্য হয়েছে। আশ্রম কার্যালয়ে এই তারবার্তায় অবহেলায় পড়ে থাকে এবং আমরা অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথি হিসাবে হাজির হই। যাইহোক আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় এবং পরদিন সকালে ভুল স্বীকার করা হয়। গান্ধিজির কুটিরে প্রাতঃরাশের জন্যে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমরা এক সারিতে বসেছিলাম এবং বা আমাদের খাবার পরিবেশন করছিলেন। কস্তুরবা গান্ধিকে আদর করে 'বা' বলে ডাকা হতো। এমন সময় পিছন থেকে 'কী সুন্দর!' এই কথা শুনে আমরা গান্ধিজিকে লম্বা লাঠি নিয়ে আসতে দেখলাম। কাছের একটা খাটিয়ায় তিনি বসলেন। তাঁর সারা মুখে খুশির হাসি। ভোরবেলার প্রার্থনা সভার বৈদিক মন্ত্র এখনও আমার কানে বাজছে।

গান্ধিজি ও হোসেনের এই প্রথম সাক্ষাৎকার। তাঁরা দুজনেই পরস্পরকে গভীর আস্থায় গ্রহণ করেছিলেন। জামিয়ার অবস্থা এবং অর্থসংগ্রহ নিয়ে তাঁদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। গান্ধিজি বলেন, তিনি ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু তাঁর আশঙ্কা, তাহলে মুসলিমদের মধ্যে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। জামিয়াকে সম্পূর্ণভাবে মুসলিম প্রতিষ্ঠানরূপে তিনি দেখতে চান। জাকির হোসেন তাঁর সম্মতি জানান। তিনিও মনে করতেন, শুধু মুসলিমদের কাছ থেকেই জামিয়ার জন্যে অর্থ সংগ্রহ করা উচিত। গঠনমূলক পরিকল্পনার জন্যে অর্থ সংগ্রহে গান্ধিজির বার্মা যাওয়ার কথা ছিল। তাঁর সঙ্গে মুসলিম প্রতিনিধি দলের যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে দিল্লিতে আলোচনা হয়, যদিও কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। তথাপি এই আলোচনার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া ছিল। গান্ধিজি আশ্বস্ত হয়েছিলেন এই দেখে যে জামিয়ার নেতৃত্ব একজন ভদ্র মুসলিমের হাতে এসেছে, যিনি মনেপ্রাণে হিন্দু মসুলিম ঐক্যের প্রবক্তা। জাকির হোসেন অনুভব করেছিলেন, তাঁর পিছনে গান্ধিজির সমর্থন আছে এবং ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জাতীয় জীবনে সঠিক নিশানার জন্যে তিনি গান্ধিজির ইচ্ছাকে কার্যকরী করতে পারবেন। এই বোঝাপড়া এবং বিশ্বাস সময়ের সঙ্গে বাড়তে থাকে।

আমেদাবাদ থেকে হোসেন হায়দ্রাবাদ রওনা হন। কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়। নিজামের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় আছে, এমন দাবিদার এক নেতার কথা মতো কাজ করে তিনি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। পরবর্তিকালে তিনি সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে যথেষ্ট ফলপ্রদ তা হয়। নিজে চেষ্টা করলে তিনি অনেক বেশি সফল হতেন। কিন্তু, জাকির হোসেন বয়স্কদের প্রাপ্য সম্মান দিতে কুণ্ঠা করতেন না। অন্যথায় নিজের ওপর বেশি আস্থা রাখা ও উচ্চাশার অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত করা হতো এবং তাদের সমর্থন চিরতরে হারাতে হতো। হাকিম আজমল খানের মৃত্যুর পর অর্থ সংগ্রহের জন্যে 'আজমল জামিয়া তহবিল' তৈরি করা হয়। সমস্ত বিখ্যাত মুসলিম এবং কয়েকজন হিন্দু[4] নেতাদের সম্মতিতে গৃহীত এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর জাকির হোসেনের পরামর্শে ড. আনসারি পুরানো ট্রাস্টিদের বাতিল করে আঞ্জুমান-তালিম-ই মিল্লি[5] নামে নতুন সংগঠন তৈরি করেন। আনসারি সভাপতি, জাকির হোসেন সম্পাদক এবং শেঠ যমুনালাল বাজাজ কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। জামিয়ার অপূর্ণ কাজ শেষ করার দায়িত্ব এই সমিতি গ্রহণ করে। এখানে দু ধরনের সদস্য ছিল। সংযুক্ত সদস্য এবং মাসে সর্বোচ্চ 150 টাকা বেতনে আগামী কুড়ি বছরের জন্য কাজ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সদস্য। সব সদস্যই ছিলেন জামিয়ার কর্মচারী। সমিতির সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে জামিয়া স্বশাসিত সংস্থায় পরিণীত হয়। রাজনৈতিক নেতাদের মর্জির ওপর আর নির্ভর করার দরকার হয় না। এরপর থেকে জাকির হোসেন অনেক স্বাধীনভাবে কাজ করতে পেরেছিলেন।

---

4. 1928 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত ওই সভায় হাকিম আজমল খানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় এবং 'আজমল জামিয়া তহবিল' গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় উপস্থিতির তালিকায় পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মৌলানা মহম্মদ আলি, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, মৌলানা আজাদ, ড. এম. এ. আনসারি, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রী বিজয়রাঘবাচার্য, মামুদবাদের মহারাজ ড. লালা শঙ্কর লাল, শ্রী টি প্রকাশন, সর্দার শার্দূল সিং প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম ছিল।

5. জাতীয় শিক্ষার জন্যে গঠিত সমিতি।

জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া গঠন

1928 সালে জাকির হোসেন শিক্ষক সম্প্রদায়ের প্রধান হন। নেতৃত্বের সব দায়িত্ব তাঁর ওপর বর্তায় কিন্তু কার্যত তিনি বিশেষ কোনও সুযোগ সুবিধা পেতেন না। তিনি নিজেও তা চাননি। ফিরে এসে তিনি যখন জামিয়া মিলিয়াতে যোগ দেন তখন তাঁকে মাসে 100 টাকা বেতন দেওয়া হতো। সে সময় ইয়োরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত তাঁর দুই সহকর্মী মাসে 300 টাকা বেতন পেতেন। নিয়মিত বেতন দেওয়া তখন জামিয়ার সাধ্যাতীত। তাঁর উচ্চ বেতনের সহকর্মী শীঘ্রই 100 করে বেতন নিতে সম্মত হন। জাকির হোসেন 80 টাকা বেতন নেবার সিদ্ধান্ত নেন। ঠিক হয় 60 টাকর ওপর যাদের মাইনে তাদের অর্ধেক মাইনে নগদে এবং বাকি অর্ধেক তাদের নামে জমা থাকবে। সেই মতো জাকির হোসেন মাসে নগদে 40 টাকা পেতেন। 1944 সাল পর্যন্ত তিনি একই মাইনে পেতেন। সেই বছর থেকে শিক্ষকদের পুরো মাইনে দেওয়া শুরু হয় এবং বকেয়া সমস্ত পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হয়। 1948 সালে উপাচার্য হওয়া পর্যন্ত তাঁর মাসিক মাইনে ছিল 80 টাকা।

জামিয়ার মাইনের ওপর তিনি নির্ভর করতে পারতেন না। কাইমগঞ্জে হোসেনের কিছু জমি ছিল। হোসেন কিছুতেই সেখান থেকে কোনও অর্থ আদায় করতে পারতেন না। হিসাবে আয়-ব্যয় সমান দেখানো হতো। সব সময় যে তিনি অর্থাভবে ভুগতেন[1] কেউ তা জানতেন না। জামিয়া মিলিয়ার হিসাবরক্ষকও জানতেননা; কেননা হোসেন কখনও মাইনে চাইতেন না। টাকার দরকার হলে তিনি নম্রভাবে স্ত্রীর কাছে হাত পাততেন। মেজাজ অনুযায়ী তিনি কখনও প্রতিবাদ করতেন, কখনও দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। তারপর বাড়ির ছোট চাকরটিকে নিকটবর্তী দোকানদার সুব্বার[2] কাছে অথবা ঠিকাদার মানুখানের স্ত্রীর কাছে টাকা ধার করতে

---

1. আয় বাড়াবার জন্যে তিনি ফ্রেডরিক লিস্টের 'ন্যাশনলকনোমি' এর অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন আঞ্জুমান তারিক্কি-ই-উর্দুর জন্যে।

2. লেখার সময় পর্যন্ত সুব্বা বেঁচে আছেন, তবে অন্ধ হয়ে গেছেন। উপরাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রপতি থাকার সময় জাকির হোসেনের কাছ থেকে পাওয়া আতিথেয়তায় তিনি মুগ্ধ।

পাঠাতেন। বেগম হোসেন তার পিতামহের সম্পত্তি থেকে 10 টাকা মাসোহারা পেতন। সংসার চালাতে এই টাকাটা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত থাকতেন।

এই অবস্থাতেও হোসেন হাতে বোনা তাঁতের কাপড়ে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেন। তাঁর স্বাভাবিক মর্যাদায় একজন কেতাদুরস্ত অভিজাত ভদ্রলোক অনাড়ম্বর জীবন যাপন করছেন, এই ভাবটা প্রকাশ পেত। তাঁর কাছে কেউ টাকা ধার চাইলে তিনি কাউকে নিরাশ করতে পারতেন না। কেননা হোসেনের টাকা ধার দেবার মতো অবস্থা নেই, এই কথাটা বিশ্বাস করত না। কাইমগঞ্জ থেকে তাঁর পরিবার পরিজনদের দিল্লি নিয়ে আসার পূর্বে তিনি ভাড়া বাড়িতে ব্যবহারযোগ্য কিছু আসবাব কিনেছিলেন। একজন সহকর্মীর বাবা, শাহ সাহেব ডাক বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন। তিনি জাকির হোসেনের কাছ থেকে বেতের চেয়ারগুলি নিয়ে যান। সাক্ষাৎপ্রার্থী ও প্রতিবেশীদের তিনি বলতেন, তাঁকে শ্রদ্ধা দেখিয়ে হোসেন ওইগুলি উপহার দিয়েছেন। পরের মাসে হোসেন আরও কয়েকটি চেয়ার কেনেন। আমি তখন হোসেনের পাশের ঘরে থাকতাম এবং তাঁর কাছ থেকেই প্রথম দফার চেয়ারগুলি সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম। একদিন সকালে হোসেন বলেন, শাহসাহেব দ্বিতীয় কিস্তির চেয়ারগুলিও নিতে চান। আমি দেখলাম দুজন মজুর নিয়ে শাহ সাহেব চেয়ারগুলি নিতে এসেছেন। আমি মেজাজ হারিয়ে ফেললাম এবং শাহ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কী জাকির হোসেনের সব কিছুই নিয়ে নিতে চান। শাহ সায়েব দুঃখ পান এবং ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। হোসেন খুব মুষড়ে পড়েন: 'মুজিব সায়েব, আপনি কি করলেন!' কিন্তু আমার মনে কোনও কষ্ট ছিল না। এরপর কোনও আসবাবপত্র আর কেউ নিতে আসেনি।

1927 সালের শরৎকাল থেকে ওকলায় জামিয়া মিলিয়া প্রাঙ্গণে যাওয়ার আগে পর্যন্ত হোসেন সপরিবারে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। তিনটি বিভিন্ন মাপের ঘর এবং রাস্তার দিকে এক টুকরো বারান্দা। ভেতরে একটা চওড়া বারান্দা। ওপাশে বাথরুম, রান্নাঘর ও দালান। পিছনের দরজা দিয়ে গলিতে যাওয়া যেত। দিল্লির প্রত্যন্ত-প্রান্ত কেরলবাগে জামিয়া অবস্থিত ছিল। পানীয় জল ও বিদ্যুৎ ছিল না, পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা অত্যন্ত জঘন্য ধরনের। পরিচ্ছন্ন ও ভদ্রভাবে যারা জীবন যাপন করতে চান, তাদের অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনও গতি ছিল না।

হোসেন ও তাঁর স্ত্রী আলাদা রকম নিয়ম মেনে চলতেন। 'ভোর চারটের সময় ছাগলগুলো ডাকতে শুরু করলে বেগম হোসেন ঘুম থেকে উঠে পড়তেন। নিজে ছাগলদের খাওয়াতেন। আমার সময় আসত পরে। নিজের পক্ষে যা ভাল মনে হতো, তিনি তাই খেতেন : 'দিনের কাজের জন্য তৈরি হয়ে আমি আমার প্রাতঃরাশ শেষ করতাম। বেড়ালের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আমার খাবার ঝুড়ি দিয়ে ঢাকা থাকত।' এভাবেই হোসেন কথা বলতেন। বেগম হোসেন নিয়ম মেনে চলতে পছন্দ

করতেন। আমি দু দফায় দীর্ঘদিন ধরে তাদের বাড়িতে থেকেছি, কোনওদিনই খাবার দেরিতে দেওয়া হয়নি। সময় হলেই বাচ্চা চাকর খাবার নিয়ে আমার ঘরে ঢুকত। পাঠান রীতি অনুযায়ী পুরুষ ও মহিলা একসঙ্গে খায় না। বেগম হোসেন সম্ভবত সেই প্রথা ভাঙতে চাইতেন না। যাইহোক, হোসেন সময়ানুবর্তী হতে চাইলে যথাসময়ে গরম খাবার পেতে পারতেন। বেগম হোসেন নিজের নিয়ম মেনে চলতেন। তাতে পারস্পরিক সুবিধা হতো। হোসেনের দেরি হলেও বেগম রাগারাগি করতেন না আর হোসেন সময়ের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতেন। বেগম হোসেন যখন আমার সামনে পর্দা ছাড়া[3] আসতে শুরু করেন, তখন থেকে আমি তাঁদের কথাবার্তায় স্বাধীনভাব লক্ষ করেছি। সব সময়ই তাঁরা একে অপরের কথা বলতেন যেন সেটাই কথোপকথনের সঠিক উপায়।

সকাল আটটায় এক বা দু থালা খিচুড়ি[4] দিয়ে হোসেন প্রাতঃরাশ করতেন। পরের খাবার সাড়ে চার-পাঁচটার সময় ঝুড়ি থেকে বের করে খেতেন। তারপর সামান্য বিশ্রাম, কখনও মামুলি বিষয়ে আলোচনা হতো, কখনও কারও ঘরে, কখনও রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েই। তাঁর সহকর্মীরা এই আলোচনার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তিনি ভাববাচ্যে এবং ঘুরিয়ে কথা বলতে ভালবাসতেন; প্রয়োজন ছাড়া কখনওই পরিষ্কার ও সরাসরি কথা বলতেন না। আলোচনায় অন্যেরা যা বলতেন, তিনি তার বিপরীত কথা বলতেন, ফলে তর্কের সৃষ্টি হতো এবং অন্যের বুদ্ধির দৌড় বোঝা যেত। এই সমস্ত আলোচনা আপনা থেকেই শেষ হতো। অসর্তকরা ভাবত হোসেন যা বলছেন তা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন কিন্তু যদি কেউ তাঁর আগে বা পরের কথা মনে করতে পারত, তাহলে তাকে ভ্যাবাচাকা খেতে হতো। তারা দেখত হোসেনের বুদ্ধিদীপ্ত অবস্থানের সঙ্গে তাঁর কাজের কোনও সামঞ্জস্য নেই। হোসেনকে কোনও একটা দলে ফেলার চেষ্টা তারা ত্যাগ করেছিল। যতই বিভ্রান্তিকর হন না কেন তারা তাঁর সঙ্গে ছিল। তিনিও তাদের সঙ্গে ছিলেন।

1930 সালে টিবিয়া কলেজের[5] রাসায়নিক গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান ড. সালেজ্জুমান সিদ্দিকি যোগ দেন। তখন থেকে জাকির হোসেনের সান্ধ্যকালীন নিয়ম কানুন পালটে যায়। ড. সিদ্দিকি একজন খ্যাতনামা রসায়নবিজ্ঞানী চিত্রকর সুরকার ও খুব ভাল কথক ছিলেন। বহুদিন ইয়োরোপে থাকলেও তাঁর স্বভাবের কোনও

---

3. আগন্তুকের সামনে পর্দাহীন ভাবে না আসার প্রচলিত রীতি।

4. চাল ও ডাল একত্রে রাঁধা একটি পদ।

5 প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্যে প্রতিষ্ঠিত। হাকিম আজমল খান 1916 সালে প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু কার্যত চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়েছিল অনেক আগে।

পরিবর্তন হয়নি। কাজে খুব সতর্ক ছিলেন। বিজ্ঞানজগতে তার যথেষ্ট সম্মান ছিল। এগারোটা থেকে সাড়ে ছটা বা সাতটা পর্যন্ত তিনি পরীক্ষাগারে থাকতেন। কাজের পর তিনি কিন্তু একজন আয়েসী ভদ্রলোক, যিনি ভদ্রলোকদের স্ব-আরোপিত নিয়ম ভাঙতে পছন্দ করতেন। আটটার সময় চা পান করতেন এবং সাড়ে দশটা থেকে একটার মধ্যে যে কোনও সময়ে রাতের খাওয়া সারতেন। মেজাজি জীবনধারার সঙ্গে মানিয়ে নেবার মতো স্বাস্থ্য ছিল তাঁর। তার জার্মান স্ত্রী টিল্লি স্বদেশীয়দের মতো প্রতিটি সমস্যায় যুক্তিগ্রাহ্য দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতেন, প্রায় প্রতিটি বিষয়ে স্বামীর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতেন, কিন্তু অনিয়মে অভ্যস্ত ছিলেন। দর্শন ও সাহিত্যবিষয়ক উচ্চস্তরের আলোচনায় তাঁর আসক্তি ছিল কিন্তু বিজ্ঞানবিষয়ক কাজকর্মে উৎসাহ ছিল না। কেরলবাগে বাস করতে এসে হোসেনের সঙ্গ তার কাছে ভগবানের দানের মতো। জামিয়া মিলিয়া বাঁধাধরা কথাবার্তার বাইরে এসে এই দম্পতির সঙ্গে সান্ধ্য আড্ডায় হোসেন দুঃশ্চিন্তামুক্ত হতেন। কিন্তু, তিনি যা খেতেন, বিশেষ করে জামা মসজিদ থেকে আনা প্রচুর মশলাযুক্ত কাবাব, তাঁর হজম শক্তির ওপর চাপ ফেলত। পরবর্তিকালে তাঁর অসুখের অন্যতম কারণ এটি। তিনি নিজেই বলতেন ঐতিহ্যমণ্ডিত কাবাবের জন্যে এই ঝুঁকি নেওয়া যেতে পারে।

না আসার জন্যে বলা, পরামর্শ দেওয়া এমনকী সতর্ক করা সত্ত্বেও 1932 সালের ডিসেম্বরে গারদা ফিলিপসবর্ন ভারতে আসেন। তাঁর অন্য উপায়ও ছিল না। জার্মানির ঘটনা ইহুদিদের পক্ষে অত্যন্ত অশুভ ছিল। তাঁর ছিন্নমূল পরিবার নির্বাসনের সম্মুখীন হন। প্রথমে তিনি প্যালেস্টাইন যান, সেখানে কিছু দিন কাজ করে হোসেনকে ভারতে আসার কথা জানান। তাঁকে আসার খরচ দেওয়া হয়েছিল এবং জাকির হোসেন বম্বে গিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। জামিয়া মিলিয়ার কর্মী হিসাবে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ করা হয় 1933 সালের নববর্ষের দিনে।

ভদ্রমহিলা তো এলেন, এখন তিনি করবেন কি? প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে তার কিছু দক্ষতা ছিল কিন্তু জামিয়াতে তখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে সঠিক কোনও ব্যবস্থা ছিল না। সেজন্য তাঁকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও ছোট ছোট বাচ্চাদের হোস্টেলের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন আবদুল গফ্ফর মুধোলি। নম্র বিনয়ী অম্প্রচারহীন এই ভদ্রলোক সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতায় অন্ধ আস্থা রাখতেন। জাকির হোসেন এঁর কাছ থেকে সময়ানুবর্তিতা শিখেছেন বলে স্মরণ করেন। একবার স্কুলের সভায় পৌরহিত্য করার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করা হয়। পৌঁছতে দু তিন মিনিট দেরি হয়। সভায় হাজির হয়ে তিনি দেখেন অন্য একজনের সভাপতিত্বে সভা শুরু হয়ে গেছে।[6] আবদুল গফ্ফর মুধোলি কারও

6. আমাকেও একবার এই অবস্থায় পড়তে হয় এবং একই শিক্ষা গ্রহণ করি।

জন্যে, এমনকী হোসেনের জন্যেও অপেক্ষা করতে পারেন না। মহিলা বলে বা হোসেনের বান্ধবী বলে গারদার বিশেষ সুবিধা পাবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। ভদ্রমহিলা অনুভব করেন তাঁকে কিছু গতানুগতিক কাজের ভার দেওয়া হয়েছে। তাঁর আসলে উদ্দেশ্য ছিল হোসেনের দেখভাল করা, শিক্ষা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা, সহযোদ্ধা হিসাবে তাঁকে প্রেরণা দেওয়া এবং সর্বোপরি তাঁর কাজে নিজেকে উৎসর্গ করা। দেরিতে কাজে যোগ দেওয়া এবং ক্লাস না নেওয়ার জন্য আবদুল গফ্ফর মুধোলি তাঁর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন। আমি হোসেনের বিরক্তির কথা মনে করতে পারি। কারণ, সেই সময় ভদ্রমহিলা তাঁর সঙ্গে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সেই আলোচনা ক্লাশ নেওয়ার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

জামিয়ার সঙ্গে যুক্ত নন, এমন কারও সঙ্গে হোসেনের অবসর ভাগ করে নিতে গারদা প্রচণ্ড অনিচ্ছুক ছিলেন। উত্তেজনার আর একটা কারণ ছিল এটাই। সিদ্দিকিদের কাছে বিষয়টি ছিল যথেষ্ট বিরক্তিকর, কারণ বাস্তবে তাদের সঙ্গ অনেক বেশি আকর্ষণীয় ছিল এবং উভয়েই এই সঙ্গে যথেষ্ট বেশি মানসিক স্বাচ্ছন্দ পেতেন। কিন্তু হোসেনের সময় ও মনোযোগের ওপর গারদার দখল তাঁরা কমাতে পারেননি। তাঁরা জামিয়া বা হোসেনের প্রতি সমান ভালবাসা দাবি করতে পারতেন না। তাঁরা চোখের জলে প্রতিবাদ করতে পারতেন না। জামিয়ার প্রশ্নে গারদার[7] উৎসাহের সততা এবং জাকির হোসেনের ভালমন্দ নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ ছিল না।

আলিগড় থেকে দিল্লি স্থানান্তরের সময় যে সব শিক্ষকরা ভবিষ্যতের ঝুঁকি নিয়েও জামিয়াতে থেকে গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন বেশ কলহপ্রিয় ও চঞ্চলমতি ছিলেন। কয়েকজনের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও সন্দেহ ছিল। যাঁরা সত্যিই প্রয়োজনীয় ছিলেন, তাঁদের উৎসাহ এবং নতুন কিছু সৃষ্টি করার উৎসাহে কোনও ঘাটতি ছিল না। হোসেন যোগ দেওয়ায় সেই উৎসাহ বাস্তবায়িত হওয়ার রাস্তা খুঁজে পায়। জামিয়ার বাড়িতেই একটি নৈশ বিদ্যালয় চালু হয় এবং সত্বর অনেক পড়ুয়া যোগ দেয়। শহরের 'বড়া হিন্দুরাও' অঞ্চলে একটি শাখা বিদ্যালয়

---

7. 1943 সালে ক্যান্সার রোগে গারদা ফিলপস্বর্ন মারা যান। পেটে অসম্ভব যন্ত্রণা হতো কিন্তু তিনি বহুদিন ডাক্তার দেখাননি। পাকস্থলীর ক্যান্সার হয়েছে জানতে পেরে তিনি হোসেনকে অনুরোধ করেন সময় পেলেই তাকে কোরান পাঠ করে শোনানোর জন্যে। মুসলিমদের মতো তাঁকে কবর দেয়ার অনুরোধ করেন তিনি। সে ইচ্ছা পূর্ণ করা হয়। এই জীবনী লেখার সময় আমি বেগম হোসেনকে গারদার সঙ্গে হোসেনের সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর প্রতিক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেন, গারদার দিল্লি আসার সময় জাকির হোসেন কীভাব তাঁর পরিচিত হন, কী ভাবে তাঁদের সখ্যতা বাড়ে। তাঁর প্রতি গারদার অনুরাগকে হোসেন সম্মান করতেন, তার বেশি কিছু নয়।

চালু করা হয় মানবদরদি একজন ব্যবসায়ীর বদন্যতায়। পায়েম-ই-তালিম নামে বিশেষভাবে শিশুদের জন্যে একটি শিক্ষামূলক পত্রিকা প্রকাশ করার জন্যে আবদুল মজিদ খাজা উদগ্রীব ছিলেন। এজন্যে প্রাথমিক খরচা তিনি দিতে সম্মত ছিলেন। স্কুলে পড়ুয়া ছাত্রদের পড়ার মতো করে এই পত্রিকা পাক্ষিকরূপে প্রকাশিত হয়। 1923 সাল থেকে সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকা জামিয়া প্রকাশিত হচ্ছিল। মান উন্নয়ন করে এর প্রচার বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়। ড. আবিদ হোসেনকে সম্পাদক করে উর্দু আকাদেমি গঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের জন্যে বিভিন্ন বিষয়ে উর্দুতে বই প্রকাশ ও ব্যাপক আলোচনা সভা সংগঠন করা, এই আকাদেমির লক্ষ্য ছিল। জামিয়ার ছাত্রসংখ্যা ছিল খবুই কম। তাই জামিয়াকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার দাবিকে যুক্তিযুক্ত করার জন্যে মানুষের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার এবং শিক্ষার চেতনা বাড়াবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অর্থাভাব বড় বেশি ছিল তবুও জ্ঞানের প্রসারে ও চিরায়ত সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষার সংমিশ্রণের প্রচেষ্টায় জামিয়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতে বেশি সফল হয়েছিল।

জনসংযোগ প্রশাসন সহকর্মীদের মধ্যে শান্তি ও সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি করা এবং শিক্ষা সংক্রান্ত পরীক্ষানিরীক্ষার দায়িত্ব ছিল জাকির হোসেনের ওপর। এছাড়াও সহকর্মীদের অনীহার জন্যে তাঁকে 'জামিয়া' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। বেশ কয়েকমাস ধরে বিভিন্ন নামে তিনি সব কটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি যখন ঠিক করেন জামিয়া মিলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরিতে মনোযোগ দেবে তখন সকলে তাঁকে সমর্থন করেন। আবদুল গফফর মুধোলিকে তিনি যোগ্য সহকর্মী রূপে পান এবং তাঁকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করেন। মোগাতে পরিকল্পনা বিষয়ে তাঁকে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রশংসনীয় নির্ভুলতা ও উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে তিনি উপায় ও পন্থা নির্ধারণ করতেন। শীঘ্রই বিদ্যালয়টি শিক্ষাগত কর্মকাণ্ডের দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। শিশুরা অভূতপূর্ব আত্মবিশ্বাস, স্বতস্ফূর্ততা ও সহযোগিতার মধ্যে বেড়ে ওঠে। বিশ্ব পরিদর্শনের অঙ্গ হিসাবে নিউ এডুকেশন ফেলোশিপের প্রতিনিধিদল 1934 সালে ভারতে আসেন। তাঁরা এই বিদ্যালয়ের উচ্চ প্রশংসা করেন। শিশুদের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করা এই বিদ্যালয়ের পরিপূরক কাজ ছিল। জামিয়ার প্রকাশনা সংস্থা মাকতবার দায়িত্ব দেওয়া হয় করিৎকর্মা হামিদ আলি খানের ওপর। জাকির হোসেন যোগ্যতাসম্পন্ন সহকর্মীদের শিশুপাঠ্য বই লেখার জন্যে অনুরোধ করতেন। এমনকী নিজে একটা বই লিখে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেন।[৪] সরস কথোপকথনের ছলে লেখা তাঁর বইটি শীঘ্রই মহৎ সৃষ্টিরূপে পরিগণিত হয়। এ বিষয়ে জামিয়ার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অন্য প্রকাশকরা শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রকাশে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

---

৪. দ্বিতীয় কন্যার নাম রাকেয়া রেহানা। এই ছদ্মনামে তিনি লিখতেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজকর্ম এবং প্রকাশনা বিভাগ প্রচারিত ভাবাদর্শ জামিয়াকে চিরস্থায়ী হতে কোনও সাহায্য করবে না যদি না প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড় করা যায়। হোসেন তা জানতেন কিন্তু তিনি অধৈর্য হননি। তিনি উপযুক্ত সময়ের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। হাকিম আজমল খানের মৃত্যুর দেড় মাস পরে 1928 সনের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি ভাষণ দেননি। হাকিম আজমল খানের সাহায্য পেয়েছিলেন এমন একজন মুসলিম কোটিপতি, মাত্র 250 টাকার সাহায্য পাঠিয়েছিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসে নেতাদের উপস্থিতিতে আজমল জামিয়া তহবিল তৈরির যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তা বিশেষ কার্যকরী হবে না এ ঘটনা তারই প্রমাণ। তখন অবধি মাত্র 1500 টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। পরের বছর যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে হোসেন শুধু শেষ জামাল মহম্মদের কাছ থেকে দ্বিগুণ অর্থ যোগাড় করেন। কয়েক মাস প্রচারের পর 1930 সালের শেষের দিকে তিনি নিজাম সরকারের কাছ থেকে নগদ 50,000 টাকা ও মাসিক 1000 টাকার মাসোহারার ব্যবস্থা করেন। জামিয়া মিলিয়ার প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা উপলব্ধি করে নিজাম সরকার এই সিদ্ধান্ত নেননি, হোসেনের ব্যক্তিত্ব, কৌশলের ফসল এই অনুদান। কাইমগঞ্জের অধিবাসী এবং তাঁর আত্মীয় আরুর ইয়ার জং-এর সাহায্য তিনি পেয়েছিলেন। ইয়ার জং বিনা খরচে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন এবং অনেক জায়গায় সুপারিশ করে পাঠান। মহামান্য নিজামের মন্ত্রণা পরিষদের কাছ থেকে সাহায্য অনুমোদন করা যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য ছিল। মন্ত্রণা পরিষদের গোঁড়া রাজভক্ত, সদস্য নিজামৎ জং-এর প্ররোচনায় শেষ মুহূর্তে মাসোহারার সঙ্গে একটি শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় : মাসিক অনুদান পেতে হলে প্রতিমাসে দিল্লির চিফ কমিশনারের সুপারিশ নিয়ে আসতে হবে।

প্রেক্ষাপট মনে রাখলে আমরা হোসেনের আত্মবিশ্বাস ও কৌশলের গুরুত্ব বুঝতে পারি। লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয় 1930 সালে। জামিয়া মিলিয়ার শিক্ষক ও ছাত্রবা অত্যন্ত রাজনৈতিক সচেতন ছিলেন। তাদের অধিকাংশই গান্ধিজি ও কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। গান্ধিজির স্বরাজ তহবিলে প্রথম দান আসে জামিয়ার ছাত্র-শিক্ষকদের কাছ থেকে। প্রতি বছর এপ্রিল 7 থেকে 13 'জাতীয় সপ্তাহ' পালন করা হতো সভা সমাবেশের মধ্য দিয়ে। 13 এপ্রিল ছাত্রাবাসের রাঁধুনি চাকর পিওন ঝাড়ুদারের কাজ ছাত্র-শিক্ষকরা করতেন এবং রাতে গণ-ভোজের ব্যবস্থা থাকত। দিনটা এভাবে উদ্যাপন করা হতো। তিন চার বছর ধরে ক্যারোলবাগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার অভিযান চালানো হয়েছিল। সহনীয় অধিবাসীরাও একাজে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। লবণ সত্যাগ্রহ যথেষ্ট উত্তেজনা সৃষ্টি করে। শফিকুর রহমান কিদোয়াই এবং হাফিজ ফায়েজ আহমেদ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ইতিমধ্যে। দেবদাস গান্ধিও যোগ দেন তাঁদেব

সঙ্গে। ছাত্রদের মধ্যে সি কৃষ্ণন নায়ার ও কে সি দেগা আন্দোলনে যোগ দিতে মনস্থ করেন। জামিয়ার প্রতি সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি সেক্ষেত্রে কি হবে?

শফিকুর রহমান কিদোয়াই সহ প্রত্যেকেই জানতেন যে গুজরাত ও কাশী বিদ্যাপীঠের মতো জামিয়া মিলিয়া যদি পড়াশোনা স্থগিত রেখে জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে, তাহলে রাজনৈতিক সংগ্রামের ফলাফলের ওপরই পড়াশোনা পুনরায় আরম্ভ করার প্রশ্নটি নির্ভর করবে। স্বাধীনতা পেলে জামিয়া সবচেয়ে জনপ্রিয় মুসলিম সংগঠনরূপে পরিগণিত হবে। অন্যথায় জামিয়া খরচার খাতায় চলে যাবে। গুরুত্বপূর্ণ কোনও ঘটনার জন্যে কাজ একবার বন্ধ রাখলে সেই কাজ আবার শুরুর মতো মানসিকতা ভারতীয় মুসলিমদের নেই। জামিয়া মিলিয়ার কাজ চালু থাকবে, না বন্ধ করে দেওয়া হবে, হোসেনকে তা ঠিক করতে হবে। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাবে জামিয়া চালু রাখার পক্ষে মত দেন। তিনি জানতেন, এজন্যে ভুল বোঝাবুঝি অবশ্যই হবে। এই সময় একটা বক্তৃতায় হোসেন বলেন, দেশের তরুণ সমাজকে শিক্ষিত করে সৎ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা, তাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপযোগী করা এবং স্বাধীনতা পাওয়ার পর, তার সদ্ব্যবহার করার উপযোগী করাই জামিয়ার উদ্দেশ্য। এর কর্মধারা পরিবর্তন করার কোনও ডাক দেওয়া হয়নি। অপরদিকে, যারা মনে করেন আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নেওয়া নৈতিক দায়িত্ব তাঁরা অবশ্যই তা করতে পারেন। যথাবিহিত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তার দীর্ঘ ছুটির জন্যে আবেদন করতে পারেন যাতে, জামিয়ার পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। 1930 সনের 13 এপ্রিল শফিকুর রহমান কিদওয়াই আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তাকে অভিনন্দন জানিয়ে হোসেন বলেন তাঁর কর্তব্যবোধ সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। এইভাবে জামিয়া মিলিযা যেমন তার কাজকর্ম চালু রেখেছিল তেমনি শফিকুর রহমান কিদোয়াই, হাফিজ ফায়েজ আহমেদ এবং সি কে নায়ার আঞ্চলিক সরকারবিরোধী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে জাকির হোসেন এই প্রখ্যাত বিদ্রোহীদের সংগঠনের জন্যে অর্থ সংগ্রহে হায়দ্রাবাদ যান। মন প্রাণ ঢেলে তিনি এই সংগঠনের কাজ করেছিলেন।

20 মে 1931 কার্যকরী সমিতির সভায় নিজাম সরকারের কাছ থেকে পাওয়া এককালীন সাহায্য ও মাসোহারার কথা তিনি ঘোষণা করেন আনুষ্ঠানিকভাবে। টাকার মূল্য হ্রাস এবং জামিয়া সংগৃহীত স্বল্প অনুদান জামিয়া সম্প্রদায়ের জন্যে সাহায্য চালু রাখা প্রায় অসম্ভব করে তোলে। কিন্তু অন্তবর্তী সাহায্য আসে গৃহ নির্মাণের জন্য। একমাত্র মাসোহারার টাকা দিয়ে মাইনে দেওয়া সহ দৈনন্দিন খরচ মেটানো খুব কষ্টকর ছিল। জামিয়া আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে এই অজুহাতে দিল্লির চিফ কমিশনার সার জন টমসন মাসিক অনুদান বন্ধ করে দিয়েছেন শুনে সর্বত্র হতাশা নেমে আসে। সত্যি কথা বললে এটা প্রমাণ করা যাবে না।

তাছাড়া যে সময় মুখ্য কমিশনার তাঁর অসম্মতির কথা নিজাম সরকারকে জানান, সেই সময় ভাইসরয় লর্ড আইরিন গান্ধিজির সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসার জন্যে তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দিয়েছেন। সেদিন ছিল 26 জানুয়ারি 1931। গান্ধিজি আইরিন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় 5 মার্চ 1931। যাইহোক, মুখ্য কমিশনারের ভারত বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির কথা সবাই জানতেন। জামিয়া সম্প্রদায় যে সরকারবিরোধী সে কথা বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট কারণ। সেইজন্যেই অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হয়। হোসেন যখন ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করতে যান, তখন আমি খারাপ কিছু আশঙ্কা করেছিলাম। স্পষ্ট মনে করতে পারি, ধবধবে সাদা পোশাকে টাঙ্গায় চড়ে ঈষৎ উত্তেজিতভাবে তিনি, কোনও সম্ভাবনা নেই, এমন এক উদ্দেশ্যে যাত্রা করছেন। সেদিন তাঁকে একটি পরিত্যক্ত বিষয়ের একমাত্র রক্ষাকর্তা বলে মনে হচ্ছিল।

সাক্ষাৎকারের বিশদ বিবরণ হোসেন আমাকে জানাননি। বারবার প্রশ্ন করে জানতে পেরেছি, টমসন সাহেব অত্যন্ত কঠোর প্রশাসক হলেও তাঁকে আত্মরক্ষার রাস্তা নিতে হয়েছিল। জামিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করার যথেষ্ট যুক্তি তাঁর ছিল না। জাকির হোসেন তাঁকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে রাজি করাতে পারেননি। বিষয়টি পুনরায় আলোচিত হবে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁরা ভদ্রভাবে পরস্পরের কাছে বিদায় নেন। কিন্তু ইতিমধ্যে টমসন অবসর গ্রহণ করেন। তার উত্তরাধিকারী জনসন যথেষ্ট দুঃখ স্বীকার করে হোসেনকে অপেক্ষা করতে বলেন। চার বছর পরে অনুদান অনুমোদিত হয় বকেয়া পাওনা সহ।

আর্থিক অনটনের সময় বিদেশি অতিথি-বক্তাদের আমন্ত্রণ করা হোসেনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ড. আনসারি এই ভাবনা সমর্থন করেন এবং আমন্ত্রিত বক্তাদের তাঁর অতিথি হিসাবে রাখার প্রস্তাব দেন। 1933 সালে হুসেন রাউফ বে, 1934 সালে কায়রোর ড. বেজদেত ওয়ারি, 1935 সালে হালিদে এদিব হানুম এসেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হুসেন রাউফ বে যুদ্ধ জাহাজ হামিদিয়ের ক্যাপ্টেন ছিলেন। তাঁর কৃতিত্ব স্বল্প পরিসরে এমডেনের মতো ছিল। দেশের পক্ষে মুদরোসে তিনি যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি সই করেন। তিনি তুরস্কের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। কামাল-আতা-তুর্কের সঙ্গে মতপার্থক্যের জন্যে তিনি দেশত্যাগ করেন এবং ভারতে আসার আগে বেশ কয়েক বছর প্যারিসে ছিলেন। লেখক এবং সমাজসংস্কারক হিসাবে হালিদে এদিব তুরস্কে ও পশ্চিমে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিলেন। এই ভদ্রমহিলা বা হুনে রাউফ বে যথেষ্ট নজর কাড়তে পারেননি কারণ ভারতীয় নেতারা নিজেদের ব্যাপারে মগ্ন ছিলেন। জামিয়ার পরিচিতির পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়। 'তুরস্কে পূর্ব পশ্চিমের দ্বন্দ্ব' এই শিরোনামে হালিদ এদিবের বক্তৃতার সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল।

এই ভাষণগুলি সম্পাদনার ভার আমাকে দেওয়া হয়েছিলো। আমার কাজের চাপ খুব বেশি দেখে ড. হোসেন আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন; সন্ধ্যার

কিছু পরে তিনি চোখে যন্ত্রণার কথা বলেন। যন্ত্রণার চোটে তাঁকে লেখা বন্ধ করে দিতে হয়। চোখের ছানির রোগের সম্ভবত এটাই প্রথম ইঙ্গিত। আকস্মিকতা কেটে যাবার পর এ ব্যাপারে চিকিৎসা করানোর কথা বললে তিনি বিরক্ত হতেন। পরিবর্তে তিনি আরো বেশি পরিশ্রম করতে শুরু করেন। এটা নতুন কিছু নয়। এলাহাবাদের হিন্দুস্তানি একাডেমি 1932 সালে বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। 'অর্থনীতি : লক্ষ্য ও পদ্ধতি' শীর্ষক বক্তৃতা উর্দুতে দেবার কথা ছিল। বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি স্বভাবসুলভভাবে বন্ধুদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন এবং কেমন ভাবে লিখবেন, তাও ঠিক করেন। কিন্তু তিন দিন আগে এক বর্ণও লেখা হয়নি। তারপর খাওয়া-শোয়ার বিরতি ছাড়া টানা আটচল্লিশ ঘণ্টা একানাগাড়ে লিখে শেষ ট্রেন ধরে তিনি রওনা হন। স্বাস্থ্যের পক্ষে এটা খুব ক্ষতিকর নয়, কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এমন চরম পন্থার নিদর্শন হলো, 1936 সালের শরৎকালে একদিন বেলা এগারোটার সময় ক্ষুধার্ত হয়ে তিনি বাড়ি চলে আসেন। তাড়াতাড়ি খাবার দেওয়া হলো এবং তিনি তৃপ্তি সহকারে খেলেন। বারোটার সময় আলিগড় থেকে এক বন্ধু আসে। তার সঙ্গে হোসেন আবার ভরপেট খেলেন। প্রায় শেষ করা মুহূর্তে নয়াদিল্লির যে বন্ধু তাঁকে সেদিন দুপুরে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি গাড়ি নিয়ে হোসেনকে নিতে এলেন। জাকির হোসেন এই আমন্ত্রণের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন এবং তাঁকে মাফ করে দেবার অনুরোধ জানান। কিন্তু তাঁর বন্ধু, যাঁর স্ত্রী হোসেনের পছন্দসই খাবার নিজের হাতে তৈরি করেছেন, তিনি কিছুতেই রাজি নন। অগত্যা হোসেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন। কোনও কাজ হাতে নিলে তা ভালোভাবে করা উচিত আপ্ত বাক্য মাথায় রেখে খুব আরাম করে বন্ধুপত্নীর তৈরি সব খাবার খেলেন। পরদিন আবার তিনি মারাত্মকভাবে ছানির পেশি বৃদ্ধি রোগে আক্রান্ত হলেন। অভূতপূর্ব যন্ত্রণার মধ্যে বেশ কয়েকঘণ্টা শুয়ে থাকলেন।[9]

তাঁর কাছ থেকে এরকম ব্যবহার আশা করা যায়নি। কিন্তু এ ত্রুটি তাঁর প্রকৃতি ও স্বভাববিরোধী নয়। মুসলিম সংস্কৃতি, সুস্বাদু খাবারের উচ্চ প্রশংসা করে, এমনকী বিষয়টিকে ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করে, তার জন্যে উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা দেখানো কর্তব্য। মুসলিম আতিথেয়তার অন্যতম অঙ্গ অতিথির পছন্দসই খাবার পরিবেশন করা। বিপরীতে গৃহকর্তার সন্তুষ্টি মতো অতিথিকে সমস্ত খাবারই আয়েস

---

৭ প্রাথমিক কিছু চিকিৎসা দিল্লিতে হয়। তারপর জার্মান চক্ষু-শল্যবিদ ড. ‘কিউয়ের কাছে আস্ত্রোপচারের জন্যে তিনি বম্বে যান। অস্ত্রোপ্রচার স্থগিত রাখতে হয় সর্দি-কাশির জন্যে। তিনি মনের আনন্দে তহবিল সংগ্রহে বেড়িয়ে পড়েন, ফিরে আসেন আরও খারাপ অবস্থা নিয়ে। অস্ত্রোপচার করার জন্যে তাঁকে অনেক কড়া ওষুধ দিতে হয়েছিল। এ সময় তিনি ড কে এ হাকিমের বাড়িতে ছিলেন। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তিনি শ্রী ও শ্রীমতী হামিদের ভালবাসা ও আদর যত্নের উল্লেখ করেন।

করে খেতে হয়। কম খেলে বা উপভোগ করে না খেলে গৃহকর্তা দুঃখ পাবে। সে কাজ না করাই ভাল। মুসলিমদের সামাজিকতা তাই খাদ্যের প্রশংসা, খাবার ইচ্ছা সংক্রান্ত কথাবার্তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত। এমনকী যে খাবার তিনি খাচ্ছেন সে ব্যাপারে হোসেনের কোনও আগ্রহ না থাকলেও, তাঁর সামাজিকতা ও কৃষ্টি তাঁকে খাবারের প্রশংসা করতে বাধ্য করত এবং সেটা প্রমাণ করার জন্যে বেশি খেতে হতো। যারা তাঁর অনুরাগী এবং তাঁর সঙ্গ প্রার্থনা করত, তারা জাকির হোসেন যে সমস্ত পদ পছন্দ করতেন, সেগুলো খুব যত্ন সহকারে তৈরি করত। আশা করত হোসেন সব কটি পদই তৃপ্তি সহকারে পেটপুরে খাবেন। এমনকী ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হবার পর যখন ভাত মিষ্টি ও মশলাযুক্ত খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন জামিয়ার সহকর্মীরা হোসেনকে চিরাচরিত খাবার পরিবেশন করতেন। এটা যে তাঁর পক্ষে ক্ষতিকর সহকর্মীদের সে কথা বলেও বোঝাতে পারিনি। তাঁরা হোসেনের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমার থেকে কম চিন্তিত ছিলেন না। কিন্তু একজন অতিথিকে অন্য কোনও পদ খাওয়ানোর কথা তারা ভাবতেই পারতেন না।

হোসেনকে অভিযোগ মুক্ত করার চেষ্টা নয় এটা। খাওয়ার আনন্দ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারতেন না তিনি।[10] তাঁর সামগ্রিক আচরণ দেখলে আমরা বুঝতে পারি যখন তিনি কম মাইনে পেতেন, সে সময় প্রতিদিনের সাধারণ খাবারও তিনি পরম তৃপ্তি সহকারে খেতেন। গারদা একদিন জার্মান পদ্ধতিতে তাঁর জন্যে মেটে-কারি তৈরি করেছিলেন। হোসেন আসেননি, সেজন্যে গারদা পরের দুপুরের জন্যে খাবার তুলে রাখেন। গরমে খবার নষ্ট হয়ে যায়। সহকর্মী হামিদ আলি খানকে সঙ্গে নিয়ে হোসেন দুপুরের খাবার খেতে এলেন। তিনি মেটে-কারি মুখে

10. আমি একবার তাঁর সঙ্গে হায়দ্রাবাদ গিয়েছিলাম। সে সময় খাওয়া-দাওয়ার ওপর বিধি নিষেধ ছিল। যাত্রার আগে আমি তাঁকে বলেছিলাম যে খাবার তাঁকে দেওয়া হবে তাই খেতে হবে অন্য কিছু নয়।' 'যা খুশি তাই করো, আমি এখন তোমার দয়ায় আছি।' তিনি জবাব দেন। চব্বিশ ঘন্টা ভালভাবে কেটে যায়। ট্রেন থেকে ওয়ার্ধায় একটা ছোট ছেলে আমাদের বগির সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে কিছু মিষ্টি কিনতে অনুরোধ করে। আমি রাজি নই দেখে জাকির হোসেন বল্লেন, 'তোমার কোনও দয়ামায়া নেই। একটা অবোধ শিশু কিছু বিক্রি করতে চাইছে, আর তুমি এত পাষাণহৃদয় যে অন্তত দুপয়সার মিঠাই কিনতে পারছ না।' আমাকে হার মানতে হলো, দু পয়সার মিষ্টি কিনলাম। মিষ্টি তাঁকে দিচ্ছি না দেখে তিনি বললেন, 'এটা খুব হাস্যকর। তুমি মিঠাই নাও কিনতে পারতে। কিন্তু কিনেছ যখন, তখন না খাওয়ার কি যুক্তি আছে?' ছোট দেখে দুটো মিঠাই তাঁর হাতে দিয়ে বাকিগুলি আমার বিছানার তলায় লুকিয়ে ফেলি তাঁর অগোচরে। প্রায় ঘন্টাখানেক পরে মিষ্টির খোঁজ করতে গিয়ে দেখি শুধু ঠোঙাটা পড়ে আছে! আমি স্নানঘরে থাকার সময় মিঠাইগুলি সাবাড় করা হয়েছে। সন্দেহের চোখে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম, তাঁর মুখে কিছুই না জানার ভান।

দিয়েই বললেন, আমি সবটা খাব, কাউকে ভাগ দেব না। গারদা ও হামিদ আলি টাটকা সবজির তরকারি খেলেন, হোসেন মেটে-কারি দিয়ে। পরে যখন তিনি দেখলেন, কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই, তখন মাংসের অবস্থা সম্পর্কে হামিদ খানকে সব জানান।

মুসলিম আচরণের উচ্চমূল্যবোধ কখনও দর্শনার্থীকে ফিরিয়ে দেয় না। রাজনৈতিক বিধিনিষেধের ঘেরাটোপে বাঁধা পড়ে তাঁকে হয়তো অনেক সময় দর্শনার্থীকে ফিরিয়ে দিতে হয়েছে কিন্তু বিহারের রাজ্যপাল নিযুক্ত হবার আগে পর্যন্ত নিজের হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও কোন দর্শনার্থী তাঁর সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হতেন না।

একবার প্রবল জ্বর নিয়ে একাই বিছানায় শুয়ে ছিলেন। স্ত্রী গিয়েছিলেন কাইমগঞ্জে, কাজ করার ছেলেটিও বাড়ি ছিল না। তাঁর সচিব আলাদা জীবন যাপন করতেন, তিনি হোসেনের অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, এমন সময় একজন অতিথি দরজায় কড়া নাড়লেন। কোনও সাড়া না পেয়ে তিনি ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে এসে হোসেনের বিছানার পাশে এসে বসে পড়েন। হোসেনের অপরিচিত। পরিচয়পর্বের পরে তিনি কিছু টাকা সাহায্য চান। হোসেন তাঁকে নিজের অসুস্থতা এবং স্ত্রীর অনুপস্থিতির কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, এই মুহূর্তে দেওয়ার মতো টাকা তাঁর কাছে নেই। সব শুনে ভদ্রলোক জবাব দেন : 'আপনি যা বললেন ঠিক। আপনি অসুস্থ দেখতে পাচ্ছি, আপনার কথামতো হয়তো বেগম সাহেবাও বাড়ি নেই, হয়তো আপনার কাছে দেবার মতো কোনও টাকা নেই। কিন্তু আমি যখন আপনার কাছে টাকা চেয়েছি, আপনি কী তা না দিয়ে পারবেন?' হোসেন কোনও জবাব দিতে পারেননি। তিনি তাঁকে তাঁর সচিবের নাম এবং কোথায় তাকে পাওয়া যাবে বলে দেন। আগন্তুক তৎক্ষণাৎ চলে যান এবং শীঘ্রই সচিবকে নিয়ে ফিরে আসেন। জাকির হোসেন তাঁকে যে কোনও জায়গা থেকে টাকা যোগাড় করে লোকটিকে দেবার জন্য নির্দেশ দেন।

তাঁর উদারতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে তাঁর চোখের অসুখের সময়। অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি বিছানায় শুয়ে। ভেজানো দরজার বাইরে বন্ধুরা অপেক্ষা করছিলেন, যাতে কেউ ভিতরে গিয়ে তাঁকে বিরক্ত করতে না পারে। হঠাৎ পঞ্জাব থেকে এক মুসলিম এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়। তাকে জানানো হয়, হোসেন গুরুতর অসুস্থ এবং কারও সঙ্গে দেখা করছেন না। লোকটি নাছোড়বান্দা। সুদূর পঞ্জাব থেকে সে আসছে এবং দেখা না করে যাবে না। আমরা তাকে ঢুকতে দেব না, নিশ্চিত হয়ে সে চিৎকার করতে শুরু করে। সেই চিৎকার হোসেনের কানে যায় এবং তিনি কি হচ্ছে জানতে চান। সব কিছু শুনে তিনি লোকটিকে ভিতরে আনতে বলেন। বন্ধুরা অস্বীকার করলে হোসেন উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং তিনি নিজে

গিয়ে সাক্ষাৎপ্রার্থীর সঙ্গে দেখা করার ভয় দেখান। বন্ধুরা বাধ্য হয় লোকটিকে ঢুকতে দিতে।

একই ধরনের ব্যবহারের আর একটা ঘটনা ঘটে 1933 সালে। ছোট মেয়ে রেহানার মৃত্যু হয়েছে। গোলাপি চিবুক, কাজুবাদাম রঙের চুল এবং ডাগর চোখ : দারুণ সুন্দর দেখতে। জাকির হোসেন তাকে খুব ভালবাসতেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে ছাত্ররা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি তাদের মিষ্টি বিতরণ করছিলেন। এমন সময় একজন পিওন এসে তাঁর কানে-কানে কিছু কথা বলে। তিনি বিতরণ পর্ব চালিয়ে যান। পিওনটি আবার ফিরে আসে এবং তাঁকে কিছু কথা বলে। জাকির হোসেনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলেও তিনি মিষ্টি বিতরণ বন্ধ করেননি। ইতিমধ্যে টানা ঘণ্টা বাজাতে থাকে। কি হয়েছে জানার জন্যে লোকেরা উদগ্রীব হয়ে ওঠে। বলা হয় রেহারা হঠাৎ মারা গেছে।[11] কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সকলে হোসেনের বাড়ির সামনে জড়ো হয়। হোসেন সবশেষে আসেন। দেরির কারণ জানতে চাওয়ায় তিনি বলেন, দুঃখের খবর পেয়েছিলেন এবং শিশুদের খুশিতে তিনি বাধা দিতে চাননি। খুব চুপচাপ ছিলেন এবং কাউকে বুঝতে দেননি যে তিনি নিজের প্রিয় কন্যার শেষকৃত্য করছেন। পরে বেগম হোসেনের কাছে শুনেছিলাম বেশ কিছুদিন তাঁর বালিশ ভিজে দেখে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন হোসেন রোজ রাতে কাঁদতেন।

কঠিন সময়ে এবং দুঃখের পরিস্থিতিতে কীসের সমর্থন চাইতেন' প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দিতেন না। যে দিনটা অতিক্রান্ত হয় তার জন্যে তিনি সহকর্মীদের কৃতজ্ঞ থাকতে বলেন। অথবা তিনি তাদের বলেন, কোনও একটা কারণের জন্যে বাঁচাটাই যথেষ্ট। কেননা, 'সব কিছু বিচার করলে মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কি আছে?' তাঁর রসবোধ যে কোনও সঙ্গকে উজ্জীবিত করত এবং তাঁকে প্রত্যিহিকতার গ্লানির ঊর্ধ্বে তুলে ধরত। গান্ধিজির ব্যক্তিত্বের প্রভাব তাঁর জীবনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বারবার বলতেন গান্ধিজির নিজেকে নিয়ে মস্করা করার ক্ষমতাকে তিনি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন।

তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস কোথায়? এ প্রশ্নের যে জবাব আমি দেব তা সাবেকি ও গতানুগতিক মনে হলেও, কোনও অংশে মিথ্যা নয়। কোরানের বাণী ও পারস্যের কবিতাসমূহ তাঁর শক্তির মূল উৎস।

দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম দশ বছর শুধু মুসলিমরা জামিয়া সম্পর্কে আগ্রহী ছিল, এই সময় তাদের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্যে তাদের ধর্মীয় আবেগের কাছে আবেদন করা স্বাভাবিক। সে সময় তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী বক্তৃতাতেও হোসেন পরোক্ষে তাঁর ধর্ম বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করতেন। তিনি কখনও ধার্মিকের মতো কথা বলতেন

11. হৃদ্‌যন্ত্রের গণ্ডগোলে সে মারা যায়।

না। তিনি কখনও নিয়ম মেনে দিনে পাঁচবার প্রার্থনা করতেন না। তবে রাতে বা সকালে তিনি প্রার্থনা করতেন। নিয়মিত কোরান পাঠ করতেন। রমজানের সময় পুরো কোরান যতবার সম্ভব পড়ার চেষ্টা করতেন। এটা ছিল সাবেকি রীতি। তিনি নিয়মিত অনশন করতেন। কেউ তাঁকে প্রাচীনপন্থী নন বলতে পারবে না। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে : যখন আমরা মুসলমানেরা সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করছিলাম তিনি কোরান থেকে উদ্ধৃতি দেন। যেখানে বিশ্বাসীদের অবিচলিত অনুগত কর্মঠ দয়ালু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দিনবসানে তারা প্রতিমূর্তি হয়ে উঠে।[12] সিদ্ধান্ত আমিই নিয়েছিলাম।

আর, পারস্যের কবিতা সম্পর্কে বলতে গেলে, জাকির হোসেন যে সমাজে বড় হয়েছেন, সেখানে কবিতা সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির সোপান, মানুষ হিসাবে আত্মপ্রকাশের মাধ্যম বলে বিবেচিত হয়। মানুষের মন রাজ্যের সমস্ত সম্পদ—তার ধর্ম জ্ঞান পড়াশোনা পার্থিব বিবেচনা, সাধারণ বুদ্ধি—এর প্রতিদ্বন্দ্বী হলো কবিতা। কারণ কবিতা প্রেমের প্রতিভূ, সমস্ত আইনের ঊর্ধ্বে একটি আইন। প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই কবি ও কবিতার রেশ বয়ে বেড়ায়। জামিয়া মিলিয়ার প্রতিষ্ঠা উদযাপিত হয়েছিল কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে। উৎসাহ উদ্দীপনা বাড়াতে প্রতিটি অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করা হতো। কবিদের মধ্যে একজন ছিলেন মৌলানা মহম্মদ আলি, অন্যজন শিক্ষাবিদ মৌলানা মহম্মদ আসলাম জয়রাজপুরি। কাব্যচিন্তার জন্যে এঁরা সামান্য সুবিধাও পাননি। যারা সহজেই ভেসে যায়, জাকির হোসেন সে দলে পড়েন না। তিনি ভারতীয় ও ফারসি কবিতা প্রচুর পড়েছিলেন। কিন্তু কবিতা নিয়ে তিনি সাহিত্যের মতো আলোচনা করতেন না। তিনি কবিদের মধ্য থেকে বেছে নিতেন এবং তাদের সেইটুকু গ্রহণ করতেন, যা তাঁর অন্তরের সত্তাকে উজ্জীবিত করত। কবির সেই মুহূর্তগুলি যা ভবিষ্যতে বিলীন হলেও চিরস্থায়ী প্রেরণা দেবে।

অতীন্দ্রবাদে বিশ্বাসী কবি সারমাদের চতুর্দশপদী কবিতার একটি স্তবক তাঁকে সুন্দরভাবে লিখে দেবার জন্যে তিনি লিপিশিল্পী ওস্তাদ আলি মহম্মদ খানকে অনুরোধ করেন। মহম্মদ খানের হাতের লেখা জামিয়ার সব চাইতে সুন্দর লেখা বলে পরিচিত। বাংলায় কবিতাটির অর্থ :

সারমাদ, তোমার ক্লান্তিকর দুঃখের কথা থামাও
দুটি পথের যে কোনও একটি বেছে নাও

---

12. এন জি দাউদের অনুবাদ। দ্য কোরান III 15, পেঙ্গুইন বুকস। লন্ডন। 1956, পৃ: 398.

পরিপূর্ণভাবে নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করো
অথবা বলো সে তোমার কেউ নয়, শত্রু বা মিত্র।

কবিতাটি তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের প্রতীকী। জামিয়ার হীরকজয়ন্তী উপলক্ষ্যে 1946 সালে ভারতীয় নেতাদের কাছে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, তাঁর চিন্তা ও চেতনার গোটা পরিকাঠামোটাই কবিতানির্ভর। তাঁর ভাবনা ও কবিতাসমূহ এত সংঘবদ্ধভাবে জড়িত যে, মনে হতে পারে তারা উভয়েই দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর মনের কোণায় লালিত। এই সংযুক্তিকে কখনও অকপট সাহিত্যিক দক্ষতা বলা যায় না। ভেতরকার চিন্তা ও ধারা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয় কত গভীর আন্তরিকতায় সৃষ্ট।

প্রথমেই একটি বিশ্বাসের ঘোষণা : 'মহৎ উদ্দেশ্যে জনকল্যাণমূলক কাজ করার অর্থ ভগবানের সেবা করা। বাধা বিপত্তি আসতে পারে কিন্তু ঈশ্বর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন, কম্পিত পায়ে শক্তি দেবেন, ভাঙা অন্তরকে জোড়া লাগিয়ে দেবেন।' এর পরেই আছে কবি নাজিবির একটি কবিতা। বাংলায় যার অর্থ : 'এ পথে হৃদয়ের আঘাত সারবে; না কোনও ব্যথা বুঝতে পারবে।' এবং কোরান[13] থেকে দুটি উদ্ধৃতি: 'প্রতিটি কাজের পর আরাম আসে। প্রতিটি কাজই আনে আরাম।'

জামিয়া মিলিয়ার আদর্শ ও অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম সম্পর্কে সবিশেষ উল্লেখ করে যে সমর্থক এর নিঃসঙ্গতা উপলব্ধি করতে পারেনি তার সম্পর্কে পরোক্ষ উল্লেখ করে একটা কবিতার উদ্ধৃতি দেওয়া আছে :

তোমার সরলতাকে আমি অনুকম্পা করি। শূন্যহাতে কাঙ্ক্ষিত
মুখে তোমার বাজার পানে হেরি।

আদর্শের বিনিময়ে যারা নিঃসঙ্গতাকে মেনে নিতে প্রস্তুত তাদের পালটা জবাব :

উর্ফি[14] ভালবাসা বার্লি কেনা নয়
একটি সুখি ও পরিতৃপ্ত হৃদয়
আমিও পৃথিবী ও আকাশের সব কিছুর জন্য নই
আমার আহত হৃদয় পালটায়

---

13. দ্য কোরান XCIV, 5-6
14. কবির ছদ্মনাম।

কঠোরভাবে আদর্শকে আঁকড়ে ধরার এই সঙ্কল্প। প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ অবশ্যই সময় উত্তীর্ণ। রাজনীতির চাহিদা তীব্রতা, শিক্ষার অধ্যাবসায়, রাজনীতির কর্মসূচি প্রতিদিন পালটায়, কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য এত সুসংবদ্ধ যে সফল হবার প্রয়াস কখনও পূর্ণ হয় না। শিক্ষা আমাদের নিঃসঙ্গ করে না, চলার দিক নির্দেশ করে।

মুহূর্তের স্বপ্নও নতুন ইচ্ছাকে ধাওয়া করে; মানুষ দুঃখ ডেকে আনে। হৃদয়ে একটি মাত্র দুঃখ নিয়ে আমি আমার সারা জীবন কাটিয়ে দিলাম।

শিক্ষার শেষ না থাকলেও শিক্ষকের জীবন প্রাকৃতিক নিয়মেই শেষ হয়। নিজের ক্ষমতা যার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে কেমন করে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়? জবাব দিয়েছেন গালিব : 'রক্তের বিনিময়েও আমরা মরুভূমিতে ফুল ফোটাতে অঙ্গীকারবদ্ধ।'

বিশ্বাস ও জ্ঞানের সংমিশ্রণে শিক্ষাপদ্ধতি তৈরি করাই ছিল জামিয়া মিলিয়ার স্বপ্ন। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষালয়ের মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব, এই বোধ থেকে এমন ধারণা হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী উলেমার উপলব্ধি এটাই। যে সমস্ত মুসলিম ভদ্রলোক উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানের কথা চিন্তা করতে পারেন নি, তাঁরা খুবই রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যা নয় জ্ঞানের অধ্যাত্মবাদী বিশ্লেষণ এ ধারণার প্রবক্তা, এ কথা দাবি করায় যথেষ্ট যুক্তি আছে। এ প্রসঙ্গে হোসেন প্রায়ই রুমির কবিতা উদ্বৃত দিতেন : 'গায়ে ধাক্কা দিলে জ্ঞান সাপের মতো, হৃদয়ে নাড়া দিলে বন্ধুর মতো।' জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে রুমির স্পষ্ট ধারণা ছিল :

তৃষ্ণার্ত সর্বত্র জলের খোঁজ করে।
জলও জানে তৃষ্ণার্ত তাকে খোঁজে।
জল চেয়ো না, তৃষ্ণা অর্জন করো
দেখবে চারধারে জল ফুটছে।

কিন্তু এই চিন্তা ভাবনা, ঝুঁকি কাজ করার আনন্দ একেবারে হারিয়ে যখন আমরা নিঃসঙ্গ হয়ে যাই। সে সময় আমি নিশ্চিত ছিলাম না, জাকির হোসেন সত্যি সত্যিই এমন নিঃসঙ্গ পথিক ছিলেন কিনা, আমি জানতাম না, কখন কোনদিকে ভরসা করতে হবে। তাঁর নাছোড়বান্দা এবং খিটখিটে বন্ধুদের প্রশ্নের জবাবে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রুমির আর একটি কবিতা আবৃত্তি করতেন :

যে ভাবে আমি কথা বলি সে ভাবে আমি তাকে চাই না
যে আমার সঙ্গে পথ চলবে
প্রথমে সে আমার সহযোদ্ধা; তারপর পথ চলা।

প্রাপ্য সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে পরিকল্পনামতো একটি কাজ সুচারুভাবে শেষ করার জন্যে তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। এই আগ্রহের বখরা নিতে পারে এমন একজন যোগ্য সহকারী পাওয়ার ইচ্ছা তাঁর বহুদিনের। স্বপ্ন দেখতে অভ্যস্ত একজন মানুষ এ ধরনের ইচ্ছার ফলে হতাশায় আক্রান্ত হয়। যেভাবে তিনি নতুন চিন্তাভাবনা রূপায়িত করছিলেন, তাতে জামিয়ার সহকর্মীদের মধ্যে তিনি প্রশংসা এবং আতঙ্কের পাত্র হয়ে উঠছিলেন। পরবর্তিকালে তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সকলেই প্রভাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু মনের শান্তি বিঘ্ন না ঘটিয়ে তাঁরা নিজেদের পথে হাঁটতেই ভালবাসতেন। স্পর্শকাতর বিবেকের জন্য হোসেনকে বেশি ভুগতে হতো, তিনি নিঃসঙ্গ বোধ করতেন।

নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে জামিয়া মিলিয়ার গঠন, মরুভূমিতে ফুল ফোটানোর নামান্তর। এ বিষয়ে হোসেনের ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন কী হবে?

হতাশায় আক্রান্ত বন্ধুদের সমালোচনায় হোসেন প্রত্যয়দৃঢ় হয়ে বলতেন, কাজ চালিয়ে যেতে হবে, শেষ পর্যন্ত ধৈর্যের ফল ফলবেই। তাঁর লেখা ছোটগল্পের একটি মুরগির ডিমে তা দেয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলতেন 'ঠুকরে খাও, কিছু না কিছু অবশ্যই ঘটবে।' সুতরাং তাঁর প্রথম কৃতিত্ব সহকর্মীদের একত্রিত রাখা। এমন দৃঢ়তা সাধারণভাবে মুসলিমদের মধ্যে দেখা যায় না। এমন ইচ্ছা অনেকেরই থাকে কিন্তু সেই ইচ্ছা বাস্তবায়িত করার সাহস থাকে না। কোনও রকমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর দ্বিতীয় সাফল্য। জাকির হোসেনের সময় জামিয়া মিলিয়া তার বাড়ির চার-দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, ছিল দিগন্তপ্রসারী। তার পার্থিব সম্পত্তির অনেক বেড়েছিল। 1938 সালে ওকলায় জমি কিনে জামিয়া মিলিয়া তার প্রাথমিক বিভাগের জন্যে একটি সুন্দর বাড়ি তৈরি করে। শফিকুর রহমান কিদোয়াই প্রতিষ্ঠিত অর্থ-সংগ্রহ সংক্রান্ত বিভাগ হামদরদান-ই-জামিয়া উদ্দেশ্য, লক্ষ্য প্রচারে এবং তহবিল সংগ্রহে যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল। 1938 সাল থেকে অর্থ সংগ্রহ এখানে করতে থাকে, অনেকে মনে করলেন, বুনিয়াদি শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব নিয়ে হোসেন মুসলিম জনমতকে বিচ্ছিন্ন না করলে, অর্থাভাব হতো না। ভাবনার মধ্যে কিছু সত্যতা আছে। কিন্তু 1939 সালে জার্মানিতে চিকিৎসার জন্যে যাওয়ার আগে জাকির হোসেন একলক্ষ টাকা অনুদান সংগ্রহে সমর্থ হয়েছিলেন। সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্যে হামদারদান-ই-জামিয়ার কাজকর্ম একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে বিস্তৃত করা যখন সম্ভব হচ্ছিল না, তখন জাকির হোসেনের কাছে চাহিদা বাড়ছিল।

1942 সালের কোনও এক সময়ে তবলিখি জামায়েত-এর প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা ইলিয়াসের সঙ্গে হোসেন দেখা করেন। মৌলানা তাঁর ব্যক্তিত্ব, সামর্থ্য ও প্রশংসা করার শক্তিতে মুগ্ধ হন। তবলিখি জামায়তের লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় সংহতির বিকাশ।

জ্ঞান ও ধর্মবিশ্বাস আছে এমন মুসলিমদের দলবদ্ধভাবে ইসলাম বিষয়ে অজ্ঞ মুসলিমদের সচেতন ও শিক্ষিত করার জন্যে পাঠানো হতো। মৌলানা ইলিয়াস নিজের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মেয়াতি মুসলিমদের ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নতিতে তাঁর শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার অবদান যথেষ্ট। কাজের পরিধি বাড়ানোর জন্য শিক্ষিত মুসলিমদের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন ছিল। দিল্লির উচ্চবিত্ত মুসলিমদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। তিনি ভাল বক্তা ছিলেন না, হোসেনের সঙ্গে পরিচয় ঈশ্বরের করুণা বলে তাঁর মনে হয়েছিল। অন্যদিকে, হোসেন মৌলানার আন্তরিকতা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিছুকালের জন্যে তিনি পরিপূর্ণভাবে এই আন্দোলনে যুক্ত হন এবং মৌলানা সাহেব তাঁকে সবচেয়ে উপযুক্ত প্রবক্তা হিসাবে মনে করতেন। হোসেন আমাকে বলেছিলেন, যে কোনও সভায় দুজনের দেখা হলে মৌলানা বলতেন, 'ভাই জাকির, আমি একজন সাধারণ মানুষ। নিজের ভাবনা গুছিয়ে বলতে পারি না। আপনি সেগুলি আমার চাইতে ভাল বোঝেন। অনুগ্রহ করে আমার তরফে আপনি বলুন'[15] এই মেলামেশার জন্য পরোক্ষ ফল পাওয়া গিয়েছিল। ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় সঙ্গে যুক্ত থাকায় যাঁরা মনে করত হোসেন আদর্শ মুসলমান নন, তাদের মোহভঙ্গ হয়েছিল। 1943 হোসেন তহবিল সংগ্রহে হায়দ্রাবাদ যান আমার ওপর দায়িত্ব দিয়ে। সে সময় আমার দৈনিক খরচ মেটাবার সামর্থ্য ছিল না। তিনি রওনা হবার পর, সকালে আমার টেবিলের ওপর একটা বড় খাম দেখতে পেলাম। দশ হাজার টাকা ছিল তাতে। আগের বিকালে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কোনও ব্যক্তি টাকাটা রেখে যান। পরে জানতে পেরেছিলাম, অজ্ঞাত ব্যক্তিটি এমন একজনের ব্যবসায়ী অংশীদার যিনি তিন বছর আগে তাঁর দশ টাকা মাসিক অনুদান বন্ধ করে দেন।

1943 সালে হোসেনের পরিভ্রমণের ফলে হায়দ্রাবাদ রাজ্য থেকে পাওয়া মাসিক অনুদান 1000 থেকে বেড়ে 3000 টাকা হয়। 1944 সালের শেষ দিকে জামিয়ার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে অর্থ সংগ্রহ শুরু হয়। 1945 সালে এই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। টাটা ট্রাস্টির মতো সংস্থা সানন্দে এই কাজ করেছিল। হোসেন অধ্যাপক চোক্‌সির সঙ্গে দেখা করে পরিচালকবর্গের সম্মানে দেওয়া মধ্যাহ্নভোজনের পর ভাষণ দেওয়ার অনুরোধ করেন। এরপর তারা কারিগরি শিক্ষার জন্যে জামিয়াকে অর্থ অনুদান ঘোষণা করেন। দুজন সহকর্মী শফিকুর রহমান কিদোয়াই ও মুইনুদ্দিন হ্যারিস সহ হোসেনকে দোরে দোরে সাহায্য চাইতে

---

15. মৌলানা ইলিয়াসের এর ভাবনাকে কার্যকরী করার জন্যে হোসেনের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। সংঘবদ্ধ ভাবে যতবার বেরিয়েছেন ততবার অসুস্থ হয়ে তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছে।

হয়েছিল। এ কাজ তাঁর যথেষ্ট ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে করেছিলেন। সার মির্জা ইসমাইলের প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় তিনি আবার হায়দ্রাবাদ গিয়েছিলেন। এই সময় একজন ভদ্রলোক যথাবিহিত সৌজন্য ও ভদ্রতায় আর একজন ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা জানান। হোসেনকে কোনও প্রচার করতে হয়নি। তাঁকে মধ্যাহ্ন আহারে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং 5 লক্ষ টাকার চেক সাহায্য বাবদ দেওয়া হয়।

অন্যভাবেও স্বীকৃতি আসে। 1939 সালের প্রথম দিকে দিল্লির মুখ্য কমিশনার সার ইভান জেনকিন্স হোসেনকে আমন্ত্রণ জানান ওকলাতে প্রস্তাবিত বুনিয়াদি বিদ্যালয় সম্পর্কে আলোচনার জন্যে। ভারত সরকারের শিক্ষা অধিকর্তা স্যার জন সার্জেন্ট 1943 সালে সরকারি পরিদর্শক দলে জামিয়া পরিদর্শনে কোনও আপত্তি আছে কিনা জানতে চান। জামিয়া মিলিয়ার প্রশংসাপত্র ও ডিগ্রিকে স্বীকৃতি দেওয়াই এই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল।[16] একটি কমিটি গঠন করা হয় যে কমিটি জামিয়ার সকল ডিগ্রিকেই স্বীকৃতি দেবার সুপারিশ করে। সরকার যদিও ম্যাট্রিকুলেশন ও শিক্ষক-উপাধিপত্রকেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তবুও এই ঘটনা যথেষ্ট অগ্রগতির পরিচায়ক।

একে জামিয়ার শিক্ষা-সংক্রান্ত স্বীকৃতি বলা যায়। সার মাউরিশ গাওয়ার ছিলেন তখন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। 1944 সালে কিকাভাই প্রেমচাঁদ স্মারক বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে তিনি হোসেনকে আমন্ত্রণ করেন। 'ধনতন্ত্র : বোঝার মাপকাঠি'[17] এই নামে পরবর্তিকালে সেই ভাষণ প্রকাশিত হয়। চিন্তার মৌলিকতা খুব বেশি ছিল না কিন্তু উপস্থাপনারীতি ছিল যথেষ্ট আনন্দদায়ক এবং আলোচনা এমন সরলভাবে করা হয় যে অর্থনীতি অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছেও তা সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। দুঃখের বিষয় যে প্রবন্ধগুলি প্রাপ্য সমাদর পায়নি।[18]

আদর্শবাদী ও সংস্কারপন্থীরা নিজস্ব উদ্যোগে অনেক বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন। সবই প্রচলিত পদ্ধতির প্রসারণ মাত্র। যে অসুবিধার সম্মুখীন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হয়েছিল তা ছিল নেহাতই স্থানীয় অথবা যে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের

---

16. অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়েছিল কারণ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যায় কোর্টে হোসেনের সমর্থকরা জামিয়া মিলিয়া প্রদত্ত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার শংসাপত্রের স্বীকৃতির বিষয়টি নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা দাবি করেন।

17. এশিয়া পাবলিশিং হাউস, মুম্বাই, পুনর্মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 1966

18. এই ভাষণের অলিখিত অংশ আরও মজার। স্বভাবমতো শেষ মুহূর্তে তিনি লেখার কাজ শুরু করেন। টাইপিস্ট পাশে বসে টাইপ করছে, হোসেনের বন্ধুরা উদ্গ্রীব ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। শেষ অবধি কয়েকটি পাতা ফেলে রেখে তিনি ভাষণ দিতে যান এবং তাঁর ভাষণ চলাকালীন ওই কটি পাতা টাইপ করে তার হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

পরিষেবার লক্ষ্য ছিল তাদের, তাতে যথেষ্ট সাড়া না পাবার জন্যে। জামিয়া মিলিয়া প্রচলিত পদ্ধতি পরিত্যাগ করেছিলো এবং প্রচলিত ব্যবস্থা দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। জামিয়ার শিক্ষা তার ছাত্রদের কোনও পার্থিব সুবিধা দেয়নি। একটি প্রতীক হিসাবে জামিয়া কাজ করেছে, এবং সেই প্রতীকের গুরুত্ব অবশ্যই নির্ভর করত ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিদের গুণের ওপর। জাকির হোসেন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। তিনি জানতেন জামিয়ার নেতৃত্ব দিতে এবং তার ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করতে তিনি সফল হবেন না, যদি না তিনি এর চৌহদ্দির বাইরে যান এবং সমস্ত সুযোগের সদব্যবহর করে বাইরে জামিয়াকে পরিচিত করেন। শিক্ষা-আন্দোলন এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্যে তাঁর স্বকীয় উদ্যোগ ও অংশগ্রহণ আবশ্যক। জার্মানি থেকে ফেরার পর যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহে আমি আপত্তি করেছিলাম, আমর মনে হয়েছিল, তাঁর সমস্ত মনোযোগ জামিয়া মিলিয়াতে নিবদ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু তাঁর সদস্যপদ প্রতিটি সভায় তাঁকে সামনের সারিতে নিয়ে আসত এবং হায়দ্রাবাদের প্রধানমন্ত্রী সার আকবর হায়দারির মতো বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। হিন্তুস্তানি, তালিমি সংঘের সভাপতি হওয়ার পর সারা দেশ তাঁর কথা জানতে পারে। বুনিয়াদি, শিক্ষা প্রচার করতে গিয়ে তিনি হাজারো মানুষের মনে জামিয়া মিলিয়ার বার্তা পৌঁছে দেন এবং শুভেচ্ছার পরিবেশ তৈরি করেন যা অন্যভাবে সম্ভব হতো না।

অবশ্য আর একটি মতও আছে। একজন সহকর্মী যিনি, 1920 সনে জামিয়া মিলিয়ায় যোগ দেন এবং চল্লিশ বছর পর অবসর নেন, তিনি আমায় লিখেছিলেন, জাকির হোসেন জামিয়া মিলিয়ার চাইতে নিজের ব্যক্তিত্ব ও সম্মান নিয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন। আরও কয়েকজন সহকর্মী এই মত পোষণ করেন; আমি জানি। এ কথা সত্য যে, স্বাধীনতা-উত্তর পরিস্থিতিতে জামিয়া মিলিয়ায় অভ্যস্ত হবার পূর্বেই তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর সম্পর্কে যা বলা হয়, তা আমাদের সময়কার যে কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি যিনি স্বেচ্ছায় ছোট পরিসর থেকে বৃহত্তর পরিসরে কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন, তাঁর সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এই পরিবর্তন সকল দিক দিয়ে সব সময় ভাল হয়েছে বলা চলে না। কাজের ছোট পরিসরে কেন্দ্রীভূত ও নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ পাওয়া যায়। সদর্থক ফল আসে। অথচ বৃহত্তর পরিসরে ফল অনেক সময় আশাব্যঞ্জক নয়। কিন্তু এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে উত্তরণ এক অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। নিজেকে তৈরি না করলে জাকির হোসেন জামিয়া মিলিয়া তৈরি করতে পারতেন না। এ কাজ করার পর তার আর ভাঙা সম্ভব নয়, যেমন পাহাড়ের জলে তৈরি খরস্রোতার পক্ষে সমতলে নদী হিসাবে বয়ে চলা সম্ভব নয়।

শিক্ষা : ভাব ও ভাবনা

বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ভাবনা গুরুত্ব পায়। নৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক ধারণাও এর পিছনে কাজ করে। ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের সাফল্য প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক জেহাদ। ইংরাজ ও ভারতীয়রা তাতে সাড়া দিয়েছিল। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আবার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন চোখে পড়ে। স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে শুরু করে। মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েণ্টাল কলেজ 1875 সালে আলিগড়ে স্থাপিত হয়। একই স্থানে 1920 সালে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিমদের জন্যে সময়োপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই প্রতিষ্ঠান দুটির জন্ম। একটি চিন্তাধারার প্রবক্তা ছিলেন সার সৈয়দ আহমেদ খান, অপরটির হোসেন। একমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বকীয়তা বজায় রাখা ছাড়া দুটি চিন্তাধারার মধ্যে বিশেষ কোনও সামঞ্জস্য ছিল না। সার সৈয়দ আহমেদ খানের শিক্ষা সংক্রান্ত ভাবনা সুযোগকেন্দ্রিক না হলেও রূঢ় বাস্তবভিত্তিক ছিল, খোলসের আড়ালে আজকের ভারতের শিক্ষানীতির মতো। হোসেনের শিক্ষা ভাবনা পরিসংখ্যাননির্ভর মোটা দাগের চাহিদা কেন্দ্রিক, বরং জীবনের মূল্যবোধসঞ্জাত। মুসলিমদের কাছে মুসলিম হিসাবে, এবং ভারতীয়দের কাছে ভারতীয় হিসাবে বক্তব্য রাখার সময় এ মূল্যবোধ কাজ করত। 1928 সালে মহীশূর বিশ্বধর্ম সভায়, 1927 সালের মার্চ মাসে আলিগড়ে সারা ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে এবং 1934 সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লিতে সারা ভারত শিক্ষা সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণগুলি একত্রিত করলে হোসেনের শিক্ষা সংক্রান্ত ধারণার একটি পরিপূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায়।

প্রথমেই কিছু প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার। উপ-রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রপতি থাকার সময় হোসেনকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে প্রশংসা করা হতো। যারা তাঁর এমন প্রশংসা করতেন, তাঁরা যদি তিনি চিন্তা-চেতনায় মুসলিম ছিলেন না ভেবে করে থাকেন, তাহলে ভুল করেছেন। জামিয়া মিলিয়ার প্রধান ছিলেন যখন, তখনকার চাইতে রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন তিনি অনেক বেশি উৎসর্গীকৃত মুসলিম ছিলেন। অপর

দিকে যে মুসলমানরা মনে করতেন; কার্যত তিনি মুসলমান ছিলেন না; এমন একটি ধারণা তৈরি করার জন্যে এই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন, তাঁরাও একই ভুল করেছেন। অপপ্রয়োগে ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দ দুটি তাদের অর্থই হারিয়ে ফেলেছিল। কর্তব্যসচেতন না হয়ে সব সময় অধিকারের কথা চিন্তা করা ও বলার জন্যে এই বিভ্রম আরও বেড়েছিল। কোনও উচ্চপদই একজন সৎ ও ধার্মিক মুসলমান হওয়ার অধিকার থেকে হোসেনকে বিব্রত করতে পারেনি। তাঁর উচ্চমূল্যবোধ থেকে তিনি যখন যে পদ অলংকৃত করেছেন, সেই দায়িত্ব পালন করেছেন নৈতিক বাধ্যবাধ্যকতানুযায়ী। তাঁর কাছে উচ্চমূল্যবোধের অর্থ ইসলামিক মূল্যবোধ; যা তিনি আজন্ম লালন করেছেন। একজন সাধারণ মানুষের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের চাইতে অনেক বেশি ছিল হোসেনের মূল্যবোধ।

অমুসলিম শ্রোতাদের কাছে তিনি তাঁর মত প্রথম প্রকাশ করেন 1928 সালে মহীশূর অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্মীয় মহাসম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময়। মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার পক্ষে জোরদার বক্তব্য রাখলেও তিনি মুসলিমদের সতর্ক করে বলেন, শুধু প্রগতিশীল সৃজনী-শক্তি হিসাবেই ইসলাম তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে পারে।

'কিছু লোক যদি ভাবে ইসলাম স্বৈরতান্ত্রিক রাজ্যের কর্মধারাকে অপসারিত করবে অথবা অস্বাস্থ্যকর কোনও বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে আটক মহিলাদের মুক্তি দেবে, তাহলে সেই ইসলাম অবশ্যই চলে যাবে। যারা এই ইসলামকে রক্ষা করতে চায় তারা ব্যর্থ হবে। কিন্তু ইসলাম যদি সেই ধর্ম হয় যা অবিশ্বাসীদের বিশ্বাসী করে তুলবে, বর্বরদের সভ্য করে তুলবে, মহিলাদের বঞ্চিত সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে, সৌভ্রাতৃত্বের মধ্যে চারিত্রিক আভিজাত্য গড়ে তুলবে, সেই ইসলাম, আমি বিশ্বাস করি, চিরস্থায়ী হবে এবং মানবসমাজের উন্নতিতে তার অবদান রাখবে।'[1]

ভারতীয় সামাজিক প্রেক্ষাপটে একজন ব্যক্তি, বহু ব্যক্তির সমষ্টিতে তৈরি সমাজে যে অধিকার পায়, নিজস্ব ধর্ম ঐতিহ্য ইতিহাস নিয়ে একটি সম্প্রদায় সেই একই অধিকার ভোগ করে। তাদের একই ধরনের কর্তব্যও থাকে। যে নাগরিক নিজের কর্তব্য পালন করে না সে নৈতিকভাবে কোনও অধিকার দাবি করতে পারে না। সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও একই কথা। ব্যক্তির মতো তার মানসিক ও মনোবিদ্যাগত পরিকাঠামোটি বিশ্লেষণ করতে হবে। ব্যক্তির মতো তাকে শেখাতে হবে, পথ দেখাতে হবে এবং প্রেরণা দিতে হবে। একটি সম্প্রদায়ের গৃহীত শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ধারণা সেজন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম শিক্ষাবিদরা যে ধারণা গ্রহণ করেছিলেন

1. ভি. এস. মাথুর সম্পাদিত 'জাকির হোসেন : শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক'। আর্য বুক ডিপো। নয়া দিল্লি। পৃ. 59

সে সম্পর্কে 1937 সালের মার্চ মাসে আলিগড়ে অনুষ্ঠিত সারা ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের সভায় হোসেন বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন :

প্রায়ই বলা হয় মুসলিমদের বর্তমান শিক্ষা সরকারি শিক্ষা বিভাগের ওপর নির্ভরশীল হয়ে বিশ্বস্তভাবে তাকে অনুসরণ করে, তাঁর কোনও উদ্দেশ্য নেই। আমি একমত নই। নির্দিষ্টভাবে লেখার ওপর আদর্শের অস্তিত্ব নির্ভর করে না। শিক্ষাবিদ প্রশাসক এবং যাঁরা শিক্ষা দিতে চান, তাঁদের মনে এবং কার্যাবলীতে আদর্শের উপস্থিতি যথেষ্ট।

'তাহলে উদ্দেশ্য কি ছিল? উদ্দেশ্য ছিল এদেশের যত বেশি সংখ্যক উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মুসলমান ভালভাবে খেতে পারবে, আরামে থাকতে পারবে, সরকারি চাকরি নিয়ে 'কর্তৃত্ব' দেখাতে পারবে, তত ভাল। এই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জীবনযাত্রার মান যত উন্নত হবে, গোটা সম্প্রদায় তত সমৃদ্ধশালী বলে আমরা ধরে নেব। সম্ভাব্য সকল পদ্ধতিতে এই ব্যক্তিদের সমস্ত অসুবিধা দূর করতে হবে। এখানে, এখনই পাওয়া যাবে এমন সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়, সুন্দর ভবিষ্যতের জন্যে অবিশ্বাস্য পরিকল্পনার কথা ভেবে, জাতীয় নিয়তির ধারণা ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দকে যেন ব্যাঘাত না করে। আমাদের জীবনধারা অবশ্যই পালটাতে হবে। পুরোনো পন্থা বাজে। বাজে, কারণ এটা বিশেষভাবে পছন্দসই প্রভাবশালী জাতির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা মর্যাদা বাড়াবার জন্যে কেন মুসলিম সম্প্রদায়ের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকবে, তা পরিষ্কার নয়; সেজন্যে রাজনীতি পরিত্যাগ করা উচিত। সরকার যে কোনও রূপের হতে পারে। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, প্রজাদের মধ্যে মতপার্থক্য এবং বিরোধ, নিরপেক্ষ ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে সমাধান করা, চাকরির ব্যবস্থা করা এবং কয়েকজন ব্যক্তিকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করাই লক্ষ্য এবং এর ফলে আমাদের মর্যাদা বাড়ে। যুগ যুগ ধরে ধর্মই একটি সম্প্রদায়ের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, তাকে পরিত্যাগ করা যায় না। পার্থিব লক্ষ্যের সঙ্গে সংঘাত না ঘটে অথবা উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক না হয়, এমনভাবে তাকে রক্ষা করতে হবে। অন্য মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং মূর্ত জ্ঞান সম্পর্কিত শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই, পৃথিবীর উন্নত মানুষের আচরণকে রপ্ত করতে হবে। ধর্মীয় আচরণ এবং সঠিক বিশ্বাসের জিদ বাস্তবে অস্বীকার করা উচিত। ধর্মভাবের মোহ বজায় রাখার জন্যে যুক্তির বাইরে দার্শনিক আলোচনা হলেও কোনও ক্ষতি নেই।

'এই উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়েছে কিছুটা আমাদের উদ্যোগে; কিন্তু অধিকাংশই অপরের সাহায্যে। যুবকরা লিখতে পড়তে শিখবে, সরকারি চাকরি করে পশ্চিমি কায়দায় জীবন যাপন করবে, ধর্মকে একেবারে পরিত্যাগ করবে না, পছন্দ হলে ধর্মীয় উন্মাদনা ও প্রভাবে নিজেকে অভেদ্য করে

তুলবে, রাজনৈতিক কলহ থেকে দূরে থাকবে বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির লক্ষ্য। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কখন জাতীয় স্বার্থের কথা বলতে হবে তাও তারা সময়ে শিখে যাবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, শিক্ষার অর্থ ছোটখাটো দক্ষতা অর্জন করা, নম্র হওয়া এবং প্রতিযোগিতামূলক ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলা।

'শুধুমাত্র মুসলিমদের সুবিধার জন্যে যে প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত হয়েছিল যাদের পিছনে দরাজ হাতে আমরা আমাদের অর্থ সময় ও শক্তি ব্যয় করেছি, তারা কি ঘোষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে? এলাহাবাদের কবি আকবর শিক্ষিত মানুষের জীবনের বাস্তব ছবি আঁকেননি?

বি. এ. পাশ করেছে, চাকরি পেয়েছে।
পেনশন নিয়েছে; মারা গেছে।

মুসলিম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে যারা শিক্ষা পেয়েছে তাদের সম্পর্কে কী একথা প্রযোজ্য নয়? তাহলে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে কোন অর্থে মুসলিম বলব? কিছু স্বার্থসিদ্ধির জন্যে আসা ব্যক্তিদের জমায়েতকে কী ইসলামসমাজ বলে? এই প্রতিষ্ঠানগুলি যে ধরনের আনুষ্ঠানিক এবং বাইরের পদ্ধতি গ্রহণ করে তা কী ইসলামি ধর্মভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ইসলামের রাজনৈতিক চেতনা; নিরাপদে থেকে প্রয়োজনীয় সব কিছু ভিক্ষা করাকে কী অনুমোদন করে? সামাজিক পরিবেশ ও সামাজিক লক্ষ্যের প্রতি নির্লিপ্ত থেকে শিক্ষার্চ্চার নামে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াসকে কে কী ইসলাম সমর্থন করে? না! হাজার বার না!'[2]

পুরনো ধারণাকে খণ্ডন করার পর নতুন ধরনের স্কুলের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। জামিয়া মিলিয়ার বিদ্যালয়গুলি কেমন হবে, নতুন ভাবনায় পরিচালিত হয়ে তারা কেমনভাবে যুবকদের শিক্ষিত করবে, তাও বলা হয়েছে।

'আমাদের নতুন বিদ্যালয়গুলি নিঃসন্দেহে ইসলামি ধারণায় মুসলিম প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে উঠবে। কিন্তু সংকীর্ণ এবং ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে তাদের সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থপরতার ভিত্তিভূমি করা চলবে না। মুসলমান হিসাবে আমরা যদি স্বাধীনতা অর্জনে এবং তা রক্ষা করতে দায়বদ্ধ হই, আমরা যদি পৃথিবী থেকে সব ধরনের দাসপ্রথা নির্মূল করতে চাই, আমরা যদি এমন সমাজ ব্যবস্থা চাই যেখানে গরিব ও বড়লোকের ব্যবধান মানুষের মর্যাদা ও অধিকার অস্বীকার করবে না, অর্থের আভিজাত্যের বদলে আমরা যদি ধর্মীয় আভিজাত্য গড়ে তুলতে চাই, সম্প্রদায় ও বর্ণগত বিভেদকে চিরতরে দূর করতে চাই, তাহলে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে সেই কাজ প্রথমেই করা উচিত। কোনও প্রতিকূল ধারণা আমাদের অন্ধ করতে পারে না।

---

2. শিক্ষাসংক্রান্ত ভাষণের সংগ্রহ। মাকতবা জামিয়া। নয়া দিল্লি। 1942 পৃ-42-45

'আমাদের নতুন বিদ্যালয়গুলি যুবকদের মধ্যে সমাজসেবার আগ্রহ সৃষ্টি করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত দাসত্ব দারিদ্র দুঃখ এবং অজ্ঞতা অস্বাস্থ্য ও দুর্নীতি, অস্বাচ্ছন্দ ও হতাশা থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্লান্তিহীনভাবে তারা সমস্ত শক্তি দিয়ে এই সামাজিক ব্যাধিগুলি দূর করতে সচেষ্ট হবে। তারা স্বনির্ভর হবে, চাকরি করবে কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, পেটের তাগিদে চাকরবাকরের কাজ করবে। দেশ ও ধর্মের স্বার্থে তারা কাজ করবে। তারা কাজের মাধ্যমে শুধু ক্ষুধার যন্ত্রণা উপশম করবে তাই নয়, মনেপ্রাণে পরিপূর্ণতার আনন্দ পাবে। ধর্মীয় চেতনাবোধ থেকে তারা দেশের কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। সারা পৃথিবী আগে আমাদের দেশকে স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করত আর এখন অধিকাংশ লোকের কাছে দেশটা নরকের চাইতে খারাপ। কিছু লোকের উদাসীনতায় এবং কিছু লোকের হিংস্রতায় দেশের মানুষ আজ ক্ষুধা দারিদ্র অশিক্ষা হতাশা দাসত্বের জ্বালায় জর্জরিত; তাদের অস্তিত্ব ঈশ্বরের বিরুদ্ধে জেহাদ। কাজের মাধ্যমে আমাদের যুবকরা দেশকে এমনভাবে পালটে দেবে যে, এই মানুষরাও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে আস্থাশীল হয়ে উঠবে।

'এই-ই সব নয়। এই যুবকরা তাদের নিঃস্বার্থ সেবায় দেশবাসীকে অন্ধ জাতীয়তাবাদের কুফল থেকে বাঁচাবে এবং দেশকে মানবসমাজ ও বিশ্বসেবার প্রতীক হিসাবে গড়ে তুলবে। আমাদের দেশ অপরের ওপর চাপ সৃষ্টি করে, দুঃখ দিয়ে নিজের উন্নতির ব্যবস্থার করবে না, নিজের স্বাধীনতার জন্যে অন্য কাউকে দাস করবে না, অন্যকে দুর্বল করে নিজে শক্তিমান হবে না।'[3]

মুসলিম সম্প্রদায়কে বিশেষ এক শ্রেণীর মুসলিমদের সঙ্গে চিহ্নিত করার অত্যন্ত খারাপ রাজনৈতিক একটা প্রভাব ছিল। হোসেন এই দিকটির উল্লেখ করেন। সমাজের ব্যাপক অংশের মানুষ যেমন কারিগর কৃষক ও শ্রমিকরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয় এবং সমাজের উচ্চশ্রেণীর হাতের পুতুল হয়ে থাকে, জামিয়া মিলিয়া সেই মুষ্টিমেয় প্রতিষ্ঠানের একটি, যারা সমাজের এই বেড়া ভাঙতে চেয়েছিল, যাতে পিছিয়ে পড়া ব্যাপক সংখ্যক মুসলমানের কাছে পৌঁছোতে পারে এবং, এইভাবে ভারতের জনগণের কাছাকাছি আসতে পারে। প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা প্রসার এর প্রধান কাজ ছিল এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে তা ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। সরকারি চাকরি পাওয়াই যারা শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে মনে করত, জামিয়ার জাতীয়তাবাদী চরিত্র তাদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। পরোক্ষভাবে এ ঘটনার কার্যকরী প্রভাব ছিল। শিক্ষকদের অধিকাংশ, মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে এলেও জামিয়া মিলিয়া সামাজিক ব্যবধানকে দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছিল। সরকারিভাবে যাদের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী বলা হয়, তারা জামিয়ার সংসদে এবং কার্যকরী সমিতিতে প্রতিনিধিত্ব করতে পারত। তারা যাতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে জামিয়া মিলিয়াতে তার আইনানুগ ব্যবস্থা করা হয়।

---

3. শিক্ষাসংক্রান্ত ভাষণের সংগ্রহ। পৃষ্ঠা 58-60

মুসলিমদের চিরাচরিত ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার অধিকারের ওপর হোসেন তাঁর এই ভাষণে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। কাশী বিদ্যাপীঠের সমাবর্তন উৎসবে 1935 সালে তিনি ঘোষণা করেন :

'একটি জাতীয় শিক্ষানীতি মুসলিমদের সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ হিসাবে তাদের শিক্ষাকে স্বীকৃতি দেবে কী? আমাদের জাতীয় জীবনে এই প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিছু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চরমপন্থী মনে করতে পারেন, মুসলিমদের এই অধিকার দেওয়া দুর্বলতার লক্ষণ এবং প্রগতিবিরোধী। কিন্তু অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদরা ভাল কাজ করার মানসিকতা নিয়ে দেশের জন্যে কোনও শিক্ষাপদ্ধতি তৈরি করলে, সানন্দে মুসলিমদের এই দাবিকে স্বীকার করবে। এই মহতী সমাবেশে এ কথা স্পষ্ট করে বলার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন। কিছু লোকের স্বার্থপর ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা, সংকীর্ণ মনোভাব এবং ভবিষ্যৎ চিন্তা করার অক্ষমতার জন্যে মুসলিমরা ভারতীয় জাতীয় চরিত্র থেকে সরে যাচ্ছে। জাতীয় সরকার গঠিত হলে মুসলিমদের সাংস্কৃতিক পরিচয় মুছে যাবে, এমন একটা সন্দেহ ছিল। মুসলমানরা কোনও অবস্থাতেই এই মূল্য দিতে সম্মত নয়। একজন মুসলিম হিসাবে শুধু নয়, একজন সত্যিকারের ভারতীয় হিসাবে এজন্যে আমি খুবই আনন্দিত।'[4]

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজস্ব পরিচয় বহন করার স্বাধীনতা এখন ভারতীয় সংবিধান স্বীকৃত। প্রতিটি সৎ এবং যুক্তিবাদী মানুষ নীতিগতভাবে তা মেনে নিয়েছে। কিন্তু, শিক্ষাবিদদের কাছে যথেষ্ট সমস্যা দেখা দেয়। জামিয়া মিলিয়া একটি প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ। প্রতিষ্ঠাতাদের ইচ্ছা ও গান্ধিজির সম্মতিতে ঠিক হয়েছিল জামিয়া মিলিয়া এমন একটি প্রতিষ্ঠান হবে, যেখানে ইসলাম ও ঐতিহ্যসম্পন্ন মুসলিম সংস্কৃতি থেকে শিক্ষার রসদ গ্রহণ করা হবে। অমুসলিম ছাত্রদের নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে পড়ার অধিকারও প্রতিষ্ঠাতারা রেখেছিলেন। সেই অর্থে জামিয়াকে কোনও সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বলা যায় না এবং বর্তমানেও সেই নীতি বজায় আছে। প্রতিষ্ঠার তিন বছরের মধ্যে জামিয়া তার রাজনৈতিক নির্মোক ছেড়ে ফেলে। সে সময় জামিয়াকে নিঃসঙ্গ দিন কাটাতে হয়েছে। 1937 সালের শেষ দিকে হোসেন বুনিয়াদি শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব নেন। তিনি এবং জামিয়া বেশ কিছুদিন ধরে মুসলিমদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। এই মুসলিমরা কংগ্রেস-বিরোধী প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে মনে করত বুনিয়াদি শিক্ষার পাঠক্রম মুসলিম ও ইসলাম-বিরোধী। তাঁর কৌশলে বিরোধিতা প্রকাশ্যে আসেনি। কিন্তু এই ঘটনা প্রমাণ করে, কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি কোনও সম্প্রদায়ের কর্ম ও সংস্কৃতি সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে, তাহলে সেই সম্প্রদায়ের উগ্র ও সক্রিয় রাজনৈতিক সমর্থকদের সঙ্গে সংঘাত ঘটতে পারে।

---

4. শিক্ষাসংক্রান্ত ভাষণের সংগ্রহ। পৃষ্ঠা 21-22

আমাদের মনে রাখতে হবে যে চিরায়ত সংস্কৃতি অধিকাংশ মানুষের স্বভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থকে ঘিরেই গড়ে ওঠে যা আদর্শ থেকে অনেক দূরে। অর্থাৎ শিক্ষাবিদদের কাজ সহজ সরল নয়। জামিয়া মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করেছে অধিকাংশের অন্ধ বিশ্বাসের প্রতি কোনও আনুগত্য না দেখিয়ে, এমনকী ইসলামের শিক্ষার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা এবং গোঁড়ামির কাছে আত্মসমপর্ণ না করে। বাস্তবে প্রচলিত ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেই জামিয়া তার নিজস্ব মুসলিম চরিত্র তুলে ধরেছে। জীবন্ত কোনও কিছুর ছবি না আঁকার গোঁড়া মতবাদের বিরুদ্ধে গিয়েই হোসেন স্কুল পাঠক্রমে চিত্রাঙ্কন চালু করেন। নাটক লেখানো ও প্রযোজনার ব্যবস্থা করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তি করে তিনি সহশিক্ষার ভিত তৈরি করেন। কোনওভাবেই তিনি গোঁড়ামিকে বরদাস্ত করেননি। তাঁর ধৈর্যের অনুশীলনের কথা কোরানের কবিতায় লেখা আছে : 'বিশ্বাসের কোনও বাধ্যকতা নেই।'[5] তাঁর এমন ব্যবহারের জন্যে যে কোনও মত স্বাধীনভাবে বলা যেত এবং অপরের বিশ্বাস ও মতকে বোঝার এবং সম্মান দেওয়া হতো।

হোসেনের চিরায়ত সংস্কৃতির মাধ্যমে শিক্ষার ধারণাকে ভারতীয় পরিবেশের প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে। একজন মুসলিম, সৎ এবং নিষ্ঠাবান ভারতীয় না হতে পারলে কখনও সৎ ও নিষ্ঠাবান মুসলিম হতে পারে না। একজন মুসলিমের কাছে সৎ ও নিষ্ঠাবান ভারতীয় হওয়ার অর্থ জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সব কিছু গ্রহণ করা। তাকে যন্ত্র কারখানার ধোঁয়া ও আওয়াজ তার সব কিছু মেনে নিতে হবে। সমাজের স্বার্থে কাজ করার যে দায়িত্ব নিয়েছে তার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রের ব্যবহার তাকে শিখতে হবে। ব্যক্তিগত কারণে গান্ধিজি এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ শিল্পায়ন এবং নগরায়নের বিরোধিতা করেন। কী করে চিরায়ত সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষার ধারণা, ভাবনার এত সংঘাত, মানিয়ে নেবে? একবার গান্ধিজি ও গুরুদেবের সঙ্গে তীক্ষ্ণ মত বিনিময় হয়েছিল, কিন্তু গুরুদেবের সঙ্গে হোসেনের বাক্‌বিনিময় কখনও হয়নি। এমনকী, গান্ধিজি ও গুরুদেবের দর্শনের প্রতি আনুগত্যহীন অথচ চিরায়ত সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষা, এমন ধারণার সমর্থক কোনও হিন্দু ব্যক্তিত্বের সঙ্গেও হোসেনের বাক্‌বিনিময় হয়নি। সমানভাবে কার্যকরী বিভিন্ন ঐতিহ্যের মাধ্যমে একজন হিন্দু কেমন করে শিক্ষা নেবে, নিজে থেকে এ প্রশ্ন আলোচনা করলে হোসেন সংস্কৃতিতে হস্তক্ষেপের অভিযোগে অভিযুক্ত হতেন। কিন্তু, তাঁকে অনুরোধ করা হলে তিনি অবশ্যই চেষ্টা করতেন। তাঁকে অনুরোধ করা হয়নি। ফলে, হোসেনের ধারণা একক হয়ে পড়ে অথবা নিজেদের শাস্ত্রীয় অনুশাসনে একেশ্বরবাদী সম্প্রদায় তাঁর ধারণার নিরিখে নিজেদের বিচার করতে সক্ষম হয়। কিন্তু, এই একক বা একান্ত প্রয়োগ জাকির হোসেনের কাম্য ছিল না।

---

5. দ্য কোরান II : 256

অবশ্য শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে কোনও বিশেষ ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে মানবিক রূপ দেওয়া সম্ভব ভারতে এখন আমরা যাকে ধর্মনিরপেক্ষ বলছি। এই ধারণা গ্রহণ করে হোসেন বুনিয়াদি শিক্ষাকে সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ রূপ দেন। বুনিয়াদি শিক্ষার প্রাথমিক পাঠক্রমে সব ধর্ম পড়ানো হতো। সেই অর্থে বুনিয়াদি শিক্ষা ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর সামগ্রিক ভাবনা বিচার করলে হোসেনের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা সম্ভব।

1934 সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সারা ভারত শিক্ষা সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে আমরা তাঁর ভাবনার রূপরেখা পাই। পশ্চিমের শিক্ষা-দর্শনের অভিজ্ঞতায় নানান ভাবনায় সমৃদ্ধ এই ভাষণটি অত্যন্ত সুন্দর ভাবেলেখা হয়।

'মনের শিক্ষা হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যা সাংস্কৃতিক জীবনের সুপ্ত মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলে। খাদ্য ও পুষ্টির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যেমন শরীরের বৃদ্ধি ও উন্নতি ঘটে তেমন চারপাশের সংস্কৃতি থেকে সংগৃহীত মনের খাবার পেয়ে মানসিক প্রবণতা ও গঠনগত বৈশিষ্ট্যের বৃদ্ধি ও উন্নতি ঘটে। উপমাটি একটু বিস্তৃত করে বলা যায়, একটি শরীর সব সময় একই খাবার থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায় না, তেমন একজন ব্যক্তির মনও সব সাংস্কৃতিক সম্ভার থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায় না।

এই সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি যেমন বিজ্ঞান সাহিত্য ধর্ম বিশ্বাস প্রবণতা ও প্রতীক, প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব, সামাজিক আচার ও তার ব্যবহার, রাজনীতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যন্ত্র ও তার কৌশল, সব কিছুই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত মানসিক পরিশ্রমের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এগুলি মনের বিষয়ীভূত। তারা সব সময় মনের ছাপ বহন করে কখনও পরিষ্কার ভাবে, কখনও আবছা ভাবে। মানসিক শক্তি সব সময় তাদের ভিতর প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে। শিক্ষা প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মানুষের মনে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করে। শিক্ষার অসুবিধা এই যে, বদল করা যায় সেই সব ব্যক্তিদের, যাদের মানসিক গঠন চিহ্নিত শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গ্রহীতা মনের পরিকাঠামো সৃষ্টি করছে যে মন তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া দরকার।'

সাংস্কৃতিক দর্শনের শিক্ষা, তাত্ত্বিক ধার্মিক সামাজিক শৈল্পিক ও প্রযুক্তিগত উপাদানের পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারে। মানসিক গঠনের পার্থক্য, কর্তৃত্বকর চিন্তাশীল ও সক্রিয় মনের পার্থক্য, সৃষ্টিশীল চিন্তা ও কর্মের পার্থক্য, দিব্যতান্ত্রিক ধার্মিক শিক্ষা দেওয়া একজন শিক্ষকের চরম সার্থকতা। আমরা শিক্ষকরা, আমাদের ছাত্রদের ব্যক্তিগত পার্থক্য বুঝতে বিশেষ কিছুই করতে পারি না : 'সাংস্কৃতিক উপাদানের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ তাদের পক্ষেই সম্ভব, যাদের মানসিক গঠন সবটা না হলেও খানিকটা অন্তত ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার উন্নতি করতে সক্ষম'—শিক্ষা পদ্ধতির মূল এই বক্তব্যটি কারসেন স্টেইনারের। একটি তাত্ত্বিক মন তার গোষ্ঠীর ও মানবসমাজের সমস্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বৈজ্ঞানিক উপাদানের মাধ্যমে গ্রহণ করতে

তৈরি থাকে। একটি ছেলের প্রযুক্তিপ্রিয় মনের ওপর সৌন্দর্যচেতনা চাপিয়ে দিলে সংস্কৃতির দরজা চিরকালই তার কাছে বন্ধ থাকবে। প্রযুক্তিগত কাজ এবং উপাদানের সাহায্যেই তার মনের দরজা খোলা সম্ভব। এইভাবে মনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটার পরই সে সাংস্কৃতিক উপাদান গ্রহণে সমর্থ হবে।

'শিক্ষা পদ্ধতির এই দৃষ্টিভঙ্গি আমি সঠিক বলে মনে করি। এজন্যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার খোল-নলচে পালটাবার প্রয়োজন। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টিকারী তাত্ত্বিক শিক্ষার ভার কমাতে হবে। মননের সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে অসংগঠিত তথ্যের প্রতি আমাদের অতিরঞ্জিত চিন্তাকে। শিশুদের মানসিক গঠনের ওপর নির্ভর করেই পাঠ্যবিষয় পছন্দ করার দিকে বিদ্যালয়গুলির নজর দেওয়া দরকার। সকল স্বাস্থ্যবান শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা বিকাশের জন্যে বিদ্যালয়ে যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখা দরকার। তাদের লেখাপড়া ও অঙ্ক কষা সহজভাবে বোঝাতে হবে পরিশ্রম করার সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। বিদ্যালয়ে, শিশুদের প্রবণতার দিকে লক্ষ রেখে তাদের মানসিক গঠন সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে হবে, তারপর তাদের প্রবণতানুযায়ী অঙ্ক, প্রকৃতি বিজ্ঞান, কারিগরি বিদ্যার জন্যে গঠিত তিনটি উচ্চ বিদ্যালয়ের যে কোনও একটিতে পাঠাতে হবে। এই বিদ্যালয়গুলিকে বৃত্তিমূলক করা হবে। এর ফলে ছাত্ররা বৃত্তিমূলক শিক্ষা থেকে সাধারণ শিক্ষার দিকে যায়। বিপরীত যেন না হয়। মনের পরিপূর্ণ বিকাশ ব্যতীত সাধারণ শিক্ষা অসম্ভব। সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠবে।

'সর্বোপরি গোটা শিক্ষাব্যবস্থায় আগাগোড়া দুটো পরিবর্তন করতে হবে। প্রথমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে উজ্জ্বল বর্ণযুক্ত করে তুলতে হবে। মননের গঠনোপযোগী সাংস্কৃতিক উপাদানের সাহায্যে মনের শিক্ষা সম্ভব। যে পরিবেশে একজন জন্মগ্রহণ করেছে, বড় হয়েছে সেই পরিবেশ তার উন্নতি ও সংস্কৃতিতে সাহায্য করে। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতীয়করণ প্রয়োজন। যে সমস্ত তথাকথিত শিক্ষিত যুবক নিজেদের সৃষ্টির প্রতি অন্ধ, নিজেদের সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা শুনতে পায় না, নিজেদের ভাষা ও সাহিত্যের জন্য লজ্জা বোধ করে, যারা নিজেদের সব কিছু খারাপ আর বিদেশীদের সব কিছু ভাল তাদের নিয়োগ বন্ধ করতে হবে। শিক্ষার এমনভাবে পরিবর্তন হওয়া উচিত যাতে যুবকরা নিজ দেশে বিদেশির মতো না থাকে, মাতৃভাষায় কথা বলতে, নিজের ভাবনা নিজে ভাবতে লজ্জা না পায়। কবি যেমন বলেছেন, 'ঠোঁটে ধার করা বুলি, হৃদয়ে ধার করা ইচ্ছা না থাকে'।

'দ্বিতীয় পরিবর্তন করতে হবে বিদ্যালয়গুলিকে চরিত্রগঠনের উপযোগী করে গড়ে তুলে। বিষয়বস্তু বদলে উদ্ভট সাংস্কৃতিক নির্দেশ দিলে, কোনও কাজের কাজ হবে না। কারণ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সামান্য জ্ঞান যথেষ্ট নয়। যা তারা প্রচার করে, তার প্রয়োগের সুযোগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে দিতে হবে। ছাত্রদের ধৈর্য, একাগ্রতা, ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধির জন্যে সব রকমের সুযোগ দিতে হবে। আমাদের

বিদ্যালয়গুলিকে পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে নয়, তরুণদের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার সমবায়ী মনোভাব গড়ে তোলার কেন্দ্র হিসাবে তৈরি করতে হবে। এখন সময় হয়েছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আরও বেশি করে নৈতিক ভাবনা প্রয়োগ করার। জাতীয় ও ব্যক্তিগত অস্তিত্বের উন্নয়নমূলক ভাবনা, সমবায়ী দৃষ্টিভঙ্গির ভাবনা যার মধ্যে অন্যতম। আমাদের যুবকেরা, যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ, শিক্ষণপ্রাপ্ত, তারা এর ফলে সমৃদ্ধ হবে। তাদের মনের জোর, বিচার ক্ষমতা, মুখ্য অনুভূতি, সততা স্পষ্টবাদিতা উদারতা ও সহনশীলতা নতুন মাত্রা পারে। শেষের দিকে আমাদের কাজ হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জায়গা থেকে সামগ্রিক স্বার্থরক্ষার জন্যে, ধার্মিক একমুখীনতা থেকে মানবিক বহুমুখিতায়, কেবল জ্ঞানগ্রহণ কেন্দ্র থেকে জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগকেন্দ্রে পরিণত করা।

'কারা এগুলি করবেন?' আমার জবাব : প্রত্যেককেই করতে হবে। শিক্ষামূলক কাজের পরিধি বাড়াবার জন্যে সরকার ও জানসাধারণের সব কিছু করতে হবে।'

হোসেনের পরবর্তী বক্তৃতাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি সব সময় প্রকাশিত মতের পক্ষেই কাজ করেছেন। আমি বিশ্বাস করি ঐতিহাসিকরা মনে করেন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বিগত চার দশকে প্রচলিত ধারণার বাইরে বিশেষ অগ্রসর হতে পারেনি। আমি আরও বিশ্বাস করি যে তাঁর ধারণার বাস্তব প্রয়োগের জন্যে জাকির হোসেন যদি একটি প্রতিষ্ঠানের পিছনে তাঁর সমস্ত সময় ও শক্তি ব্যয় করতেন তাহলে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটত। ফারসিতে একটা সুন্দর প্রবচন আছে : 'যদি কিছু ধরো দ্রুত ধরো।' হোসেন সুযোগ পেলে তাঁর চরিত্রের সক্রিয়তায় সে কাজ ভালভাবে করতে পারতেন। আমাদের বাজার যেসব জিনিষে ভর্তি, তাদের সৌন্দর্য্যগুণ বিশ্লেষণ করলে পার্থক্য করার ইচ্ছা জাগে। আমাদের বাড়িতে এখনকার মতো দৃষ্টিনন্দন জিনিসের কোনও অভাব হবে না। আমাদের কারিগররা শিক্ষিত ও বিবেচক হবে। অন্ধের মতো তারা অতীত ঐতিহ্যকে অনুসরণ করবে না, আবার নকল করার হুজুগে মেতে উঠবে না। তাদের শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা, আদর্শের জন্যে গর্ব থাকবে। তারা এমন চাকরি করবে না যেখানে কাজ না করে মাইনে বাড়াবার দরাদরি সার হয়। বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকরা নিজেদের মনের ফসলের ওপর নির্ভর করবেন, বিদেশি ভাবনায় চলিত হবেন না। আত্মতৃপ্তি একথা বলব না যে পশ্চিমি শিক্ষা ও খাপছাড়াভাবে চালু করা কারিগরি পরিবর্তন পুরোনো শিক্ষা ব্যবস্থার ধস নামিয়ে দিয়েছে এবং নতুন নীতি, যা আত্মপ্রকাশের ভাল মাধ্যম বলে বিবেচিত হয় এখন, তার জায়গা নেয়নি। পদ্ধতি নির্দেশ করে এবং প্রেরণা জুগিয়ে শিক্ষা আমাদের অতীতের মূল্যায়ন এবং বর্তমানকে তৈরি করতে শেখাবে।

এরকম কিছুই হয়নি। সম্ভবত ঘটবেও না। আমরা এমন শিক্ষক কোথায় পাব যিনি আমাদের নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের ব্যবহার শেখাবেন, বিভিন্ন ধরনের কথা

বলবেন, উৎস সম্পর্কে আলোকপাত করবেন, যিনি ছোট্ট জিনিসের মধ্যে থেকে সৌন্দর্য খুঁজে পাবেন, যিনি মানুষকে বুঝতে পারেন এবং তাকে ইতিহাসের নিরিখে বিচার করবেন? জাকির হোসেনের জন্যে খসড়া তৈরি করতে গিয়ে আমি তাঁকে বারবার জিজ্ঞেস করি তিনি কি চান। পরে আমি কারশেনস্টেনারের *Concept of the Work School* পড়ি। সে সময় পরীক্ষামূলকভাবে যারা দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস উৎপন্ন করে তাদের মনকে বোঝার চেষ্টা করি, আমার কজন বন্ধু ও সহকর্মী এ ব্যাপারে উৎসাহী, তাও জানতে পারি। সিদ্ধান্তে আসি যে, বৈষয়িক ও মানসিক সংস্কৃতিকে শিক্ষার মাধ্যম করার ধারণাকে একটি রাশির মধ্যে আটকে রাখা যাবে না। ধারাবাহিক আত্মশিক্ষার মাধ্যমে বিষয়টি উপলব্ধি করা সম্ভব এবং যারা আত্মশিক্ষায় মগ্ন, তাদেরই এটি বোঝানো যায়।

এর মানে এই নয়, বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করা হলে বিষয়টি গুরুত্বহীন হয়ে যাবে বা প্রভাব ক্ষুণ্ণ হবে। হোসেন যদি একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে মগ্ন থাকতেন তা হলে ওই পদ্ধতির গুরুত্ব তিনি কোনও বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করে দেখাতেন। সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের জন্যে এই পদ্ধতির গুরুত্ব শুধু শিক্ষা সংস্কার নয়। ছয় কি সাত বছর থেকে পরিকল্পিত ও লক্ষ্যবোধক শিক্ষা, তেরো কি চোদ্দ বছরে সঠিক বৃত্তি নির্বাচন, বৃত্তির প্রয়োজন মতো আরও পড়ার সুযোগ, লাগাতার আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের উন্নতি করবে। কিন্তু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তির সমন্বয় ছাড়া এমন একটা পদ্ধতি কখনও কার্যকরী হয় না। কারশেনস্টেনারের শিক্ষাসংস্কার, বিশেষ করে নৈতিক মূল্যবোধ কার্যকরভাবে ব্যর্থ হয় নাৎসি বিপ্লবে। আমেরিকার শিল্প উন্নত সমাজে শিশুদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে উন্নত দ্রব্যাদি সংযুক্ত করেও, ব্যক্তির বিকাশে বিশেষ উন্নতি করেনি। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির প্রশ্নে যত সমালোচনা করি না কেন, স্বাধীনতার পর ভারত সরকার যে বিরাট অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়েছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু, পরিকল্পনা মাফিক নিয়োজিত কাজের মধ্য দিয়ে আত্মশিক্ষা প্রত্যেকের পক্ষেই সম্ভব, যদি তিনি স্ব-আরোপিত শৃঙ্খলার মধ্যে থাকেন।

আমাকে স্বীকার করতেই হবে যতদিন আমি হোসেনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে ছিলাম, ততদিন আমি রুচিবাগীশ ছিলাম। জানতে চাইতাম যখন তিনি পরিকল্পনামতো কাজ এত পছন্দ করেন, তখন তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এত অগোছালো কেন? তিনি অন্যকে উপদেশ দিতেন, 'একটা কাজ ধরো, এবং সেটাকে দ্রুত শেষ করো'; অথচ তিনি কেন একসঙ্গে এত কাজে জড়িয়ে পড়েন। সর্বোপরি কেন সৌজন্যের খাতিরে তিনি নগণ্য ব্যক্তিদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করে অমূল্য সময়ের অপচয় করেন। এখন আমার মনে হয় আমার দৃষ্টিভঙ্গি ভুল ছিল। আমার বোঝা উচিত ছিল যে শিক্ষা ও শিক্ষিত মানুষ সম্পর্কে হোসেনের ধারণার প্রধান শর্ত ছিল

এমন এক অবস্থা, যেখানে মানুষ নিজের জন্যে কিছু চায় না এবং অলৌকিকভাবে সেই সব কাজ শেষ করে, যেগুলি করার দায়িত্ব ঘটনাচক্রে তার ওপর এসে পড়ে। এই কাজ করার জন্যে সে যন্ত্রে পরিণত হবে না বা সমস্ত রকম মানবিক অনুভূতির উর্ধ্বে উঠবে না। যে মানুষের বিচার করছি, তিনি ধর্মপ্রচারক নন; একজন শিক্ষক মাত্র; যিনি নিজে যা অনুসরণ করছেন তার মধ্যে অন্যদের শিক্ষা সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন না। ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানি তাঁকে অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়। ব্যর্থতার পর দৃঢ় প্রত্যয়ে নতুন উদ্যোগে হাত লাগাতে হয়।

শুধু ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে জাকির হোসেনের জীবনকে বিশ্লেষণ করার মতো বিভ্রান্ত আমি ছিলাম না। আমি দেখেছি যেখানে পরিকল্পনার প্রয়োজন এবং সম্ভব, সেখানেই তিনি তা করতেন এবং সম্ভাবনার ওপর সব ছেড়ে দিতেন না। যখনই কোনও অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হতো তিনি প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ করতেন। বিশিষ্ট কোনও ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে, তিনি কথোপকথনের ছক কষে নিতেন। কোনও প্রশ্ন তুলে তাঁকে বিব্রত করা যেত না। ভুল করা বা কোনও শব্দ হারিয়ে ফেলার ব্যাপারে তিনি এত শঙ্কিত থাকতেন যে, সর্বদা লিখিত বক্তব্য মহড়া দিতেন। লেখার জন্যে শারীরিক কসরৎ করতে তাঁর আশ্চর্য রকমের অনীহা ছিল। কিন্তু বেতারে বা বিদগ্ধমণ্ডলীতে কোনও বক্তব্য রাখার সময়, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি লিখতে হবে, তা তিনি মনে-মনে সাজিয়ে রাখতেন। মনের মধ্যে সব কিছু নির্খুঁতভাবে সাজানো থাকায়, তিনি লিখতে অধৈর্য বোধ করতেন। আমার মতো লোক, যারা সময়ে লেখা শুরু করে সময়েই শেষ করত; কিন্তু লেখার সময় চিন্তা করত, তাদের তিনি বলতেন 'হাওয়া-ঈ-কাতিব' অর্থাৎ যে জীব লেখে। তিনি লেখালেখি যতদূর সম্ভব এড়িয়ে যেতেন। এ ব্যাপারটি সঠিক পদ্ধতি থেকে বিচ্যুতি নয়, মনুষ্য চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[6]

---

6 জামিয়া মিলিয়া তখনও কেবলবাগে ছিল। এক বিকালে আমার স্ত্রী ও আমি কিছু কেনাকাটা করার জন্যে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় হোসেন আমাদের বাসায় এলেন এবং আমাদের সঙ্গে যেতে চাইলেন। আমরা সানন্দে রাজি হলাম। ঘণ্টা দুয়েক পর ফিরে এসে তিনি বলেন, কেনাকাটা করতে নয়, তিনি পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কারণ, তাঁর হাতে জরুরি কিছু লেখার কাজ আছে। দেখে বোঝা যাচ্ছিল তাঁর ভিতরে লড়াই চলছে। গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করে তিনি লেখা শেষ করেন।

তাঁর মেয়ে সায়িদা আমাকে জানায়, মাঝেমাঝে তিনি তার সঙ্গে যে কোনও বিষয় নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করতেন। পরে বলতেন, 'আমার কিছু জরুরি লেখার কাজ আছে, সেজন্য তোর সময় নষ্ট করছিলাম।'

বাড়িতে লেখার সময় তিনি বিছানায় বসে বালিশটাকে টেবিল হিসেবে ব্যবহার করতেন। বেশ কয়েক বছর ধরে আমি তাঁকে টেবিল চেয়ারে বসে লেখার জন্যে বলেছি কিন্তু তিনি রাজি হননি। অবশেষে, তিনি যখন দিল্লির বাইরে ছিলেন, সে সময় নিচু টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয় টেবিল ও গালিচার বদলে। এই পরিবর্তন তিনি পছন্দ করেননি।

ভারতীয় শিল্পের প্রতি তাঁর আগ্রহ বোঝাতে অনেক বছর ধরে তাঁর বাড়িতে বা কার্যালয়ে ওস্তাদ আলি মহম্মদ খানের হস্তাক্ষরের উজ্জ্বল নিদর্শন ছাড়া তার কিছুই ছিল না। এই কলাবিদ এক সময় জামিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। আগেকার শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের আলোকচিত্র তাঁর সংগ্রহে থাকলেও, অর্থের অভাবে সেগুলিকে বাঁধিয়ে সাজানো সম্ভব হয়নি। সীমিত আর্থিক সঙ্গতির জন্যে হোসেন ব্যক্তিগত সংগ্রহে কিছু রাখার কথা ভাবতেই পারতেন না। মেয়ের বিয়ের বয়স হচ্ছে, এই ভাবনায় তাঁর যা কিছু সঞ্চয় মেয়ের বিয়ের জামাকাপড় কেনার জন্যে তুলে রাখতেন। তাঁর প্রথম ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছিল বাঁশের লাঠি। আমাকে যখন এটি দেখানো হয়, তখন আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম এর মধ্যে অভিনবত্ব কি দেখলেন। তিনি আমাকে বুঝিয়ে বলেন, লাঠির মান নির্ভর করে ক্রমশ ছুঁচলো হয়ে যাওয়ার ওপর, গাঁটগুলির মধ্যে ব্যবধান, তার জ্ঞান, বহুদিন ধরে সরষের তেল ঘসার ফলে যে রঙ পেয়েছে, তাই এর বৈশিষ্ট্য। তাঁর পরবর্তী সংগ্রহ, সুন্দর হস্তাক্ষর। তাছাড়া, বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁর সামর্থ্যের মধ্যে কেনা টুকিটাকি কিছু জিনিসও ছিল। মনে আছে, একটা তামার পেয়ালা তাঁর খুব প্রিয় ছিল। পেয়ালার আকারটা ছিল খুব সুন্দর। তিনি আমার ওপর যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছিলেন যখন আমি বলেছিলাম, পেয়ালার কানা ভিতরের দিকে হওয়ায় তার কার্যকারিত্বা যথেষ্ট কমে গেছে। যতদিন তিনি জামিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁর সামর্থ্য খুব সীমিত ছিল এবং তাঁর সৌন্দর্যরুচির চাহিদা অপূর্ণ থাকত। কিন্তু যখন তাঁর হাতে খরচ করার টাকা ছিল, তখনও তিনি সস্তা এবং সাধারণ জিনিষের মধ্যে সৌন্দর্য খুঁজতেন।

হোসেনের গতিময়তার প্রতি তাঁর সামাজিক পরিবেশের তির্যক দৃষ্টি এবং পরিকল্পনা, নির্ভুলতা ও শ্রেষ্টত্বর জন্যে তাঁর আকর্ষণ শিক্ষাবিদ হিসাবে তাঁর দুঃখের কারণ। সময়ের সঙ্গে জামিয়াতে তাঁর সহকর্মীরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে, হোসেনকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। তিনি অত্যন্ত চঞ্চল এবং চাহিদাপ্রবণ। তারা অবশ্য এও জানত তাঁকে ছাড়া চলবে না। সেইজন্য বেশির ভাগ সহকর্মী সবচেয়ে সহজতম পন্থা গ্রহণ করেছিলেন তাঁর সঙ্গে; সবসময় একমত পোষণ করে। তিনি তাদের কাছ থেকে যে কাজ আশা করতেন তারা শিথিল উদ্যমে তা করত; তারপর অজুহাত হিসাবে নিজেদের খামতির সমর্থনে কিছু অসুবিধার কথা বলত প্রাথমিক স্তরে প্রকল্পপদ্ধতি মাধ্যমিক স্তরে কর্মপদ্ধতি কয়েক বছর পর তার গতিবেগ হারিয়ে ফেলে। কারিগরি শিক্ষা শুরু হয় প্রবল উৎসাহে কিন্তু এমন কোনও শিক্ষক ছিলেন না, যিনি বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন। ওকলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাগানটির পরিকল্পনা করেন এমন একজন, যিনি হোসেনের চাইতে বাগানচর্চা বেশি বোঝেন বলে মনে করতেন। 1943-44 সালে যখন অর্থকষ্ট এত তীব্র ছিল না, সে সময় শুরু করা বেশ কিছু পরিকল্পনা অযোগ্যতা ও অনীহায় নষ্ট হয়ে যায়। একমাত্র বাগানের

মালি ফকিরার কাজ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। একবার বলেছিলেন, তাঁর হাতে ক্ষমতা থাকলে তিনি ফকিরাকে তাঁর উত্তরাধিকার দিয়ে যেতেন। জামিয়া সম্প্রদায় এই কথায় কোনও গুরুত্ব দেননি। তাঁর অভ্যাসমতো এটি হালকা মন্তব্য হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন।

জামিয়ার কাজকর্মের মূল্যায়নে তাঁর মতের সঙ্গে পর্যবেক্ষকদের মতের মিল ছিল না। পর্যবেক্ষকরা জামিয়া সম্প্রদায়কে একদল সজাগ সতর্ক এবং উৎসর্গীকৃত শিক্ষক বলে শ্রদ্ধা করতেন, যারা শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে উচ্চে তুলে ধরেছেন। তাঁর নিজের ধারণা অবস্থা বিশেষ পরিবর্তিত হয়েছে, কেননা অস্বাভাবিক কিছু করে দেখাবার প্রয়োজন হলে জামিয়া সম্প্রদায় পিছিয়ে থাকত না। তিনি বলতেন, গভীরতা ও অধ্যাবসায় শিক্ষাকর্মের প্রয়োজনীয় শর্ত। জামিয়া সম্প্রদায় যথেষ্ট গভীরতা অর্জন করেছে, কিন্তু তাদের অধ্যবসায় নেই।

বুনিয়াদি শিক্ষা প্রসার

সরকারি স্কুল-কলেজ বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন গান্ধিজি। গান্ধিজির অনুপ্রেরণায় এবং এই আন্দোলনের সমর্থনে জামিয়া মিলিয়া স্থাপিত হয়। শুরু হয় জাকির হোসেনের জীবনে একটি পর্ব। গ্রামীণ এলাকায় গান্ধিজির পরিকল্পিত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক স্বনির্ভর শিক্ষা সম্পর্কে একটি আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয় ওয়ার্ধাতে, 22 অক্টোবর 1937 সালে। এই সম্মেলনে যোগ দেন হোসেন। গুজরাতের রাজ্যপাল শ্রী শ্রীমান নারায়ণ সে সময় মারোয়াড়ি শিক্ষা সমাজের সচিব ছিলেন এবং অন্যতম একজন উদ্যোক্তা ছিলেন ওই সম্মেলনের। সম্প্রতি আমি তাঁর কাছে শুনেছি, হোসেনের নাম আমন্ত্রিতদের তালিকায় ছিল না। তাঁর পরামর্শে হোসেন, ড. আবিদ হোসেন ও আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমি আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সারা রাস্তা হোসেন ভাবতে-ভাবতে যান কেমন করে এই সুযোগটাকে কাজে লাগানো যায়।

সম্মেলনের কুড়ি দিন আগে 'হরিজন' পত্রিকায় একটি সংখ্যায় গান্ধিজি লিখেছিলেন :

1920 সালে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করেছিলাম। সাতটি রাজ্যে কংগ্রেসি মন্ত্রী থাকায় আজ প্রভাব বিস্তারের সামান্য সুযোগ পাওয়া গেছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা আগাগোড়া ভুল, এই ধারণা সংশোধন করার প্রয়োজন অনুভব করছি। এই প্রবন্ধে যে কথা বলার জন্য সামান্য চেষ্টা করছি, তা হঠাৎ-ই আমার মাথায় এসেছে এবং প্রতিদিন যার সত্যতা আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে। দেশের শিক্ষাবিদদের কাছে আমার আবেদন, মুক্তমনে আমার প্রস্তাব দুটি বিশ্লেষণ করুন। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে তাঁদের প্রচলিত ধারণা যুক্তির প্রবাহে যেন বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়।...

'1, প্রাথমিক শিক্ষা সাত কিংবা তার বেশি বছর ধরে চলবে। ইংরাজি ব্যতীত আর সমস্ত বিষয়ে ম্যাট্রিকমান পর্যন্ত পড়ানো হবে। একটি বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থাও থাকবে, ফলে ছেলেমেয়েদের জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ ঘটবে। বর্তমানে প্রচলিত প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার পরিবর্তে এই ব্যবস্থা।

2. এই পদ্ধতি পরিপূর্ণ ভাবে স্ব-নির্ভরতা বোধক। স্ব-নির্ভরতাই এই পদ্ধতির যোগ্যতার পরীক্ষা।'[1]

ওই প্রবন্ধে গান্ধিজি স্বনির্ভরতা প্রসঙ্গে তাঁর ধারণা বিস্তৃতভাবে বলেন। তিনি বলেন, বৃত্তি শিক্ষার সময় ছাত্ররা তাদের পরিশ্রমে যে দ্রব্য উৎপাদন করবে তার বিনিময়ে তারা বিদ্যালয়ের মাইনে দিতে পারবে। সহজসাধ্য বৃত্তি ও কাজের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'সূতা পশম এবং সিল্কের সমস্ত কাজ, তাঁত বোনা, সূক্ষ্ম হাতের কাজ, সেলাই এর কাজ, কাগজ তৈরি, বই বাঁধাই, খেলনা তৈরি, কাঠের কাজ, গুড় তৈরি[2] করা ইত্যাদি।' অন্য ধরনের হাতের কাজের বিষয়ে গান্ধিজি বলেন : 'যদিও দেশের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমি মনে করি তকলি[3] সমস্যার সবচেয়ে উপযুক্ত সমাধান। 1920 সাল থেকে খাদির গঠনমূলক কাজের জন্যে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। তাদের সাফল্য নির্ভর করবে গঠনমূলক এই পরিকল্পনা আমরা কতদূর বিস্তৃত করতে পারব তার ওপর।

'মন্ত্রীদের বিবেচনার জন্যে আমি প্রস্তাব রাখছি। গ্রহণ বা বাতিল করা তাদের মর্জি। কিন্তু আমার পরামর্শ হলো; প্রাথমিক শিক্ষা তকলিকে কেন্দ্র করে হওয়া উচিত। প্রথম বছরে তকলি সংক্রান্ত সব কিছু শেখানো উচিত, দ্বিতীয় বছরে পাশাপাশি অন্যান্য বিষয় শেখানো উচিত ...[4] এই বক্তৃতাতে আগে তিনি উল্লেখ করেছেন : 'তকলিতে বোনা শেখাবার সময় সূতোর বিভিন্ন ধরন, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মাটির অবস্থা, হস্তশিল্পের অবক্ষয়ের ইতিহাস এবং তার রাজনৈতিক কারণ, ভারতে ইংরাজ শাসনের ইতিহাস, অঙ্ক সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান প্রভৃতি ছাত্রদের বোঝাতে পারি।'[5]

আবেগপ্রবণ যে কেউ ভাবতেই পারেন যে গান্ধিজির আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং তাঁর আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তিরা, যাঁরা সেদিন শ্রোতা ছিলেন তাঁরা সবাই গান্ধিজির ব্যক্তিত্বে মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং গান্ধিজি স্বয়ং তকলি মাহাত্ম্য। একজন বাস্তববাদী অবশ্য বুঝতেই পারবেন যে, প্রস্তাবিত শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে গান্ধিজি তাঁর গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন এবং

---

1. শিক্ষা পুনর্গঠন। হিন্দুস্তানি তালিমি সংঘ, ষষ্ঠ মুদ্রণ 1956, পৃ 27-28
2. ওই। পৃ 31
3. 9" ইঞ্চি লম্বা একটা রড হুকের মতো করে একটা চাকতিতে জোড়া থাকে। চাকতির তলায় থাকে ছুঁচলো মুখ।
4. শিক্ষা পুনর্গঠন। পৃ 49
5. ওই। 48-49

সদ্য গঠিত কংগ্রেস মন্ত্রিসভা সরকারি নীতি হিসাবে কাজটাকে গুরুত্ব দিক, এটাই তাঁর অভিমত ছিল। শ্রোতাদের অধিকাংশ গান্ধিজিকে শুধু সমর্থন করেছিলেন তা নয় তারা মনে করতেন এই প্রস্তাব শিক্ষানীতিতে নতুন উদ্যোগ আনবে। হোসেন, এটা বুঝতে পেরেছিলেন। গান্ধিজির ভাষণ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়ান এবং এমনভাবে বলতে শুরু করেন যাতে মনে হচ্ছিল তিনি কোনও অভিযোগের জবাব দিচ্ছেন :

'মহাত্মাজি মনে করেন যে প্রস্তাব তিনি আপনাদের সামনে রেখেছেন সে প্রস্তাব পুরোপুরি মৌলিক এবং একমাত্র যারাই অহিংস ও গ্রামীণ সভ্যতায় বিশ্বাস করেন, তারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। শিক্ষাক্ষেত্রে যারা কাজ করেন তাঁরা মহাত্মাজির প্রস্তাবে নতুন কিছু দেখবেন না। তাঁরা জানেন কাজের মাধ্যমেই প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা যায়। তাঁরা আরও জানেন, শিশুদের কায়িক শ্রমের সাহায্যেই বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতে হয়। গ্রামীণ বা শহরের সভ্যতা হিংসা ও অহিংসায় বিশ্বাস করা না করায় কিছু এসে যায় না। অনেক শিক্ষাবিদ তাই হাতের কাজকে শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু করার চেষ্টা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে এই ব্যবস্থাকে কর্মপরিকল্পনা পদ্ধতি রাশিয়াতে যৌগিক পদ্ধতি বলা হয়। আমরা নিশ্চয় আমাদের শিশুদের তকলি চরকা সহ আর কিছু হস্তশিল্পের সাহায্যে শিক্ষা দিতে পারি।

'তকলির সাহায্যে একটি বিষয়ের সব কিছু শিক্ষা নাও দেওয়া যেতে পারে আমরা কি সেই অংশ বাদ দেব? না। তকলির সাহায্যে যতদূর সম্ভব আমরা তা করব, অবশিষ্টাংশে আমরা হাত দেবো না। হাতের কাজের সাহায্যে উন্নতির নীতিতে আমরা আস্থাশীল থাকব, কিন্তু কখন এই নীতিতে বাঁধা পড়ব না।

'শিক্ষার স্বনির্ভরতা প্রসঙ্গে দু একটি কথা। যেখানেই এই নীতি চেষ্টা করা হয়েছে, সেখানেই ব্যর্থ হয়েছে। আমেরিকায় অধ্যাপক ডিউই এরকম একটি পরিকল্পনা ছিল যা যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। কিন্তু, কয়েক বছরের মধ্যে তাঁকে বিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে হয়। আমেরিকা ধনী রাষ্ট্র যেখানে রাষ্ট্রীয় সাহায্য বা অর্থের অভাব হয় না। এই প্রচেষ্টা যদি সেখানে ব্যর্থ হয়, তাহলে আমাদের মতো গরিব দেশে কী হবে?

'আপনারা বলবেন আমরা গরিব বলেই স্বনির্ভরতা শিক্ষাপদ্ধতি চাই। কিন্তু শিক্ষার এই দিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার বিপদ আছে। শিক্ষকরা দাসপ্রথার চালক হয়ে যাবে এবং গরিব ছেলেদের শ্রমকে শোষণ করবে। যদি এমন ঘটে, তাহলে তকলি বই-এর চাইতেও ক্ষতিকর হবে। আমরা দেশে লুকোনো দাসপ্রথার ভিত তৈরি করবে।[6]

---

6. শিক্ষা পূণর্গঠন। 53-55

হোসেন তাঁর চারপাশের বিরূপ দৃষ্টিগুলি আমার মতোই লক্ষ করেছিলেন। তিনি মহাত্মাজির ব্যক্তিত্বকে সন্দেহ করেছেন, তিনি মোহবসান করেছেন। শ্রীমতী আশাদেবী বলেন : বিভিন্ন গুহায় এবং বাজারে যত মূর্তি আছে সব ত্যাগ করতে হবে। আমরা একটা নতুন যুগ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, একটা নতুন সামাজিক রীতি আনতে চাই এ কথা মনে রেখে সব ক্ষেত্রে আমাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে। যা কিছু শিখেছি সব ভুলে প্রাচীন গুরুকুল শিক্ষায় ফিরে যেতে হবে, যে শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ কায়িক পরিশ্রমকেন্দ্রিক।'[7] মহাদেবভাই দেশাই ঘোষণা করেন : "আত্ম-সমর্থক শিক্ষারীতিকে অহিংসার আদর্শগত প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। আমরা যদি মনে না রাখি যে এই নতুন ভাবনা একটা নতুন যুগ সৃষ্টি করতে চায়, যেখানে সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত বিদ্বেষ থাকবে না, শোষণ-বঞ্চনা থাকবে না তাহলে আমরা সফল হব না। তাই অহিংসার ওপর গভীর আস্থা রেখেই আমাদের কাজ শুরু করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে প্রস্তাবটা এসেছে এমন একটি মাথা থেকে যিনি অহিংসাকে সর্বরোগহর ঔষধ হিসাবে ভাবেন।'[8]

অর্থাৎ হোসেনকে বোঝানো যে তিনি একজন বহিরাগত, গান্ধিজির পরিকল্পনার ভিতরের কথা তিনি বুঝতে পারেননি, এবং গান্ধিজিকে তিনি অশ্রদ্ধা করেছেন। কিন্তু গান্ধিজি নিজে এমন একজনকে খুঁজছিলেন যিনি তাঁর মনের সারকথা বুঝতে পারবেন, সাহসের সঙ্গে পরিচ্ছন্নভাবে তা কার্যকরী করবেন। হোসেনের মধ্যে তিনি সেই গুণ দেখেন। তিনি হোসেনকে সম্মেলনের সভাপতি মনোনীত করেন এবং সম্মেলনের সিদ্ধান্তের খসড়া তৈরি করার দায়িত্ব দেন। তাঁর পরামর্শে কমিটি চারটি বিষয়ে একমত হন এবং পরের দিন সম্মেলনে সেই সুপারিশ গৃহীত হয়। অধ্যাপক কে টি শাহি শুধু বিরোধিতা করেন। সিদ্ধান্তগুলি ছিলো সম্মেলন মনে করে

1. দেশব্যাপী সাত বছর ধরে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করতে হবে;

2. শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা;

3. মহাত্মা গান্ধির প্রস্তাব মতো, এই সময়ে শিক্ষার সঙ্গে কায়িক পরিশ্রম ও উৎপাদনমুখী কাজ যুক্ত করতে হবে। তাছাড়া অন্যান্য সামর্থ্যের বিকাশ ঘটাতে হবে। শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী প্রধান হস্তশিল্পের সঙ্গে তাকে যুক্ত করে শিক্ষিত করে তুলতে হবে;

4. এই শিক্ষানীতি ধীরে ধীরে শিক্ষকদের মাহিনা দিতে সক্ষম হবে।

---

7. শিক্ষা পুণর্গঠন 267

8. ওই। 80-81

কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন করে আধুনিকরূপে গান্ধিজির বক্তব্য গৃহীত হয়। আধুনিক চরিত্রকে দৃঢ় করার জন্যে প্রয়োজনীয় পাঠক্রম তৈরি করতে সম্মেলন থেকে জাকির হোসেনকে সভাপতি পরে একটি কমিটি তৈরি করা হয়। পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয়, বুনিয়াদি জাতীয় শিক্ষা। এরপর কি হয়েছিল বোঝা দুষ্কর যদি না আমরা খেয়াল করি যে লাগাতার পরিকল্পনাটিতে গান্ধিজির দৃষ্টিকোণ ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, এই দুইভাবে ব্যাখ্যা করা হতো। হোসেনের কৌশল এবং গান্ধিজির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধার জন্যে এই মতপার্থক্য সংগঠিত রূপ নিতে পারেনি। মতপার্থক্য কিন্তু ছিল এবং এই পরিকল্পনা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ এটাই।

1938 সালের মে মাসে প্রকাশিত বুনিয়াদি জাতীয় শিক্ষার দ্বিতীয় সংস্করণে গান্ধিজি লেখেন : এই প্রকল্পকে 'গ্রামীণ হস্তশিল্পের সঙ্গে গ্রামীণ জাতীয় শিক্ষা' বলা কম আকর্ষণীয় হলেও অত্যন্ত সঠিক হবে।' তাঁর আশঙ্কা প্রকাশ হয়ে পড়ে। গ্রামীণ হস্তশিল্পকে বিজ্ঞানসম্মত বৃত্তিতে পরিণত করাই হবে শিক্ষার প্রধান কাজ। তরুণরা যাতে তাদের বৃত্তি কে সঠিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে পারে, যাতে দেশের প্রতি কর্তব্যসচেতন হয়ে ওঠে, সেজন্যে কিছু সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজন তিনি অনুভব করতেন। শিক্ষাগত সাফল্যে তিনি আগ্রহী ছিলেন না কারণ গ্রামীণ জাতীয় শিক্ষা স্বনির্ভর। রাষ্ট্র গ্রামীণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবে, তাদের স্বাবলম্বী করবে। অন্যভাবে বললে, তাদের উৎপাদিত জিনিষপত্র কিনে নিয়ে রাষ্ট্র তাদের আর্থিক নিরাপত্তা দেবে। এই শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে রাষ্ট্রকে সংযুক্ত করার জন্যে ওয়ার্ধা সম্মেলনে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের মন্ত্রী ও শিক্ষা অধিকর্তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। গান্ধিজি এই প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জন করার ক্ষমতা মন্ত্রীদের আছে একথা বলেছিলেন। কিন্তু হরিপুরা সম্মেলনে কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে বুনিয়াদি জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করার পর কংগ্রেস সরকারের এ প্রস্তাব বর্জন করার প্রশ্ন ওঠে না। কংগ্রেস নীতির অপরিহার্য অংশ হয়ে ওঠে এই পদ্ধতি। কংগ্রেসের কাছে বিষয়টি ধর্মবিশ্বাসের মতো। তারা এটি ঘোষণা করত, প্রচার করত এবং নির্ভুল জাতীয়তাবাদের প্রতীক মনে করত।

রাষ্ট্র গভীরভাবে যুক্ত হওয়ায় এই পরিকল্পনা প্রায়শ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক আলোচনার বিষয়বস্তু হতো। হোসেন, কমিটি সুপারিশ পেশ করার পর শীঘ্রই কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টামণ্ডলী জানুয়ারি 1938 সালে বম্বে প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী শ্রী বি. জি. খেরকে সভাপতি করে আর একটি কমিটি তৈরি করেন। উড ও অ্যাবট প্রতিবেদন, ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলের আলোকে 'বুনিয়াদি জাতীয় শিক্ষা' নামে খ্যাত ওয়ার্ধা সম্মেলনে শিক্ষা পুনর্গঠন সম্পর্কে গৃহীত সুপারিশগুলি পরীক্ষা করাই ছিল এই কমিটির প্রধান কাজ। হোসেন এই কমিটির সদস্য ছিলেন এবং তাঁর অবস্থা দাঁড়ায় সেই প্রার্থীর মতো, যাকে বিচারকদের সামনে নিজের গবেষণামূলক প্রবন্ধের স্বপক্ষে যুক্তিজাল বুনতে হয়।

ড. জাকির হোসেন, সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী

গান্ধীর সমাধি স্থলে ড. জাকির হোসেন

ড. জাকির হোসেন, সঙ্গে জওহরলাল নেহরু

ভারতের রাষ্ট্রপতিরূপে ড. জাকির হোসেন শপথ গ্রহণ করছেন। ভারতের প্রধান
বিচারপতি কে. এন. ওয়াংচু উপস্থিত রয়েছেন।

এই কমিটির প্রতিবেদনে[9] বলা হয়েছে, জাকির হোসেন বুঝতে পেরেছিলেন প্রথমেই ওয়ার্ধা প্রকল্পের খামতির দিকটি উল্লেখ করলে আলোচনা এলোমেলো হবে। শিক্ষা স্বনির্ভর করার নামে ছাত্রদের তৈরি জিনিসপত্র বিক্রি করার ধারণাকে প্রধানত আক্রমণ করা হয়। একে বাধ্যতামূলক শিশু পরিশ্রম উৎপাদনের প্রকল্প মনে হতো, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। প্রকল্প ছিল শিক্ষার উৎপাদনের নয়। হাতের কাজের শিক্ষাগত গুরুত্ব এবং সক্রিয়তার ওপরে জোর দেওয়া হয়েছিলো এবং অর্থনৈতিক প্রশ্নটি ছিল সহায়ক বিষয়। শিশুর শারীরিক এবং সামাজিক পরিবেশ ঘিরে যে বাস্তব জীবন; সেই জীবন এবং তার হাতের কাজকে কেন্দ্র করে ওয়ার্ধা বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিচালিত হবে। সম্পূর্ণ সুসংবদ্ধ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে কাজের মাধ্যম শিক্ষাকে আজকাল প্রত্যেক শিক্ষক সবচেয়ে কার্যকরী মনে করেন।

শুধুমাত্র উৎপাদনের জন্যে কায়িক শ্রমকে ওয়ার্ধা প্রকল্পে বাতিল করা হয়। এবং নির্দেশ দেয়, হস্তশিল্প ও উৎপাদনমুখী কাজ অবশ্যই শিক্ষামূলক হবে। গুরুত্বপূর্ণ মানবিক কাজকর্ম ও উৎসাহ শিক্ষার সম্পর্কযুক্ত হবে।

'উৎসাহী কিন্তু বিভ্রান্ত সমর্থকদের বিবৃতির জন্যে হোসেন একই ধরনের সমালোচনার যথাযথ মূল্য দিতেন না। এই প্রকল্প বেকারি দূর করবে তিনি মনে করতেন না। বাস্তবে তাঁর প্রতিবেদনে বেকারির উল্লেখ নেই। যদিও তিনি জানতেন ওয়ার্ধা বিদ্যালয়ের ছাত্ররা অন্য ছাত্রদের তুলনায় বেশি নিয়োগযোগ্য। কারণ, প্রকল্পটি সেই ধরণের কর্মী তৈরি করার জন্যে রূপায়িত হয়, 'যারা সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজকে সম্মান করবে; নিজের পায়ে দাঁড়াতে ইচ্ছুক ও সক্ষম'। পাঠক্রম শেষ হবার[10] পর সরকার সকলকে চাকরি দেবে বা সমস্ত চালু বিদ্যালয়কে ওয়ার্ধা বিদ্যালয়ে পরিণত করা হবে, এই উভয় বক্তব্যের তিনি বিরোধিতা করেন।

'প্রস্তাবিত ওয়ার্ধা' বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষাকে অবহেলা করা হয়েছে এবং দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ; বিশেষত মুসলিমদের এই সমালোচনার জবাব দেন হোসেন। তিনি স্বীকার করেন, নানা অসুবিধার জন্যে ধর্মশিক্ষার পাঠক্রম প্রকল্পে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এই প্রকল্প স্থাপনের অন্যতম ভিত্তি। বর্তমানে যে কোনও সম্প্রদায় নিজ ব্যয়ে সরকারি বা আঞ্চলিক বিদ্যালয় সমূহে ছুটির পর সম্প্রদায়ের ছাত্রদের ধর্মশিক্ষা দিতে পারে। ওয়ার্ধা প্রকল্প এই ব্যবস্থা বাতিল বা পরিবর্তন কিছুই করেনি।

---

9. কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ মনোনীত কমিটির প্রতিবেদন (1938-43)। শিক্ষা মন্ত্রক, ভারত সরকার। 1958 পৃ 1-3

10. শিক্ষা পুনর্গঠন। পৃ 51

'সহশিক্ষার প্রশ্নেও ভুল বোঝাবুঝি ছিল। ওয়ার্ধা প্রকল্পে সহশিক্ষা কোনও স্তরেই বাধ্যতামূলক করা হয়নি। কার্যত সহশিক্ষা বাঞ্ছনীয় কিনা এ বিষয়ে কোনও অভিমত দেয়া হয়নি।

'ওয়ার্ধা প্রকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শুধুমাত্র পরীক্ষা নেওয়ার কেন্দ্র হবে এবং কোন সরকারি সাহায্য পাবে না'[11] হোসেন এই অভিযোগেরও উল্লেখ করেন। এমন অভিযোগের কোনও জবাব হয় না। তাঁর প্রতিবেদনে চোদ্দ বছরের বেশি বয়সী ছাত্রদের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কোনও আলোচনাই করা হয়নি। এই প্রকল্প গৃহীত হলে ওয়ার্ধা সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে উচ্চশিক্ষার পদ্ধতি ঠিক করা হবে।'

ওয়ার্ধা প্রকল্প বা বুনিয়াদি জাতীয় শিক্ষাকে হোসেন এমনভাবে উত্থাপিত করেন, যাতে গান্ধিজির সমর্থক নয় অথচ শিক্ষাসংস্কারে আগ্রহী ব্যক্তিদের পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল এবং গান্ধিজি স্বয়ং সে প্রস্তাবে আপত্তিকর কিছু দেখেননি। প্রস্তাবে হোসেন এমন কিছু সংযোজন করেন যাতে গ্রামীণ সম্প্রদায় শিক্ষার আলোকে অর্থনৈতিক ভাবে ও আদর্শগত স্বয়ম্ভর হতে পারে। ফলে শহরের উন্নতি ও আধুনিক শিল্প গ্রামকে ধ্বংস করতে পারবে না তার উচ্চাকাঙ্খী যুবকদের মূলত পরজীবী ধরনের চাকরি দিয়ে। এই সংযুক্তি শিক্ষাবিদদের বিচ্ছিন্ন করে এবং যারা শিক্ষাকে নবরূপে দেখতে চায় তারা উদাসীন হয়ে পড়ে। আমরা উল্লেখ করেছি যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা মণ্ডলীর উপসমিতি উড-অ্যাবট প্রতিবেদন ও প্রয়োজনীয় দলিলের নিরিখে নতুনভাবে ওয়ার্ধা প্রকল্প বিবেচনা করার দায়িত্ব পায়। কয়েক বছর পর সার্জেন্ট প্রকল্প হয়। প্রকল্পটি অনেক বেশি সুসংবদ্ধ হলেও শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে পুঁথিগত প্রয়োগ ছাড়া আর কিছু নয়। জাকির হোসেন কমিটির সুপারিশ করা বুনিয়াদি জাতীয় শিক্ষা সরকারি বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতর বুনিয়াদি শিক্ষার সমন্বয় এর যথেষ্ট ক্ষতি করে।

জাকির হোসেন কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করেও কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মণ্ডলী প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা ও ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমিক স্তরে পড়ানোর বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করছিল। সাত বছরের পরিবর্তে বুনিয়াদি ব্যাবস্থা আট বছরের করা দুই পর্বে পাঁচ বছরের নিম্ন বুনিয়াদি ও তিন বছরের উচ্চ বুনিয়াদি উচ্চ শিক্ষার জন্যে সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরাজি শিখতে পারে। ইংরাজি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্তরের মাধ্যম। সময় এক বছর বাড়ানোর জন্যে যারা পূর্ণ সময়ের বুনিয়াদি শিক্ষা চাইত, তারা আপত্তি করেনি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ছিল ঐচ্ছিক। বুনিয়াদি শিক্ষার ধারাবাহিকতায় কোনও বিঘ্ন ঘটানো হয়নি। স্বনির্ভর বিদ্যালয়ের গোঁড়া সমর্থকরাও প্রথম দু তিন বছরে কোনও উৎপাদন আশা করতেন না। উচ্চ বুনিয়াদি

11. শিক্ষা পুর্নঠন। পৃ. 5-6, 31-32, 153, 158, 164-165

বিদ্যালয় বৃত্তিশিক্ষার শিক্ষাগত ও উৎপাদনমুখী ক্ষমতা প্রমাণের বেশি সুযোগ দেবে। তকলি-উৎসাহীরা পরিচালকদের ক্রীড়ক হয়ে পড়েন, কারণ হস্তশিল্পের অন্যান্য বিষয় চালু করার জন্যে তারা কোনও চাপ সৃষ্টি করেননি। তকলি বোনা সস্তা হাতের কাজ ছিল এবং এর মূল্যায়নের ভার শিক্ষাগত মূল্যে বিশ্বাসীদের ওপর চাপানো যেত। শুধুমাত্র তকলি ও তুলা সরবরাহ করে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো যেত। এবং সেগুলো যদি প্রকৃত বুনিয়াদি বিদ্যালয় না-ও হয় তাহলে শিক্ষা বিভাগকে দোষ দেওয়া যাবে না। আমার মনে আছে, হোসেন বি জি খেরের কাছে বুনিয়াদি শিক্ষা দুই পর্বে ভাগ করার বিরোধিতা করেন। তিনি চোদ্দো বছরের উর্ধ্বসীমায় সাত বছরের সুসংহত শিক্ষা পদ্ধতির কথা প্রায়ই বলতেন। তিনি আলোচনার সময় এ বিষয়ে বিরোধিতা করেছিলেন, এমন কোনও নজির নেই। অধিকাংশ সদস্য তাঁর মতের বিরোধী ছিলেন এবং তিনি সংখ্যাধিক্যের রায় মেনে নিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, ইংরাজিকে একেবারে বাতিল করা শোভন হবে না। বুনিয়াদি শিক্ষা যতই স্বয়ম্ভর হোক না কেন, গ্রামীণ যুবকদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা উচিত হবে না এবং ইংরাজি যতদিন উচ্চশিক্ষার মাধ্যম থাকবে ততদিন কোনও-না-কোনও স্তরে ইংরাজি শেখানোর প্রয়োজন আছে।

কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের রাজনৈতিক মতপার্থক্য, বুনিয়াদি পাঠক্রমে ধর্মকে না রাখা এবং মধ্যপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত আর এম শুক্লা তাঁর রাজ্যের বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের নামকরণ বিদ্যামন্দির করার জন্যে সমস্ত মুসলিমরা ওয়ার্ধা প্রকল্প-বিরোধী হয়ে ওঠে। যারা এই প্রকল্পকে মুসলিম-বিরোধী বলে জিগির তুলেছে তারা ভালভাবে পরীক্ষা করলে দেখতে পেত, ইসলামের শিক্ষা অন্য যে কোনও প্রাথমিক পাঠক্রমের তুলনায় এখানে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু কেউ তা করেনি। অত্যন্ত সঙ্গত কারণে হোসেন পাঠক্রমে ধর্মকে অন্তর্ভুক্ত করেননি। এমন করা হলে ইসলাম পড়াশোনার জন্যে যথেষ্ট শিক্ষক পাওয়া যেত না। যদি তা পাওয়া যেত তাহলে তারা মুসলিমের চাইতে বেশি সরকারি কর্মী হয়ে উঠত। হোসেন প্রকাশ্যে বলেন, এমন শিক্ষকদের হাতে ইসলাম নিরাপদ নয়। মুসলিম লিগের দায়িত্বহীন নেতৃত্বের চক্রান্তে এমন ভাবনা প্রতারিত হয়েছিল। তারা প্রচার করেছিল হিন্দুদের ওপর আস্থা রাখলে অথবা সমঝোতাপন্থী মুসলিমকে বিশ্বাস করলে মুসলিমদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। ভাষার প্রশ্নে মুসলিমরা ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল। হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে গান্ধিজি কোনও সুপারিশ করেননি। হোসেন-রও ইচ্ছা ছিল না হিন্দি চাপানো সমর্থন করার। তিনি খুব বিব্রতবোধ করছিলেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে তিনি অস্বীকার করতে পারছিলেন না। আবার একটা ছোট্ট এলাকার বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ভাষাভাষী ছাত্র ছিল। যে অবস্থায় তিনি পড়েছেন, সেখানে নিজেকে সমর্থন করতে পারছেন না আবার, উর্দু সমর্থকদের যুক্তিহীন আক্রমণে মদত দেওয়া তাঁর চরিত্র ও সংস্কৃতিবিরোধী।

মুসলিম শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান, তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও দয়ার জন্যে বিরোধীরা তাঁকে আক্রমণের লক্ষ্য করতে পারেনি। কিন্তু কোনও ধরনের নিরাপত্তা চাওয়া দূরে থাক, তিনি এই কলহে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রশ্নে মতামত দেওয়ার জন্যে সারা ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন একটি উপসমিতি গঠন করে। ওয়ার্ধা প্রকল্পের বিশ্লেষণ যেহেতু এর উদ্দেশ্য, হোসেনকে আলোচনায় অংশ নিতে আমন্ত্রণ করা হয়। প্রধানত উত্তরপ্রদেশ বিহার ও মধ্যপ্রদেশ সরকারের শিক্ষানীতি, আর এস শুক্লা প্রতিষ্ঠিত বিদ্যামন্দির এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার অজুহাতে মুসলিম সংস্কৃতি মুছে ফেলবে; এই বহুল প্রচারিত সন্দেহের জন্যে প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রবল মুসলিম জনমত গঠিত হয়। উপসমিতির আলোচনা কোথাও নথিভুক্ত নেই, কিন্তু হোসেন সহযোগিতা আদায়ে সমর্থ হয়েছিলেন, কারণ প্রকল্পের মূল নীতি উপসমিতি গ্রহণ করেছিল। অন্তত সাত বছরের শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে, এবং প্রয়োজনীয় কাজের ব্যবস্থা করার সুপারিশ উপসমিতি গ্রহণ করে। বর্তমান আকারে ওয়ার্ধা প্রকল্প পরিত্যাগ করা উচিত, মূল সুপারিশের আগে এই বক্তব্য রাখার মধ্যেই তাঁর বিরোধীরা সন্তুষ্ট হন। 1938 সালের অক্টোবর মাসের 1 থেকে 3 তারিখ পর্যন্ত পাটনায় সারা ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের সভা হয়। ড. জিয়াউদ্দিন উপসমিতির সুপারিশ সহ প্রস্তব উত্থাপন করেন। হোসেন উপস্থিত ছিলেন না।[12] সভায় দারুণ হট্টগোল, বাকবিতণ্ডা হয় এবং শেষ পর্যন্ত সংখ্যাধিক্যের ভোটে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বুনিয়াদি শিক্ষার নীতি ও প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনার জন্যে 1938 থেকে 1939 -এর মাঝামাঝি পর্যন্ত হোসেনের খুব চাহিদা ছিল। দিল্লিতে থাকলে শিক্ষা অধিকর্তা ও প্রশাসকরা প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। বিস্তৃত আলোচনা হতো, যেহেতু তাঁর প্রভাব ও সম্মান ছিল, সেজন্যে বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতিতে আগ্রহী প্রত্যেকেই চাকরি চাকরিতে উন্নতির জন্যে তাঁকে অনুরোধ জানাতেন। প্রসঙ্গত, যে সমস্ত রাজ্যে বুনিয়াদি ব্যবস্থা শুরু করা হচ্ছিল যেখানে অনেক চাকরির সম্ভাবনা ছিল। যতদূর মনে পড়ছে, এই সময় তাঁর কোনও সচিব ছিল না। জামিয়া মিলিয়ার সামর্থ্য ছিল না তাঁর জন্যে সচিব বরাদ্দ করার। আবার প্রচলিত আইনে কোনও প্রাদেশিক সরকার সে কাজ করতে পারত না। 1939 সালের মাঝামাঝি আবার ছানির যন্ত্রণা শুরু হয়। তিনি বুঝতে পারেন যে এবার বিশ্রাম না নিলে তিনি ভেঙে পড়বেন। বেতারে তাঁর পাক্ষিক আলোচনার জন্যে তিনি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করছিলেন। নিশ্চিত ছিলেন যুদ্ধ বাঁধবে না। তাই বিশ্রাম ও চিকিৎসার জন্যে

---

12. মনে হয়েছিল সম্মেলনের সভাপতি হবেন তিনি। কিন্তু পাটনার উদ্যোক্তরা বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হককে সভাপতি মনে করেন। হোসেন সম্মেলনের সময় কাশ্মীরে ছিলেন।

তিনি জার্মানি যান। তাঁর ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে পয়লা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ শুরু হয় এবং তিনি জার্মানি ছাড়তে বাধ্য হন। 11 সেপ্টেম্বর জেনিভা থেকে তাঁর সুন্দর ঢঙে তিনি একটা চিঠি লেখেন। চিঠিটি 'দ্য জামিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পুরো চিঠিটা তুলে দেয়া উচিত :

হোটেল দ্য ফ্যামিনিজ
জেনিভা, 11 সেপ্টেম্বর 1939

'আবিদ সাহেব,

জার্মানি থেকে পালাবার দিন আপনার চিঠি পাই। একই ডাকে আমি সাফিক সাহেব ও মেমসাহেব[13]-এর চিঠি পাই। কয়েক সপ্তাহ নির্বিঘ্নে কাটাবার পক্ষে। চিঠিগুলিতে অনেক খবর ছিল। আগে কেউ আমাকে চিঠি লেখার কথা ভাবত না। সাফিক সাহেবে উল্লেখ করেছেন মুজিবসাহেব, আকবরসাহেব,[14] সাইদ সাহেব[15] আমায় চিঠি লিখেছেন কিন্তু আমি সেগুলি পাইনি।

এবার আমার কথায় আসি। 3 জুলাই ভেনিসে আসি। শহরটাকে ভাল লাগল তাই দু দিনের বদলে দশ-এগারো দিন থেকে গেলাম। অজুহাত ছিল আমি ইতালির ভাষা শিখছিলাম। সত্যিই ভাষাটা শিখেছি। তবে শিখতে যে সময় নিয়েছি তার চাইতে কম সময় ভুলে যাব। 18 তারিখে ভিয়েনা পৌঁছোই। ইমতিয়াজ[16] এসেছিল সেখানে। তার সঙ্গে এক সপ্তাহের জন্যে বুদাপেস্ট গিয়েছিলাম। সুন্দর গোছানো শহর বুদাপেস্ট। প্রায় প্রত্যেকেই জার্মান ভাষায় কথা বলে। সেখান থেকে আকাশপথে ভিয়েনা আসি। বিমান ভ্রমণের ইচ্ছাটাই বা কেন অপূর্ণ থাকে! চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে আমায় রেখে ইমতিয়াজ ফিরে গেল। তারা এত পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে যে বর্ণনার অতীত! সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চোখ দুটো ভাল আছে। যদি যথাযথ যত্ন নেওয়া যায় তাহলে তারা ঠিক ভাবে কাজ করবে, কিন্তু অন্ত্রের অবস্থা খুবই খারাপ। পুরাতন আমাশা খুবই ক্ষতিকর অবস্থায়। যকৃৎ এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ, মূত্রগ্রন্থিও আক্রান্ত। এই অবস্থায় বেশিদিন রাখা সম্ভব নয়। চিকিৎসাবিদ্যায় এমন

---

13. শ্রীমতী টিল্লি সিদ্দিকি।
14. চৌধুরী আকবার আলি ওকলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।
15. সাইদ আনসারি, অধ্যক্ষ শিক্ষকশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য 1938 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
16. হোসেনের দাদার ছেলে। জার্মানি থেকে ফিরে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন।

অবস্থায় রোগীর অবস্থা গুরুতর হওয়ার কথা, কিন্তু আমার সব কিছুই যেহেতু এলোমেলো এবং অবৈজ্ঞানিক, সেজন্যে এখন রোগ নিরাময়ের সুযোগ আছে। রক্তের অবস্থা যেমন হওয়া উচিত ছিল তার চাইতে অনেক ভাল, সেজন্যে চিকিৎসা সহজ হবে। হৃদ্‌পিণ্ডটা (কী নিষ্ঠুর মজা!) এখন বাধ্য আছে। মাথাটা আমার পরীক্ষা করা হয়নি, করা হলে বেশ মজা হতো। আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্যবিধি মেনে খাওয়াদাওয়া, এখন ওষুধের চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সাতটা ইনজেকান নিতে হবে। কিসিংজেনে গিয়ে তিন সপ্তাহ বিশ্রাম, ইনজেকশন নেওয়া ও নিয়ম মেনে খাওয়ার নির্দেশ পেয়েছি। তারপর রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। ইনজেকশনের জন্যে রক্ত পাতলা হলে, আমাকে চার থেকে পাঁচ সপ্তাহ পরে আবার ইনজেকশন নিতে হবে; নচেৎ তিন সপ্তাহের বিরতি-ই যথেষ্ট। সেজন্য 15 অগস্ট কিসিংজেন এসেছি। ছোট্ট শহর, বাসিন্দারা সকলেই বহিরাগত এবং অসুস্থ। চারিদিকে ফুলের শোভা, জায়গাটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। ভিয়েনার চিকিৎসক আমার অসুস্থতার বিস্তৃত বিবরণ লিখে দিয়েছিলেন অনেকটা শেষ ইচ্ছাপত্রের মতো। তাছাড়া স্থানীয় ডাক্তারকে একটা পরিচয়জ্ঞাপক চিঠিও দিয়েছিলেন। যেদিন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম, সেদিনই তিনি চিকিৎসা শুরু করলেন। আমাকে এমন একটা বাড়িতে নিয়ে তুললেন যার বাড়িওয়ালি একজন ডাক্তার। তাঁর মৃত স্বামীও ডাক্তার ছিলেন। বৃদ্ধা, মানে অভিজ্ঞতাসম্পন্না! খাদ্যের ব্যাপারে যা যা করণীয় তিনি সব কিছু করেছেন। কয়েকদিনের মধ্যেই ভাল বোধ করছি। সময়ের খেয়ালখুশি সম্পর্কে কার কি বলার আছে। যুদ্ধের গুজব ছড়িয়ে পড়ল। মানুষ ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ি, মটর গাড়ি সবই বাজেয়াপ্ত করা শুরু হলো। 25 অগস্টে মধ্যে সব কিছু তৈরি। আমাদের সব চাকরবাকর সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে। আমার অসুস্থ সঙ্গীরা পলিয়ে গেছে। রেল পরিষেবা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। একমাত্র আমিই ঘাঁটি আঁকড়ে পড়ে আছি! কী-ই বা আর করার আছে? সব কটা ইনজেকশন নিতে পারিনি, স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। সেজন্যে আমি আশা করছিলাম যুদ্ধ হবে না। এই শান্তি কামনার ফলে 26 অগস্ট প্রায় 9" লম্বা একটা কৃমি পড়ে। আমাশার সঙ্গে এই জিনিসটি আমার পেটের ভিতর বছরের পর বছর ছিল। তাকে নিয়ে আমি ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি কি একটা লাতিন নাম বলেলন আমি মনে করতে পারছি না। তিনি বললেন, অনেক দিন থেকে ভিতরে ছিল, বাইরে আসায় খুব ভাল হয়েছে। এই পর্ব এখানেই শেষ। আমি খুশি যে চিকিৎসা সফল হয়েছে। সেপ্টেম্বরে ইনজেকশন নেওয়া ও বাষ্প-স্নান শেষ হয়। 2 সেপ্টেম্বর ইংল্যাণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করে। তারপর থেকে আমি যতদূর জানি; আলোচনা চলছে এবং আমি নিশ্চিত শান্তিপূর্ণ উপায়ে কিছু বিষয় নিষ্পত্তি হবে। যুদ্ধের বিষয় আরও জানতে পাবি 3 সেপ্টেম্বর, রবিবার। আমি তৎক্ষণাৎ স্টেশনে যাই পরদিন সকাল 5 টায় ট্রেন আছে জানতে পারি। বাড়ি ফিরে বকেয়া মিটিয়ে

মালপত্তর গুছিয়ে রাত দশটার সময় স্টেশনে আসি; ভোর পাঁচটায় ট্রেনে চড়ি। ট্রেন এমনভাবে চালানো হচ্ছিল যে এক এলাকার বাসিন্দা অন্য এলাকা সম্পর্কে কোনও কথা বলতে না পারে। আমি ঠিক করলাম সুইজারল্যাণ্ড যাব। আমাকে বলা হয় স্টুটগার্ট পর্যন্ত যেতে পারি। আমি স্টুটগার্ট পর্যন্ত টিকিট কাটি। তিনবার ট্রেন বদল করার কথা। দুবার বদলের পর বলা হলো, ট্রেন আর যাবে না। সব যাত্রীকে নেমে যেতে বলা হলো। নেমে পড়লাম। সেখানে আট ঘণ্টা ছিলাম। ছোট্ট স্টেশন, বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় নিষ্প্রদীপ। প্রতি এক দু ঘণ্টা অন্তর সীমান্ত এলাকা থেকে বৃদ্ধ ও শিশুদের ট্রেনে করে অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কোনওভাবে সময় কাটে, আমরা স্টুটগার্ট পৌঁছলাম। ওখানে আমি জুরিখ যাওয়ার কথা বলায় জানানো হলো, একটি ট্রেন ছাড়ছে। আমার মালপত্তর তখন আসেনি। ইতিমধ্যে জুরিখের ট্রেন চলে গেল। আমি রাতটা স্টুট্যগার্টে কাটালাম। নিয়মানুযায়ী আমি সরকারি আতিথ্য পাওয়ার যোগ্য, কেন দেওয়া হয়নি, জানি না। পরদিন সকালে টিকিট কেটে জুরিখ রওনা হলাম। কনস্টানসি হ্রদের পাড়ে ফ্রেডারিখ শ্যাক্কেন শহরে নেমে পড়ি। জায়গাটা জার্মানির সীমান্তে। এখান থেকে নদীপথে যেতে হবে। আমি রাতে নেমেছি, পরদিন বেলা তিনটেয় স্টিমার ছাড়বে। পথে শুনেছিলাম, স্টিমার বন্ধ হয়ে গেছে। এখানে এসে দেখি চালু আছে। আমি স্টিমারে উঠলাম। জার্মান পুলিশ জানালো, সুইসরা আমাকে নামতে দেবে না, আজ সকালেই পঞ্চাশজন যাত্রীকে ফেরত দিয়েছে। বললাম, 'অনুগ্রহ করে যেতে দিন আমি আমার কপাল পরীক্ষা করে দেখি।' তারা হাসল কাঁধ ঝাঁকাল এবং আমার ছাড়পত্রে ছাপ দিল। আমি রোমানশর্ন পৌঁছলাম। স্টিমারে 400 জনের জায়গা থাকলেও এ-যাত্রায় আমরা তিনজন যাত্রী। দুজন সুইস জার্মানি ছেড়ে যাচ্ছে সৈন্যদলে নাম লেখাবে বলে। ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করলেন, আমার সুইস ভিসা আছে কিনা। আমি বললাম, না। 'আপনি তাহলে উঠলেন কি করে? গতকাল রাত বারোটার সময় আমাদের সরকার নির্দেশ জারি করেছে, বিদেশ থেকে আগত সমস্ত যাত্রীর ভিসা লাগবে, সেজন্যে আমরা যাত্রিহীন অবস্থায় যাচ্ছি।' জাহাজ ছাড়ার পর এই আলোচন শুরু হয়। বললাম : 'এখন তো চলতে শুরু করেছি। ক্যাপ্টেন বললেন, 'এই স্টিমারে গিয়ে ফিরে এসে একটা ভিসার চেষ্টা করুন ....'। যে শহরে যেতে হবে যার নাম জানালেন। বললামঃ 'না, এরকম কিছু আমি করতে চাই না, একবার জার্মানির সীমান্ত পার হয়ে গেলে জার্মানদের আতিথেয়তার ওপর আবার অত্যাচার করতে চাই না।' এই সময় আমরা রোমানশ-এ এসে গেছি। ক্যাপ্টেনের আশঙ্কা সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। সীমান্ত পুলিশ আমাকে ফিরে যেতে বলল। বললাম, 'অসম্ভব, তোমরা আমায় গ্রেপ্তার করে জেলে দিতে পারো।' কিছুক্ষণ ধরে তারা বোঝাতে লাগল, নির্দেশ মানতেই হবে। তারপরে মনে করল, আমি ফিরে গেলে আমায় বন্দি করা হবে, সেজন্যে আমায়

ফেরত পাঠানো অন্যায়। বললাম, 'তুমি ঠিকই বলেছ', সুতরাং বার্নে যোগাযোগ করা হলো। আমি সুইজারল্যাণ্ডে ঢোকার অনুমতি পেলাম এবং জুরিখ এলাম। সেখানে ব্রিটিশ কনসাল আমাকে জেনিভা যেতে বলেন। সেখান থেকে ইংল্যান্ড বা ভারত যাওয়া সুবিধাজনক। সুতরাং 9 তারিখে আমি এখানে এসেছি। এখানে যে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার কথা দৈবাৎ তাঁর দেখা পেলাম। আমার সঙ্গে একই হোটেলে আছেন। এখন আর কোনও দুঃশ্চিন্তা নেই। কয়েকদিনের ধকলে যে সৌন্দর্য আমি কিসিনজেন থাকতে পেয়েছিলাম, তা আর নেই, তবে সব মিলিয়ে ভালই আছি। পর্যাপ্ত ঘুম, হজম করতে সক্ষম, পর্যাপ্ত খাওয়া, আর কি চাই? নির্দিষ্ট বিরতির পর ইনজেকশন নেবার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব। ইতালি যদি নিরপেক্ষ থাকে, খোদার দোয়ায় অক্টোবরের শেষের দিকে আপনাদের কাছে ফিরে যাব। আমার মনে হয় না, আর কোনও অর্থের প্রয়োজন আছে। তবে ভাল হয়, যদি আপনি কুড়ি-তিরিশ পাউণ্ড জোগাড় করে রাখেন, আমার তার পেলে যাতে পাঠাতে পারেন।

'দয়া করে চিঠির বিষয়বস্তু সব বন্ধুদের এবং ইউসুফ ও মামুদ[17] কে বলবেন। এখানে আমার সবচেয়ে বড় কারণ আপনাদের খবর পাব। আমার আশা সঠিক হলে শীঘ্রই দেখা হবে।'

ফিরে এসে চিঠিতে উল্লেখ নেই এমন একটি ঘটনা তিনি বিবৃত করেন। জার্মান সীমান্তে শুল্ক দপ্তরের পরীক্ষার জন্যে যখন তিনি বাক্স খোলেন, সেখানে উর্দুতে লেখা কিছু মন্তব্য তাঁর বাক্সে ছিল। শুল্ক আধিকারিক জানতে চান, কি ধরনের দলিল সেটা। 'জার্মান সৈন্যবিন্যাস সম্পর্কে গুপ্তলিখন। কিন্তু তোমার চিন্তিত হবার কিছু নেই। আমি বাড়ি গিয়ে যখন তাদের হাতে এটা তুলে দেব, তখন জার্মানরা যুদ্ধ জয় করে ফেলবে।' হোসেন জবাব দেন। সেই ভদ্রলোক আর কোনও প্রশ্ন না করে ডালা বন্ধ করে দেন।

হোসেন যখন জার্মানি থেকে ফিরে আসেন, ততদিনে প্রদেশের কংগ্রেস সরকারগুলি পদত্যাগ করেছে। এর ফলে বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর রাজনৈতিক কারণে যতটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে মনে হয়েছিল তেমন কিছুই হয়নি। বিহারে রাজ্যপালের উপদেষ্টা এবং শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কাজিনস, যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন। বম্বেতে কংগ্রেসে শাসনে যে শিক্ষা অধিকর্তা বুনিয়াদি ব্যবস্থার কট্টর সমর্থক ছিলেন, তিনি বিরূপ মন্তব্য করেন। কিন্তু সেজন্যে পরীক্ষানিরীক্ষা বাতিল করা হয়নি। শুধু সম্প্রসারণ স্থগিত রাখা হয়েছিল। এবং 1941 সালের এপ্রিল মাসে পুনর্গঠিত উপদেষ্টা পর্ষদ থেকে হোসেন পদত্যাগ করেন। উত্তরপ্রদেশে ড. সম্পূর্ণানন্দ শিক্ষা

---

17. হোসেনের ছোট ভাইয়েরা।

অধিকর্তা পায়েল প্রাইস, উপ-অধিকর্তা ড. আই আর খাঁন, তাঁদের নিজস্ব ব্যাখ্যা দেন হিন্দুস্থান তালিমি সংঘের সম্পাদকের ব্যাখ্যা এড়াবার জন্যে। মাদ্রাজ ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গোড়া থেকেই ঐকান্তিকতাহীন। উড়িষ্যার কংগ্রেস মন্ত্রিসভা শর্তসাপেক্ষে সম্মতি জানিয়েছিল কিন্তু সরকারি আদেশ বলে মার্চ 1941[18] থেকে তা রদ করা হয়। আর মধ্যপ্রদেশে প্রাদেশিক সরকার নয়, স্বশাসিত সংস্থাগুলি প্রকল্পের কাজ ব্যাহত করেছে।

সেবাগ্রামে হিন্দুস্তান তালিমি সংঘের সভায় যখন হোসেন যেতেন, আমি সব সময় তার সঙ্গী হতাম। সভার পর গান্ধিজির সঙ্গে দেখা হতো। হোসেন তাঁকে সভার বিবরণ দিতেন। এই সাক্ষাৎকারে খুব মজা ছিল। হোসেনকে খুব লাজুক দেখাতো। একজন তরুণ তার প্রতি দয়ালু এবং আস্থাশীল বয়স্ক যে শ্রদ্ধা দেখায়, তিনি তেমনভাবে আলোচনা করতেন। তাঁর তরফ থেকে গান্ধিজি আস্থা পোষণ করতেন এমন একজনের ওপর, যাকে তিনি নিজের হৃদয়ের ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব দিয়েছেন। মতপার্থক্য আছে বলে দুজনের কেউ মনে করতেন না। কিন্তু পার্থক্য ছিল। তবে মহাত্মা গান্ধি বা হোসেন কেউ অযৌক্তিক ছিলেন না। নিজের উপস্থিতি সম্পর্কে তিনি খুব চিন্তিত থাকতেন। জামিয়া মিলিয়ার শিক্ষক শিক্ষণকেন্দ্রকে বছরে 3000 টাকার অনুদান দিত হিন্দুস্তানি তালিমি সংঘ। সেজন্য প্রতিষ্ঠানের কাজের অগ্রগতির বার্ষিক প্রতিবেদন তাদের কাছে পেশ করতে হতো। কিন্তু প্রথম বছরেই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ একেবারে শেষ মুহূর্তে প্রতিবেদন তৈরি না করতে পারার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন। আমি সেই সভায় ছিলাম। তাঁকে ভর্ৎসনা করার পরিবর্তে কয়েকটি কাগজের টুকরো নিয়ে নিজেই প্রতিবেদন লিখতে শুরু করেন। সংঘের সভায় তিনি সেই প্রতিবেদন পাঠ করেন। সত্যি খুব ভাল প্রতিবেদন।

---

18. 'ওয়ার্ধা প্রকল্পে $5^1/_2$ ঘণ্টার মধ্যে 3 ঘণ্টা 20 মিনিট হাতের কাজের জন্যে সুপারিশ করা হয়। দ্বিতীয়, কোনও হস্তশিল্পের ব্যবস্থা না থাকায় এই বিদ্যালয়গুলি চরকা বোনার স্কুল হয়ে উঠবে। চরকা টানা একঘেয়ে কাজ, এর ফলে উড়িষ্যার ছেলেদের কোনও উন্নতি হবে না।'

'বুনিয়াদি বিদ্যালয় অনেক খরচসাপেক্ষ। প্রদেশের পক্ষে এই ব্যয়নির্বাহ সম্ভব নয়, তাছাড়া এই পরীক্ষা সফলতার কোনও ইঙ্গিত নেই। প্রথম বছরে উড়িষ্যা সরকার ছাত্র পিছু 8 আনা বরাদ্দ পায়, যদিও বলা হয়েছিল ছাত্র পিছু 3 টাকা 9 আনা করে দেওয়া হবে। তারা এজন্যে পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে।'

উল্লেখ করা হয়েছে মাদ্রাজ সরকার কংগ্রেস শাসনে প্রাথমিক শিক্ষার পরিবর্তিত পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল। 'দু বছরের কাজ'। হিন্দুস্তানি তালিমি সংঘ। এপ্রিল 1942।

নিজের কৃতিত্ব যিনি সহজেই সহকর্মীকে দিতে পারেন তিনি চরকার শিক্ষামূল্য নিয়ে গান্ধিজির সঙ্গে বিতর্কে যাবেন না।

বুনিয়াদি শিক্ষা প্রসঙ্গে যেখানেই তাঁকে বলতে হয়েছে, সেখানেই তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন যে তাঁর চিন্তার বুনিয়াদি স্কুল মানে যেখানে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া। 1941 সালের এপ্রিল মাসে জামিয়া মিলিয়াতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বুনিয়াদি শিক্ষা সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি একটি সুন্দর বক্তব্য রাখেন :

'আমরা যখন শিক্ষার সঙ্গে কাজের কথা বলি, আমরা সেই ধরনের কাজের কথা বলি যার শিক্ষামূল্য আছে, যা মানুষকে আরও সুন্দর করে তোলে। সে কি করছে, তার কাজের ভুলত্রুটি কোথায় সেই বিশ্লেষণ করেই মানুষ উন্নতি করে। কোনও কাজকে একজন মানুষ তখনই শিক্ষামূলক করতে পারে, যখন স্ব-আরোপিত শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে সে কাজের মধ্যে মগ্ন হয়ে পড়ে। পরিকল্পনা করে যে কাজ করা হয়, সেই কাজ শিক্ষামূলক হয়। যান্ত্রিকভাবে কোনও কাজ করলে, তা শিক্ষামূলক হয় না। মনের ভিতর সব সময় কাজের ছক কষে নিতে হয়। এর পরের কাজও মনন সংক্রান্ত—সামর্থ্যের হিসাব কষা এবং উদ্দেশ্য উপযোগী কাজগুলিকে চিহ্নিত করা। তারপর আসে, কাজটিকে বাস্তবায়িত করা। সবশেষে বিচার করতে হয় কাজটি পরিকল্পনা মাফিক হয়েছে কি না, যে হিসাব করা হয়েছিল তার মধ্যে হয়েছে কিনা, যে পরিশ্রম এবং মালমশলা খরচ হয়েছে, তা যুক্তিযুক্ত কিনা। এই চারটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ের মাধ্যমে কাজটি শিক্ষণীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু এই-ই সব নয়। কোনও নির্দিষ্ট কাজ বারবার করা হলে, এক ধরনের নৈপুণ্য তৈরি হয় কিন্তু নৈপুণ্য শিক্ষামূলক কাজের উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষিত লোকের যে ধারণা আমরা মনের মধ্যে রাখি সেখানে দক্ষতার কোন ভূমিকা নেই। যারা চুরি করে, প্রবঞ্চনা করে, সত্যকে মিথ্যা বলে; তারাও দক্ষতা অর্জন করতে পারে, কিন্তু সেটা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে যে মূল্যবোধ, তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। নিজের জন্যে যে কাজ করে সে দক্ষ হতে পারে, শিক্ষিত নয়। উচ্চমূল্যবোধের জন্যে যে কাজ করে যে দক্ষ হতে পারে, শিক্ষিত নয়। উচ্চমূল্যবোধের জন্যে যে কাজ করে সে নিজেকে শিক্ষিত করে তোলে। নিজের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্যকে দায়িত্ব পালনে ব্যয় করে। তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়, চারিত্রিক দৃঢ়তা বাড়ে। ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে উপেক্ষা করে সমষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করে শিক্ষারই ফল। হাতের কাজ বা মানসিক পরিশ্রম তাই শিক্ষামূলক হতে পারে আবার ব্যর্থও হতে পারে। সত্যিকারের কর্মশালায় শিশুরা পরিকল্পনা করতে শেখে, কাজ শুরু করার আগে নিজের সামর্থ্যের কথা বিবেচনা

করে, কাজ শেখা করার পর সাফল্য ও ব্যর্থতার বিশ্লেষণ করে। এভাবেই তারা উপলব্ধি করে যে কাজ-ই তারা গ্রহণ করুক না কেন, তার পিছনে নিজেদের শক্তি, সামর্থ্য ও দক্ষতা নিয়োগ না করলে তারা নিজেদের প্রতি এবং নিজেদের সংগঠনের প্রতি অবিচার করবে।'[19]

1948 সালে যখন তিনি হিন্দুস্তানি তালিমি সংঘের সভাপতি পদে ইস্তফা দেন তখন থেকেই বুনিয়াদি শিক্ষার অভিযানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ শেষ হয়। দশ বছর বিজ্ঞান ভবনে ডিসেম্বরের 12-14 তারিখে অনুষ্ঠিত পটেল স্মারক-বক্তৃতায়[20] এই বিষয়ে তিনি তাঁর শেষ অভিমত জানান।

'আমি মনে করি, বুনিয়াদি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে আমাদের প্রচেষ্টা বিষয়ে আমাকে কিছু বলা উচিত। আমার অভিমত এ বিষয়ে আমার ব্যাপক নিরীক্ষণের ফসল। কোনও প্রথামাফিক আলোচনা নয়। সারা ভারত আমার আলোচ্য নয়। আমি জানি বুনিয়াদি ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কি, সঙ্গতভাবে সে কি চায়। বেশ কিছু নিদর্শন আমি দেখেছি। সেই আলোকে আমার অভিজ্ঞতা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই যে আমরা তেমন কিছু অর্জন করিনি, যাতে উপযুক্তভাবে পরিচালিত একটি বিদ্যালয়ে সহজেই করা যায়। এর অনেক কারণ আছে, আমরা সাধারণভাবে কাজের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত অবস্থান তৈরি করতে পারি না ... যেমন আমরা পাঠ্যপুস্তক প্রধান বিদ্যালয়ের পরিবর্তে যান্ত্রিকভাবে কিছু শ্রমবিদ্যালয় তৈরি করেছি। তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। পাশাপাশি আমরা সংখ্যায় নগণ্য হলেও আদর্শ বুনিয়াদি বিদ্যালয় কিছু তৈরি করেছি। কাজ সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। একটি শিশুর নিজস্ব প্রেরণা থাকে না, কোনও কাজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বোঝার সামর্থ্য তার নেই। কৌতূহল এবং নিজের হাতে কাজ করার আনন্দ ছাড়া তার আর কোনও উৎসাহ নেই। তাকে যেমন বলা হয়, সে তেমন করে। তাকে সমাধান করতে হবে এমন কোন, সমস্যা ছাড়াই যে শুরু করে। তার সমস্যা সম্পর্কে সে ভাবতেই পারে না। অন্য কোন, পন্থা সে নিরূপণ করতে পারে না। একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তাকে কিছু করতে বলা হয় এমনকী কোনও কাজ তার শিক্ষকের সঙ্গে করার আনন্দ থেকেও সে বঞ্চিত হয়। তাকে মাঝেমাঝে কাজ করতে দেওয়া হয় নিয়মিত ভাবে নয়। এবং যারা তাকে এই কাজ করতে দেয় সাধারণত যে কোনও

19. দু বছরের কাজ। পৃ 31-33

20. তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রকাশনা, নয়া দিল্লি, সেপ্টেম্বর 1959. পৃ 82-84

ফলেই তারা সন্তুষ্ট হয়। আপনারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন, সাময়িক কালের বৈশিষ্ট্য এই রকম। আমি মনে করি একমাত্র যথোচিত শিক্ষার মাধ্যমে এই ধরনের কাজকে আন্তরিক কাজে পরিবর্তন করা সম্ভব। তার ফলে, ভাল কাজ করার আগ্রহ বাড়ে, সম্পূর্ণতা অর্জন কার করা পর্যন্ত আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকে।'

বেশ কিছু বুনিয়াদি বিদ্যালয় এই বয়সের ছাত্রদের শিক্ষাদানে রত অন্যান্য বিদ্যালয়ের তুলনায় যথেষ্ট ভাল। কারণ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের যোগাযোগ অনেক কম এবং কিছু মূল্যবোধ সম্বল করে শিক্ষিত ক্ষুদ্র জনসমষ্টি হিসাবে তাদের গড়ে তোলা হয়। শিক্ষাগত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তাদের হাতের কাজ তাদের মানসিক গঠনের সঙ্গে সাযুজ্য। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিক্ষাগত কাজের মাধ্যমে শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে এদের গড়ে তুলতে পারব, ততক্ষণ অবধি আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি না।[21]

21. দু বছরের কাজ। পৃষ্ঠা 87-88

চরম বিপর্যয়ের পথে

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকরা জাতীয় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণীকক্ষ ছেড়ে রাজনৈতিক মঞ্চে চলে আসেন। রাজনীতিতে যোগ দেবার ইচ্ছা হোসেন যে প্রতিহত করতে পেরেছিলেন, এটাই অবাক কাণ্ড। আগ্রহ ছিল অথচ সব কিছু ঠিকমতো হচ্ছে না, এই ভাবনায় তা প্রায়শই প্রবল হতো। প্রকাশ্যে তিনি সমালোচনা করতেন না, কিন্তু ব্যক্তিগত আলোচনায় হতাশা ও সমালোচনা লুকিয়ে থাকত না। যতদূর মনে করতে পারি, তিনি কংগ্রেস সরকারের পদত্যাগ সমর্থন করেননি। রাজনীতিতে নৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্ব অসীম কিন্তু যে কোনও ঘটনাকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করা উচিত। কৌশল ও দূরদৃষ্টির সাহায্যে তার মোকাবিলা করা দরকার। কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করছে আর ইংরাজ সরকার তাদের পদত্যাগ বাধ্য করছে; দুটি ঘটনার মধ্যে আশমান-জমিন ফারাক। একটি ক্ষেত্রে, বিভিন্ন বিষয়ের ভারসাম্য বজায় রাখা ও ইংরেজ সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করে পরোক্ষে ফ্যাসিবাদকে সমর্থন করা হবে কিনা, তার ওপর নির্ভরশীল। অপর ক্ষেত্রে, ধনতন্ত্র থাবা বসিয়েছে তার প্রতিবাদে ফ্যাসিবাদের নিন্দা করা আরও বেশি যুক্তিযুক্ত। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সেপ্টেম্বর প্রস্তাব দেখলেই যে কেউ বুঝতে পারবেন ওটি জটিল সিদ্ধান্তহীনতায় আক্রান্ত, সঠিক নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ একটি দলিল।[1]

---

1 1942 সালের এপ্রিলে সঙ্গে হিন্দুস্তানি তালিমি সংঘের বার্ষিক অধিবেশনের পর হোসেন গান্ধিজির সঙ্গে একটি সভায় মিলিত হন মনে আছে। যুদ্ধ নিয়ে সকলেই চিন্তিত, গান্ধিজি 45 মিনিট ধরে যুদ্ধের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। আমাদের কুটিরে ফেরার মুখে হোসেন আমাকে প্রশ্ন করেন, 'গান্ধিজির কথা কিছু বুঝলে?' 'আমি বললাম, 'না।' — 'আমিও কিছু বুঝিনি', তিনি বলেন। গভীর নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বলেন, 'কী ঘটবে কে জানে।'

গান্ধিজি সে সময় গভীর সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলেন। তাঁর এলোমেলো ভাবনা তাঁর ভিতরের দ্বন্দ্বের প্রকাশ। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগের অবস্থা তখন।

কংগ্রেস মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করায় মুসলিম লিগের খুব সুবিধা হয়। তাদের নেতাদের কোনও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না, ইয়োরোপীয় বিবাদের তত্ত্ব সম্পর্কে তারা ছিল অজ্ঞ এদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের মধ্যে হিন্দু-বিরোধী মনোভাব তৈরি করা এবং এর জন্যে যে কোনও সুযোগ কাজে লাগানো। যেটুকু রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল তা পরিত্যাগ করার ফলে তা কংগ্রেসের পক্ষে মুসলিম লিগকে প্রতিহত করা শক্ত ছিল। মুসলিম লিগ লাহোরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মার্চ 23 1940 সালে, পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই বিপজ্জনক প্রবণতায় সকল দেশপ্রেমিকের মতো হোসেনও যথেষ্ঠ বিব্রত বোধ করেছিলেন। 1935 সালে কাশী বিদ্যাপীঠের সমাবর্তন ভাষণে তিনি প্রকাশ্যে আকাঙ্খা প্রকাশ করেন : 'মহৎ হৃদয় রাজনীতিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে যা করা উচিত তা করা হচ্ছে না, মুসলিমদের ভারতীয় জনগণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে মনে করা হচ্ছে না।' তাঁর এই দুঃখ কমানোর জন্যে কিছুই করা হয়নি। বুনিয়াদি শিক্ষা প্রচারের দায়িত্বের বদলে হোসেন যদি এই দায়িত্ব গ্রহণ করতেন, তা হলে খুব বেশি তফাত হতো বলে আমরা নিশ্চিত নই। কিন্তু তিনি নিজেই সান্ত্বনা পেতেন এই ভেবে যে, জাতীয় নীতিতে বোঝাপড়া করার জন্যে তিনি তাঁর সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। ব্যাপারটা এমন হয়েছিল যে, বুনিয়াদি শিক্ষায় তাঁর আগ্রহের জন্যে সকলে ধরে নিয়েছিলেন, পরিপূর্ণভাবে তিনি কংগ্রেস রাজনীতিতে আসক্ত এবং মুসলিম-লিগপন্থী মুসলমানরা তাঁকে মুসলিম সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখার যোগ্য মনে করতেন না। মুসলিম লিগের পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণের পর সমস্ত বিষয়ই রাজনৈতিক চরিত্র পায়। একজন শিক্ষাবিদের এক্ষেত্রে নিজের চরকায় তেল দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। তিনি শুধু নিজের যন্ত্রণার কথাই প্রকাশ করেছিলেন :

'বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আজ আমরা ভাগ্যবান। তিনি আজ আমাদের সম্মেলনের উদ্‌বোধন করবেন। তার মাধ্যমে সারা দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে আমরা রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তন করার আবেদন রাখছি। শিক্ষবিদ হিসাবে অনুরোধ করছি, এমন বাতাবরণ তৈরি করতে যেখানে এক সম্প্রদায়কে বিশ্বাস করবে, আস্থা রাখবে, সবলের অত্যাচারে দুর্বল সন্ত্রস্ত থাকবে না, বিত্তবানের হাতে গরিবরা অপমানিত ও নির্যাতিত হবে না, বিভিন্ন সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে পাশাপাশি, একে অন্যের গুণের প্রশংসা করবে, প্রতিটি নাগরিক তার প্রকৃতিদত্ত গুণগুলির বিকাশ ঘটাতে পারবে এবং নিজের ব্যক্তিত্বের সবটুকু সমাজের সেবার ব্যয় করবে। আমি জানি, এমন অনুরোধ করা খুব সহজ কিন্তু তা পূর্ণ করা কোনও একজন ব্যক্তির সাধ্যের অতীত। কিন্তু আজ আমি অনুভব করছি, অতীতের চাইতে রাজনৈতিক নেতাদের আজ বেশি সুযোগ আছে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দলের ইচ্ছা, অসুবিধা আলোচনা করে, ক্ষমতা ও সুযোগ পরিচ্ছন্নভাবে বিনিময় করে একটি

নৈতিক গুণসম্পন্ন প্রগতিশীল রাষ্ট্র গড়ার। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, আমাদের মতো শিক্ষাবিদদের দুঃখজনক অবস্থার মধ্যে থাকতেই হবে। আর কতদিন মরুভূমিতে চাষ করব? আর কতদিন আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা, সমস্ত আদর্শ, সমস্ত স্বপ্ন অবিশ্বাস ও সন্দেহের বিষবায়ুতে জর্জরিত হতে দেখব? একটি রাজনৈতিক ভুল, একটা জেদ, আমাদের এতদিনের পরিশ্রম আর ভালবাসা দিয়ে যা কিছু অর্জন করেছি সব ধ্বংস করবে এই ভয়ে আর কতদিন কাঁপব? আমরা হতাশ জর্জরিত, রক্তাক্ত। আমাদের কাজ সহজ নয়। আমরা যদি সব সময় মনে করি আমরা শক্তিহীন, তবে কার ওপর আস্থা রাখব? যে সমাজে ভাই লড়ছে ভাইয়ের বিরুদ্ধে, যেখানে কোনও মূল্যবোধই চরম বলে মনে করা হয় না, যে সমাজে নেই কোনও ঐকতানের সুর, এমন কোনও উৎসব নেই যেখানে সকলে অংশ নিতে পারি, নেই এমন আনন্দ যা সবাই মিলে ভাগ করে নিতে পারি, একের দুঃখ অন্যাকে কাঁদায়, আমরা কী সেইরকম সমাজের ওপর আস্থা রাখব। আমাদের দুর্দশা সহ্যের অতীত। আমাদের মুক্তি দিন, আজই মুক্তি দিন। কেননা আগামিকাল আমাদের ভাগ্যে কী আছে, কে বলতে পারে?'[2]

হোসেন জানতেন, একজন শিক্ষাবিদকে যে কোনও সময়ে তার নিজের চরকায় তেল দেওয়ার কথা বলা হতে পারে, তবুও রাজনৈতিক পরিবারে কোনও দাসবৃত্তি তিনি মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। পারস্পরিক হানাহানিতে সকলের মঙ্গল, এমন ধারণা তিনি পোষণ করতেন না। 1941 সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত সারা সিন্ধু শিক্ষা সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে, সিন্ধু প্রদেশ ও তার চারধারে সম্প্রদায়গত বিদ্যালয়ের বৃদ্ধিকে তিনি স্বাগত জানান। যদিও হালকাভাবে বলা হয় সম্প্রদায়গত বিদ্যালয়, তত্ত্বগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ, ব্যবহারিকভাবে ক্ষতিকর : 'সবচেয়ে পরিবর্তনশীল অথচ খুঁটিনাটি বিচারে অক্ষম সংখ্যাগুরু'র[3] প্রতি আনুগত্যের চাহিদার বিরোধিতা করেন হোসেন। তবলিঘি জামায়েতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা আগেই বলা হয়েছে। রাজনৈতিক প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধির মুখে মুসলিম লিগের নেতারা প্রমাণ করতে ব্যস্ত ছিলেন যে, তাঁরা শুধু রাজনীতি করেন না, মুসলিম সম্প্রদায় ও তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নের জন্যও উদগ্রীব। জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা হিতসাধনমূলক প্রতিষ্ঠান থেকে লিগ সমর্থকদের দূরে রাখার চেষ্টা করতে ব্যর্থ হলে, নিজেরা ওই প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে চলে আসত। হোসেন লিগের রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে কখন একমত হননি, এমনকী যে ভাষায় ও পদ্ধতিতে তাদের বক্তব্য রাখা হয়, তিনি তার ঘোর বিরোধী ছিলেন। সামাজিক উন্নতি সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহযোগিতা

---

2. দু বছরের কাজ — হিন্দুস্তানি তালিমি সংঘ, পৃ. 28-29

3 ভি. এম. মাথুর (সম্পাদিত) — জাকির হোসেন শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক, পৃ. 58

যখন একান্ত প্রয়োজন, সে সময় শিক্ষাবিদ হিসাবে সহযোগিতার বন্ধুর পথে চলা তাঁর দায়িত্ব বলে তিনি মনে করতেন।[4]

1942 সালে তিনি ইঙ্গ-আরবি কলেজের কার্যকরী সমিতির সহ-সভাপতি হন। জিন্নার প্রধান পরামর্শদাতা নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খান সভাপতি ছিলেন। দিল্লির মুখ্য কমিশনারের অর্থ-উপদেষ্টা জাহিদ হোসেন ছিলেন কোষাধ্যক্ষ। রাজনৈতিক ব্যস্ততার জন্য লিয়াকৎ আলি খান কলেজের বিষয়ে কোনও সময় দিতে পারতেন না। আমলাতান্ত্রিক ব্যবহারের জন্যে জাহিদ হোসেন প্রায়শ ঝামেলা বাধাতেন। কিন্তু, দুজনেই হোসেনকে বিশ্বাস করতেন এবং দেখতেন যে ঘটনার সঠিক বিশ্লেষণ করে তিনি সঠিক উপদেশ দিতেন। বাস্তবে তিনিই কলেজের দায়িত্বে ছিলেন। লিয়াকৎ আলি খান ও জাহিদ হোসেন দুজনেই এই দায়িত্ব নিয়েছিলেন এই ভেবে যে একটি মুসলিম প্রতিষ্ঠান হিসাবে এর দায়িত্ব মুসলিম লিগের। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন হোসেন সার মরিস গাওয়ারের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। 1947 সালের দাঙ্গায় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত নথিপত্র নষ্ট হয়ে যায়। যার জন্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিতে তাঁর অবদানের কোনও প্রামাণ্য নথি পাওয়া যায়নি। তবে কার্যকরী অধ্যক্ষ কে এ চিস্তি তাঁকে যথেষ্ঠ নিপীড়ন করেছিলেন। চাকরির ভবিষ্যৎ নিয়ে চিস্তি চিন্তিত ছিলেন এবং ধারাবাহিকভাবে হোসেনের সাহায্যের জন্যে দরবার করতেন। দেখে মনে হতো, প্রশাসন নিয়ে তার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। আমি মনে করতে পারি এমন কয়েকটি দিনের কথা, যখন তিনি হোসেনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে তাঁর জামিয়া প্রাঙ্গণের বাড়িতে এসেছেন সকাল দশটায়, আলোচনা করেন মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় পর্যন্ত, ভোজনের পর আর চা-পর্ব পর্যন্ত, চায়ের পর আবার রাতের খাবার পর্যন্ত, রাতের খাবার পর দিল্লি যাবার শেষ বাস পর্যন্ত; এবং তারপর মধ্যরাত পর্যন্ত। চিস্তি জোরে কথা বলতেন, আমার বাড়ির ছাদ থেকে আমি সব শুনতে পেতাম। দেখতাম, হোসেন ধৈর্য সহকারে তার বক্তব্য শুনছেন। সময় নষ্ট করার জন্যে আমি অস্থির হয়ে উঠতাম, কিন্তু আমার বিশেষ কিছুই করার থাকত না। বিবেক চিস্তিকে বিব্রত করত না। তিনি গাড়ি ভর্তি করে জ্বালানি কাঠ নিতেন, কেননা, তখন জ্বালানি কাঠ দুস্প্রাপ্য ছিল।

সংখ্যাগুরু সুন্নি এবং সংখ্যালঘু সিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল। অমুসলিমরা এ বিষয়ে জানত যখন তাদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধল। নিজেদের

---

4 সহযোগিতা সব সময় পাওয়া যায় না। উত্তরপ্রদেশের শিক্ষা অধিকর্তার বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু ধারণা ছিল। তিনি হিন্দুস্তানি তালিমি সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে এলাহাবাদে করার কথা ভেবেছিলেন। এ খবর শুনে গান্ধিজি হোসেনকে তারযোগে অনুরোধ করেন ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। হোসেন তার-মারফৎ জানান, 'যোগাযোগ হয়নি। নাগালের বাইরে।'

ধর্মীয় আনুগত্য থেকে উভয় সম্প্রদায় সর্বদা পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করত। একবার হোসেনের জনৈক বন্ধু অভিযোগ করেন, তিনি সিয়া সম্প্রদায়ের সামনে কোনও বক্তব্য রাখেননি। এই ভূমিকার পর তাঁকে অনুরোধ করেন মুসলিম ইতিহাসের অন্যতম ঘটনা হজরত মহম্মদের নাতি ইমাম হুসেনের শহিদ হওয়া সম্পর্কে বক্তৃতা প্রচার করার জন্যে। জাকির হোসেন রাজি হননি। বন্ধু চাপ দিতে থাকলে তিনি বলেন, 'ঠিক আছে। তবে বক্তৃতাটা লিখতে লিখতে হবে। তুমি তো জানো এ ব্যাপারে আমি ভীষণ বিরূপ।' কয়েকদিন পর একটা খসড়া নিয়ে বন্ধু হাজির। হোসেন পড়লেন কিন্তু একদম পছন্দ করলেন না। শেষে তিনি নিজেই লিখলেন। ভাষণ প্রচারিত হলো, ছাপা হলো, তারপর হাজারে হাজারে বিক্রি হলো। এই বিষয়ে এটি একটি স্মরণীয় বক্তৃতা।[5]

1941 সালে তিনি ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হন। সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের আগ্রা এবং শ্রীনগরের সভায় তিনি ভাষণ দেন। এই ভাষণগুলি ছিল অমূল্য। কিন্তু সভার সংগঠকদের নেতৃত্ব চাওয়ার ইচ্ছা তাঁর ছিল না, বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হোসেন যে নেতৃত্ব দিয়েছেন তা অনুসরণ করার বাসনাও ছিল না। নিজেদের প্রয়োজনে তাঁরা বক্তৃতা দেবার হোসেনকে আমন্ত্রণ জানান, তিনি যদি খুব খারাপ বক্তৃতা দিতেন, তারা তাতেও সন্তুষ্ট থাকত। পরবর্তিকালে বিভিন্ন সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠনের কাজ সমন্বয় করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। এই যুক্ত সভায় সভাপতিত্ব করার জন্যে হোসেনই ছিলেন সর্বজনগ্রাহ্য একমাত্র ব্যক্তি। সাংবাদিকতার ভাষায় এ প্রচেষ্টা ছিল 'রাজনৈতিক চমক'। যখন পরিষ্কার হয় মিত্রশক্তি যুদ্ধ জয় করছে, সে সময় এ প্রচেষ্টা বাতিল করা হয়। হোসেনের সময় ও শক্তি ক্ষয় হয়।

দিল্লি মুসলিম ওয়াকফ আইন অনুযায়ী 1943 সালে সুন্নি মজলিশ-ই-ওয়াকফ পুনর্গঠিত হয়। দিল্লি মুখ্য কমিশনার তাঁকে সদস্য মনোনীত করেন। দরিয়াগঞ্জের হতভাগ্য শিশুদের উন্নতির জন্যে তিনি উদ্যোগ নেন। মজলিশ সহ বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠান অর্থ সাহায্য করে। তিনি বেশ কিছু সুপারিশ করেন। ভাগ্যবিড়ম্বিত অসহায় শিশুদের অবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু প্রস্তাব তিনি দেন। এই শিশুদের জন্য গভীর সহানুভূতি ছিলো তাঁর সব প্রস্তাবে :

'এই প্রতিষ্ঠানকে অনাথ-আশ্রম বলা উচিত হবে না। শিশুনিকেতন নামটি ভাল।

---

5. দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর অধিকাংশ ভাষণ, এমনকী যেগুলি ছাপা হয়েছিল বর্তমানে পাওয়া যায় না। কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক আগা আসরফ আলি, যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সংগ্রহ হোসেন চেয়ে নেন এবং 1947 সালের তাঁর জলন্ধরের ঘটনায় তা খোয়া যায়।

'তারা অনাথ একথা তারা যাতে ভুলতে পারে সেজন্য অধিকর্তাকে সব সময় তাদের সঙ্গে সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যবহার করতে হবে।

'তাদের খাবার ও পোশাক পরিচ্ছদের দিকে সতর্ক নজর রাখতে হবে। খাবার জন্য তাদের পৃষ্ঠপোষকের বাড়িতে পাঠানো উচিত হবে না।[6] অন্যের ফেলে দেওয়া জামাকাপড় তাদের ব্যবহারের জন্যে দেওয়া যাবে না। তাদের জামাকাপড় এমনভাবে তৈরি করা হবে না যাতে তাদের মধ্যে অনাথবোধ জাগে। তারা অনাথ এই অজুহাতে তাদের দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা উচিত নয়। .....'

শিশু নিকেতনের অধিকর্তা মহম্মদ ফারুককে হোসেন মনোনীত করেন। ফারুক ও তার সহকর্মী আবদুস শাকুর উৎসাহ ও উদ্দীপনায় কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অনাথ আশ্রমকে একটি ছাত্রাবাসে পরিণত করেন এবং আশেপাশের বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তি করে দেন। হীনতা ও দৈন্য অনাথ শিশুদের মনে চেপে বসে থাকে। তাদের সেই বোধ থেকে মুক্ত করার জন্যে ছাত্রাবাসকে সুন্দরভাবে সাজানো সহসব কিছু করা হয়। আজও এই শিশু নিকেতন সুন্দর এবং সার্থকভাবে পরিচালিত হয়। অটল আন্তরিকতা আজও বর্তমান। যে কেউ আশা করতে পারেন নিজের সমস্ত স্বপ্ন সার্থক করার জন্যে হোসেন যদি ফারুক ও আবদুস শাকুরের মতো অনেক সহকারী পেতেন।

শিক্ষাগত ব্যাপারে জড়িয়ে থাকার জন্যে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ নেতাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল এবং তিনি তাদের যোগাযোগের মাধ্যমে হতে পারতেন। যেহেতু তিনি রাজনীতিবিদ ছিলেন না, সেজন্যে তাঁর আন্তরিকতা ও শুভেচ্ছা সম্পর্কে শ্রদ্ধা থাকলেও কেউ মনে করতেন না তাঁর দ্বারা কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব। প্রত্যেকে এত স্পর্শকাতর ছিলেন যে হোসেন নিজে থেকে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শুভেচ্ছার বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চাইলে, লোকে তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখত। একবার তিনি ট্রেনে করে যাচ্ছিলেন। সে সময় এক মুসলিম সহযাত্রী নিজের পরিচয় গোপন করে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন। পরে একটা প্রতিবেদন পেশ করে বলেন, হোসেন পাকিস্তান সৃষ্টির সমর্থক। একটি উর্দু সংবাদপত্রে খবরটি প্রকাশিত হয়। গান্ধিজিকে সে কথা বলা হয়। তিনি এতটা বিচলিত হয়ে পড়েন যে, দিল্লিতে রাজকুমারী অমৃত কাউরকে চিঠি লিখে হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে সত্য নির্ধারণ করতে বলেন। হোসেন অবশ্য তাঁকে বলেন যে তিনি পাকিস্তান দাবির বিরোধী এবং তাঁর ভিন্নমত প্রকাশ করার কোনও কারণ নেই। কোনও বিষয়ে অন্ধ বিশ্বাস না থাকার জন্যে গভীর আত্মপ্রত্যয়ী; হয়তো তিনি

---

6. অনাথদের খাওয়ানো মুসলিম ধর্মানুরাগের ঐতিহ্য।

বুঝতে পারতেন না পাকিস্তান দাবির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কোনও সন্দেহ অবিশ্বাস ভয় ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষপূর্ণ পরিবেশে আলোচিত হবে। তর্কের খাতিরে কেউ যদি পাকিস্তান দাবি সমর্থন করে, তবে কেন তিনি জাতীয়তা বিরোধী বলে বিবেচিত হবেন, কেনই বা কেউ তর্কের খাতিরে এ প্রশ্নের বিরোধিতা করলে, তাকে মুসলিমবিরোধী বলা হবে। 'ভালো শিক্ষক' শীর্ষক এক বেতার আলোচনায়[7] দোষী এবং সংশোধনের অতীত শিশুটি সম্পর্কে তিনি যা বলেন তা তাঁর স্বাভাবিক অদম্যপ্রবণতা : 'যখন চারপাশের প্রত্যেকেরই তার সম্পর্কে আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন তখন মাত্র দুজন আশায় বুক বেঁধে ছিলেন, একজন তার মা, অন্যজন তার শিক্ষক!'

হোসেন রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন কিন্তু তাঁর পরিচিতি এত বেশি ছিল যে, অন্তবর্তী সরকারে কংগ্রেস প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর যোগ দেবার বিষয়টি আলোচিত ও পরিত্যক্ত হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে বাস্তবায়ন অসম্ভব, এমন একটি শর্ত তিনি আরোপ করেন, তাঁকে সর্বসম্মত প্রার্থী করতে হবে। তিনি এমন শর্ত দিয়েছিলেন কারণ অন্যথায় তিনি কাজ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। 1945 সালে জামিয়া মিলিয়ার রজতজয়ন্তী পালিত হবে।[8] তিনি কংগ্রেস ও লিগ নেতৃত্বকে এক মঞ্চে আনার জন্যে ওই উপলক্ষ্যকে কাজে লাগাবেন বলে ঠিক করেন। সুন্দর পরিকল্পনা করে তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন। প্রথমে জামিয়া মিলিয়া একটি শিক্ষাসংক্রান্ত প্রদর্শনী শুরু করে যার এক পর্বে হোসেনের সঙ্গে আলোচনায় বুনিয়াদি ব্যবস্থার সার্থকতা সম্পর্কে একজন সন্তুষ্ট হবেই। ফিল্ড মার্শাল আচিনলেচ সহ বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করা হয়। কোনও তাড়া নেই, নেই কোনও প্রচার। প্রদর্শনী সম্পর্কে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যাতে ব্যক্তিগতভাবে মত বিনিময় করতে পারেন, সে ব্যবস্থা ছিল। জাকির হোসেন এরপর নাগালের বাইরের কায়েদ-ই-আজম জিন্নার সঙ্গে দেখা করার জন্যে যোগাযোগ করেন। জিন্না তাঁকে পরিষ্কার বলেন, কংগ্রেস যা কিছু প্রস্তাব করবে বা সমর্থন করবে, তিনি তার বিরোধিতা করবেন, সেজন্যই তিনি বুনিয়াদি শিক্ষার বিরোধিতা করেছেন। আমি জানি না তাঁর কি আলোচনা হয়, তবে কয়েকদিন পর ফতিমা জিন্না এই প্রদর্শনী দেখতে এসেছিলেন। তিনি নিশ্চয় খুব প্রশংসা করেছিলেন, কারণ কয়েকদিন পরে, জিন্না রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানে অংশ নেবার বাসনা জানান।

মাত্র দেড় বছর যুদ্ধ শেষ হয়েছে, উত্তেজনা পাগলামির পর্যায়ে রয়েছে, কলকাতার দাঙ্গা ঘটে গেছে। তার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। সর্বোপরি যে কোনও খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি — এমন একটি পরিস্থিতিতে এই উৎসব পরিকল্পনা যে

---

7 মে 15, 1936 সালের বেতার ভাষণ।

8. পরবর্তিকালে 1946 সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়।

যথেষ্ট দুঃসাহসী পদক্ষেপ; এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন। সারা দেশের প্রায় দু হাজার ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করা হয়। তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এমন একটি এলাকায়, যেখানে বিদ্যুৎ ও জলের সরবরাহ নেই। তবুও একটি গোটা উপনিবেশের পরিকল্পনা করা হয়। রাস্তা তৈরি ও পাইপ বসানোর কাজ জামিয়ার ছাত্র ও কর্মীরাই করেন। রামপুরের মুখ্যমন্ত্রী কর্নেল বি এইচ জায়দির স্ত্রী বেগম কুদসা জায়দি আমন্ত্রিতদের থাকা ও বসার ব্যবস্থার দায়িত্বে ছিলেন 'দল বদল' নামে বিস্ময়কর আকারের একটি তাঁবু সহ অসংখ্য ছোট ছোট তাঁবু রামপুর রাজ্য থেকে আনা হয়, কুয়ো থেকে জল তোলার জন্যে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্যে বেগম জায়দি দুটি জেনারেটর জোগাড় করেন। জনৈক আবদুল্লা আটেওয়ালাকে রসুইখানার দায়িত্ব দেওয়া হয়; একসঙ্গে বহুলোককে খাওয়াবার অভিজ্ঞতা থাকলেও সে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। কাজটি ছিল তার সাধ্যের বাইরে। দুর্ভাগ্যবশত দিল্লিতে ব্যাপক ছুরি মারামারির ঘটনা মহামারীর মতো দেখা দেয়, ঘনঘন সান্ধ্য-আইন জারি করা হয়। জনৈক জামিয়া কর্মীকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে বলা হয়। সে কোনও রকমে খাদ্যশস্য, তরিতরকারি এবং মাংস জোগাড় করে। অন্তবর্তী মন্ত্রিসভার মুসলিম সদস্য আসাফ আলি এই অনুষ্ঠানে যোগ দিলে, তাঁকে হত্যা করবে উগ্র মুসলিম লিগ সমর্থকরা, এমন গুজবে জামিয়ার সকলে খুব উদ্বেগজনক অবস্থায় থাকে। অপ্রীতিকর কিছু না ঘটলেও জহরলাল নেহরু, জিন্না, মৌলানা আজাদ, লিয়াকৎ আলি খান প্রমুখ যে সভায় উপস্থিত থাকবেন, সেই সভার সঠিক রাজনৈতিক আচরণ ও নিরাপত্তার প্রশ্ন নিয়ে দক্ষ আচরণবিধি আধিকারিকের রাতের ঘুম চলে যায়। কিন্তু সব কিছুই নির্বিঘ্নে হয় এবং চার দিনের এই উৎসবে কোনও অনুষ্ঠান বাতিল করতে হয়নি।

হোসেন সর্বত্র সব কিছু নিজেই দেখভাল করেছিলেন। অতিথিদের আপ্যায়ন করা ছিলো তাঁর বিশেষ দায়িত্ব। বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে ভূপালের নবাব জয়ন্তী সভায় সভাপতিত্ব করেন, রামপুরের নবাব প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন। ড. কে এ হামিদ, মৌলবি আবদুল হক, সার আবদুল কাদির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। উপাচার্য হিসাবে হোসেনকে অনেকবার ভাষণ দিতে হয়। সবই ছিল সুন্দর তাৎক্ষণিক বক্তৃতা। জয়ন্তী সভায় হোসেনের লিখিত বক্তব্য তাঁর আগের সমস্ত বক্তৃতার চাইতে ভাল হয়, বোধ করি তাঁর জীবনের সবচেয়ে আবেগতাড়িত, সুলিখিত ভাষণ এটি। তাঁর দুপাশে এমন সব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বসেছিলেন, যাঁদের হাতে সে সময় ভারতীয় জনগণের ভবিষ্যৎ নির্ভর করত। একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে তিনি বক্তব্য রাখেন যিনি জীবনের কুড়ি বছরের বেশি সময় কাজ করেছেন ও ফল ভোগ করেছেন, যিনি নিজের আশু বিপদ দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন সকল প্রকৃত শিক্ষানুরাগীরা আশা আকাঙ্খা স্বপ্ন নষ্ট হয় যাওয়া। তাঁর ভাষণ অনেকের

চোখে জল আনে এবং মানুষ যদি স্বভাবত স্বার্থের বেদিতে নিজের মহত্বকে উৎসর্গ না করতে; তাহলে ভারতের ইতিহাসে গভীর তাৎপর্যবহ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটত। রাজনৈতিক নেতাদের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন :

'আপনারা সকলেই রাজনৈতিক দিগন্তের উজ্জ্বল নক্ষত্র। হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে আপনাদের জন্যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা আছে। আপনাদের উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে শিক্ষাবিদদের মনোকষ্টের যন্ত্রণা আপনাদের জানাতে চাই। পারস্পরিক বিদ্বেষের আগুনে গোটা দেশ আজ জ্বলছে। আমাদের বাগান তৈরি ও পরিচর্যা করার বাসনা আজ পাগলামিতে পরিণত হয়েছে। মহানুভবতা ও মানবিকতা যে মাটিতে জন্মায়, সেই মাটি আজ জ্বলছে। নিষ্পাপ ফুল সেখানে কেমন করে ফুটবে, নিরপেক্ষ-ব্যক্তিত্ব কেমন করে বেড়ে উঠবে? মানুষের নৈতিক প্রকৃতি কেমন করে সাজাব যখন তা জন্তুর চাইতেও অধম হয়ে উঠেছে? বর্বরতা যখন সর্বত্র দখল নিচ্ছে তখন কেমন করে সংস্কৃতি রক্ষা করব, মানুষকে সংস্কৃতি সেবায় উদ্বুদ্ধ করব? হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথিবীতে কেমন করে মানবিক মূল্যবোধকে রক্ষা করব? কথাগুলো আপনাদের রুক্ষ মনে হতে পারে কিন্তু চারপাশের পরিস্থিতি বর্ণনায় কোন শব্দই যথেষ্ট রুক্ষ নয়। আমাদের বৃত্তি আমাদের শেখায় শিশুদের সম্মান করতে, ভালবাসতে। কিন্তু যখন শুনি এই বর্বরতা নিষ্পাপ শিশুকেও রেহাই দেয় না, তখন আমাদের নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা আপনাদের কেমন করে বোঝাব? একজন ভারতীয় কবি বলেছেন, যে প্রতিটি শিশু জন্মাবার সময় ঈশ্বরের বার্তা নিয়ে আসে যে তিনি এখন মানবসমাজের ওপর ভরসা করেন, কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ কী এতই আশাহত যে, সেই নিষ্পাপ ফুলগুলি পাপড়ি মেলার আগেই তাদের ধ্বংস করব? ভগবানের দোহাই, আপনার একত্র হয় মাথা ঠাণ্ডা রেখে এই আগুন নেভান! কে আগুন জ্বালিয়েছে, কেমনভাবে জ্বালিয়েছে, সে বিচার করার সময় এখন নয়। দাবানল ছড়িয়ে পড়ছে, তাকে নেভাতে হবে। এই রাষ্ট্র বা সে রাষ্ট্রের প্রশ্ন নয়, সভ্য মনুষ্য জীবন ও বর্বর পশুত্বের মধ্যে পছন্দের প্রশ্ন। ঈশ্বরের দোহাই, যা এই সুসভ্য দেশটাকে ধ্বংস হতে দেবেন না।'

কোন সম্মেলন বা আলোচনায়, যে কোনও দলের যে কোন নেতার দেওয়া বক্তৃতার পাশাপাশি এই বক্তৃতা বিচার করলেও এর প্রভাব সহজেই বোঝা যাবে। অথবা আমরা যদি মনে রাখি যে এই ভাষণ দেওয়া হয়েছিল যখন কংগ্রেস ও লিগের মধ্যে বোঝাপড়ার সব সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বা কলকাতা-দাঙ্গার পটভূমিতে বম্বে, নোয়াখালি বিহার ও পঞ্জাবে জীবন ও সম্পত্তি ধ্বংসের তাণ্ডব চলছিল, তাহলে এর গুরুত্ব বুঝতে পারব। যুক্তিপূর্ণ সমঝোতায় যারা ন্যায়সঙ্গত ছাড় দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন তাঁরা হতাশায় ভুগছিলেন। শিক্ষাবিদ হিসাবে হোসেন তাঁর শেষ অর্থহীন আবেদন করেন। জামিয়া মিলিয়ার কাজে, সভা

সমিতিতে যোগ দিয়ে তাঁর সময় কাটত। তিনি ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে পড়েছিলেন এবং স্বীকার না করলেও তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বহুমূত্র রোগ তাঁর প্রাণরস নিঃশেষ করছিল। তিনি কোথাও গিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার কথা ভাবছিলেন কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা দিবস ও ঈদ উদ্যাপনের পর তিনি কাশ্মীর যাওয়া মনস্থ করেন। সাম্প্রদায়িক রক্তপাত ইতিমধ্যে পঞ্জাবে শুরু হয়েছে এবং ঘন ঘন ট্রেনে হত্যার খবর দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ হচ্ছিল। এ সব কিছু এবং বন্ধু ও সহকর্মীদের অনুরোধ উপেক্ষা করে 21 অগস্ট দিনের ট্রেনে তিনি যাত্রা করেন। বাচ্চা চাকর মঞ্জুর[9] ছিল সঙ্গে। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলেন। পাশের প্রথম শ্রেণীর বগিতে ছিলেন জলন্ধরের ধনী ফজলে হক ও তাঁর ছেলে। ট্রেন প্রত্যেক স্টেশনে দেরি করছিল। চঞ্চল হোসেন বার বার ট্রেন থেকে নেমে কি হয়েছে খোঁজ করছিলেন। হরবনশলাল কাপুর নামে একজন রেলওয়ে অফিসার তার সহযাত্রী ছিলেন। তিনি হোসেনকে চিনতেন না কিন্তু তাঁকে দেখে প্রসন্ন হয়েছিলেন। একটা স্টেশনে তিনি মঞ্জুরকে তার প্রভুর নাম কি জিজ্ঞেস করেন। হোসেনের নাম শুনে ওই ভদ্রলোকও প্রতি স্টেশনে নেমে তাঁর দিকে নজর রাখছিলেন। লুধিয়ানায় হোসেন স্টেশনমাস্টারের ঘরে যান, পাঠানকোট যাবার অন্য কোন গাড়ি আছে কি না জানতে। সেখানে আর অনেকে ছিলেন যারা তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকান। স্টেশনমাস্টার বলেন, আর কোনও ট্রেন নেই। পার্শ্ববর্তী একজন চেঁচিয়ে বলেন, 'ওকে জলন্ধর যেতে দাও'। তাঁর বগিতে যখন ফিরে এলেন তখন ফজলে হক মদ্যপান করে দাঁড়াবার মতো অবস্থায় নেই। তিনি হোসেনের সঙ্গে জলন্ধর পর্যন্ত এলেন। সেখানে এসে তাঁরা দেখেন স্টেশন জনমানবশূন্য, কয়েকজন গোর্খা সৈন্য প্লাটফর্মে ঘুরছে। ফজলে হক আর যাবেন না, ট্রেন যেহেতু আর নড়ছে না হোসেন মালপত্তর গুছিয়ে নিলেন। ফজলে গাড়ির জন্য ফোন করবেন বলে চলে গেলেন। কিন্তু, বাড়িতে যোগাযোগ করতে পারেননি. তিনি ফিরে আসার আগেই একটি হৃষ্টপুষ্ট লোক কয়েকটি হাফ-প্যান্ট পরা যুবককে নিয়ে হোসেনের মালপত্তর দেখে পঞ্জাবিতে বলে, 'জিনিষপত্রগুলি নিয়ে যাও।' তারা যখন জিনিসগুলি নিতে ব্যস্ত ফজলে ফিরে আসেন এবং যুবকদের সমস্ত জিনিসপত্র রেখে দিতে বলেন। সেই মোটাসোটা লোকটা ফজলকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আদেশ করে, 'জিনিসপত্রগুলি নিয়ে যাও'।' রেগে গিয়ে ফজলে লোকটিকে এক থাপ্পড় কষিয়ে দেন। লোকটি ঘুরে দাঁড়িয়ে গোর্খা সৈন্যদের গুলি করার আদেশ দেয়। তারা হোসেন ও ফজলের দিকে বন্দুক তাক করে। মঞ্জুর ছুটে গিয়ে বন্দুকের সামনে দাঁড়ায়। যে কোনও কারণে, গোর্খারা গুলি করেনি। কিন্তু সবার নজর যখন গোর্খাদের দিকে ছিল মালপত্তর

---

9 এই বিবরণ আমাকে মঞ্জুর দিয়েছিল, সে এখন জামিয়া মিলিয়ায় পিওন।

লোপাট হয়ে যায়। রেলওয়ে আধিকারিক কাপুর ছুটে গিয়ে স্টেশনমাস্টারকে হোসেনের পরিচয় দিয়ে বিপদের কথা জানান। স্টেশনমাস্টার, হোসেন এবং ফজলেকে তাঁর কার্যালয়ে নিয়ে যান। যাবার আগে হোসেন গোর্খা সৈন্যদের জিজ্ঞেস করেন, তারা কি করছিল তারা জানে কি না। যাত্রীদের রক্ষা করা তাদের কর্তব্য তাদের ভয় দেখানো নয়। সৈন্যরা না শোনার ভান করে। স্টেশনমাস্টারের ঘরে দিল্লির কয়েকজন শিখ যুবক ছিল। তারা হোসেনকে চিনতে পেরে তাঁকে নিরাপত্তার কারণে স্টেশনের বাইরে যেতে নিষেধ করে। একথা শুনে স্টেশনমাস্টার যুবকদের ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলেন। এই সময় কাপুর একজন তরুণ শিখ অফিসারের দেখা পান এবং তাকে সব কিছু জানিয়ে সাহায্য করতে বলেন। গুরদয়াল সিং ওই অফিসার এর নাম। তিনি স্টেশনমাস্টারের ঘরে এলেন কাপুরের সঙ্গে। তাকে দেখামাত্র হোসেন কর্তব্যে অবহেলার জন্যে যথেষ্ট তিরস্কার করেন। অবনতমস্তকে সব তিরস্কার সহ্য করে তিনি তাঁদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবার প্রস্তাব করেন। গুরদয়াল গোর্খা সৈন্যদের তত্ত্বাবধানে ওঁদের রেখে জিনিসপত্রের খোঁজে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন। তাঁরা যখন বেরিয়ে আসছেন, সে সময় তাদের চারপাশে লোকের ভিড় জমে যায়। ফজলে হকের পকেট থেকে 300 টাকা তুলে নেওয়া হয়, মঞ্জুরের কলমটি খোয়া যায়। লোকের ভিড় অনেক বেড়ে যায়, আশঙ্কা ছিল হোসেনদের নিয়ে গুরদয়ালের সামরিক ট্রাক বেরোবার রাস্তা পাবে না। গুরদয়াল দুজন সৈন্যকে বন্দুক নিয়ে জনতার দিকে তাক করে থাকতে বলে, নিজে জনতার সঙ্গে কথা বলতে যান। জনতা দাবি জানায় হোসেনদের তাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। অফিসার জানান, ওঁদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেবার কথা দিয়েছেন। তখন জনতা কিছু দূরে নিয়ে গিয়ে ওদের ছেড়ে দেবার কথা বলে; তিনি অস্বীকার করেন, 'আপনি দাড়িওয়ালা লোকটিকে নিয়ে যান। অন্যজন জলন্ধরের মানুষ আপনি তাকে কেন আমাদের হাতে দেবেন না?' জনতা চিৎকার করে জানতে চায়। শেষ পর্যন্ত গুলি করার ভয় দেখিয়ে গুরদয়াল তাঁদের নিয়ে রওনা দেন। সারা রাস্তায় লোকেরা লুঠের মাল নিয়ে যাচ্ছে। স্টেশন থেকে মাইল খানেক দূরে তাঁরা যখন একটা বিরাট বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছেন সে সময় ফজলে হক গাড়ি থামাবার কথা বলেন। বাড়িটা তার বিশেষ পরিচিত বিচারপতি বেদির। গাড়ি থামল। গুরদয়াল হোসেনদের নামতে নিষেধ করে, বাড়িটি বিচারপতি বেদির কিনা এবং তিনি বাড়ি আছেন কিনা খোঁজ নিতে গেলেন। শীঘ্রই বিচারপতি বেদি খালি পায়ে ছুটে এলেন এবং হোসেন ও ফজলে হককে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেলেন। আশ্বস্ত হয়ে গুরদয়াল ফিরে গেলেন।

হোসেন দ্রুত ফিরে গিয়ে জলন্ধরের অবস্থা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী ও সর্দার পটেলকে অভিযোগ জানাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সে রাতটা বেদির বাড়িতে

থেকে পরের দিন দিল্লি ফেরার জন্য তৈরি হন। বিচারপতি বেদিও মঞ্জুর তাঁকে বোঝান, বিমানে যেতে অথবা ট্রেন যাত্রা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত, অপেক্ষা করতে। তিনি কোনও কথা শুনবেন না। শেষ পর্যন্ত বিচারপতি বেদি সশস্ত্র পাহারায় তাঁকে জলন্ধর ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে তুলে দিয়ে আসতে বাধ্য হন। লুধিয়ানায় ট্রেন ছ ঘণ্টা অপেক্ষা করে। হোসেন ছটফট করছিলেন। মঞ্জুরের অনুরোধে তিনি জানলার ধার ছেড়ে ভিতরে এসে বসেন। কিন্তু তারপর চঞ্চল হয়ে প্লাটফর্মে নেমে পড়েন। মঞ্জুর সেই হৃষ্টপুষ্ট লোকটিকে স্বেচ্ছাসেবকসহ দেখতে পায়। বোঝা যায়, তারা মুসলিম যাত্রীদের শনাক্ত করতে এসেছে যাতে জলন্ধরে তাদের শেষ করতে পারে। কিন্তু স্থানীয় মুসলিম, যারা হোসেনকে চিনতে পারেন, তাঁরা তাঁকে তাদের সঙ্গে লুধিয়ানায় থাকার অনুরোধ করেন। হঠাৎ একজন কৃষ্ণাঙ্গ যুবক হোসেনের পায়ে পড়ে। হোসেন তাকে তুলে জিজ্ঞেস করে, সে কে। তরুণ বলে, সে লাহোর থেকে আসা উদ্বাস্তু। তার বাবা জামিয়ার ছাত্র ছিল। সে এখন নিঃস্ব কিন্তু হোসেনের সেবা করতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে। শীঘ্রই সেই শিখ যুবকরা যারা স্টেশনমাস্টারের ঘরে ছিল, তারা হোসেনকে দেখতে পায়, এবং তাঁর রক্ষী হিসাবে কাজ করে। তারা তাঁর সঙ্গে অম্বালা পর্যন্ত ছিল। তখন পর্যন্ত আম্বালার পরে আর বিপদ ছিল না।

ভোর তিনটের সময় হোসেন দিল্লি পৌঁছন। গাড়ির জন্যে মঞ্জুরকে জামিয়ায় ফোন করতে দেননি, কারণ তাতে অহেতুক দুঃশ্চিন্তা বাড়বে। তিনি বিশ্রাম কক্ষে যান বসবার জায়গা পাবেন ভেবে। সমস্ত জায়গা ভর্তি। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটি তাকে বিছানা পেতে বসতে বলেন। কিন্তু তাঁর কাছে বিছানা ছিল না। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, সস্তায় থাকার জায়গা পাওয়া যাবে কিনা। লোকটি একটি হোটেলের নাম করল। হোসেন সেখানে গেলেন এবং আলোবাতাসহীন একটি কামরা পেলেন। তিনি মঞ্জুরকে ছাদে জায়গা আছে কি না খোঁজ করতে বলেন। মঞ্জুর জানাল, শুধু জায়গা নয় ছাদে একটা খাটও আছে। দুজনে মিলে ছাদে গিয়ে দেখেন সেখানে ছাগল ভর্তি। মঞ্জুর ছাগলদের একদিকে সরিয়ে দিলে, হোসেন খাটে শুয়ে পড়েন। তিনি প্রথম বাস ধরে ওকলায় হাজির হন। যাতে কেউ দেখতে না পায়, সেজন্য মাঠের মধ্য দিয়ে বাড়ি যান।

সেদিন বা তার পরের দিন তিনি প্রধানমন্ত্রী ও সর্দার পটেলের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ঘটনা জানান। এই খবর তাদের কাছে সত্য উদ্‌ঘাটন করল এবং তাঁরা যথেষ্ট দুঃখ পেলেন। পরের দিন বিমানে প্রধানমন্ত্রী জলন্ধর গেলেন। তাঁর এই পরিদর্শনের ফলে কতবড় বিপদ এড়ানো গিয়েছিল, তা পরে জানা যায়। হানাহানি দুঃখ কষ্ট এত বেশি ছিল যে, কোনও একটি ঘটনার চিরন্তন ছাপ ফেলা সম্ভব ছিল না। দাঙ্গা দিল্লির দিকে এগিয়ে আসছে, সঙ্গে আনছে মানবিক অবক্ষয়। কোনওভাবেই তাকে থামানো, এমনকী কমিয়ে দেওয়া যাবে না।

বিশ্রামের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে হোসেন আমার বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন। সে-সময় আমি লক্ষ্ণৌতে। পিছনের দরজা দিয়ে মঞ্জুর তাঁর খাবার নিয়ে আসত। অনেকেই তাঁর খোঁজ করছিলেন কিন্তু কেউ তাঁর হদিশ পাননি। ততদিনে দিল্লিতে দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। গ্রামবাসীরা এ কাজ করেনি। কিছু বহিরাগত ব্যক্তি এই কাজ করেছিল। মুসলিম প্রতিবেশীদের সাহায্যে এগিয়ে আসলে, এদের হাতে হিন্দু গ্রামবাসীরাও আক্রান্ত হতো। শাফিকুর রহমান, যার সমাজশিক্ষার ক্ষুদ্র সংগঠন কেরলবাগে ভাল কাজ করছিল, এবং জামিয়ার প্রকাশনা বিভাগের প্রধান হামিদ আলি খান অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে যান। এই সব খবর হোসেনকে নির্জনতা ভেঙে বেড়িয়ে আসতে বাধ্য করে। কাজে নেমে, তাঁর সব হতাশা ও অলসতা দূর হয়ে যায়। ছোট জামিয়া সম্প্রদায়কে তিনি উদ্বুদ্ধ করেন। নারী ও শিশুদের রক্ষা করার জন্যে তাদের সংগঠিত করেন। গ্রাম থেকে চলে আসা মুসলিম উদ্বাস্তুদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। পুরোনো কেল্লা ও হুমায়ুনের সমাধিক্ষেত্রে শিবির খোলা হয়। মূলত হোসেনের জন্যে স্বাধীন ভারত সরকার ও দিল্লি প্রশাসন জামিয়া মিলিয়া ওকলার ওপর নজর রেখেছিল। একদিন গভীর রাতে ডেপুটী কমিশনার এম এম রানওধায়া অবস্থা পর্যবেক্ষণে আসেন। তিনি এক ডজন বন্দুক ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে যান। আর একদিন গভীর রাতে প্রধানমন্ত্রী আসেন। সমস্ত ব্যবস্থা খুঁটিয়ে দেখেন এবং পরের দিন সকাল পর্যন্ত থাকেন। সেনাধ্যক্ষ জেনারেল কারিয়াপ্পা মাদ্রাজ রেজিমেন্টের বেশ কিছু পদাতিক সৈন্যকে ওকলা স্টেশনের দায়িত্ব দেন। তারা জামিয়া উপনিবেশের দিকে নজর রাখত। দিল্লি স্টেশনে নেমে মহাত্মা গান্ধি প্রথম প্রশ্ন করেন : 'জাকির হোসেন নিরাপদ আছেন? জামিয়া মিলিয়া অক্ষত আছে?' পরের দিন তিনি নিজে জামিয়ায় আসেন। পরে এই অন্ধকার দিনগুলোর কথা বলতে গিয়ে হোসেন গান্ধিজির পরিদর্শন সম্পর্কে বলেন :

'গাড়ির দরজায় তাঁর হাতের আঙুল থেতলে গিয়েছিল, তাঁর অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি হাসছিলেন, আমাদের হাসতে প্ররোচিত করছিলেন। তিনি আমাদের মধ্যে সাহস সঞ্চারিত করেছিলেন। তাঁর চরিত্রের সমস্ত দৃঢ়তা দিয়ে আমাদের এখানে থাকার উপদেশ দিয়েছিলেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চত্বরে তিনি মুসলিম উদ্বাস্তুদের সঙ্গে আলোচনা করেন। একটি অনাথ শিশুকে কোলে তুলে, আদর করে চুমু খান। যাবার সময় বলেন, আমাদের নিরাপত্তার জন্য করণীয় সব কিছু তিনি করবেন অথবা সেই চেষ্টায় নিজে শেষ হয়ে যাবেন। এটাই ছিল জামিয়ায় বাপুজির শেষ আসা।'

'দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ঈশ্বরের আশীর্বাদে বছরের পর বছর উন্নতশির'!

নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়েই হোসেন শহরে যাতায়াত শুরু করেন। তিনি উদ্ধার, অপসরণ ও নিরাপত্তা কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন। অবসরপ্রাপ্ত বাস্তুকার

এম এ আবাসির বাড়ি ছিল প্রধান কার্যালয়। আধা-সরকারি একটি কমিটি সেখানে নিয়মিত সভা করত এবং যখন যে সমস্যা দেখা দিত, তার সমাধান করত। শামসুর রহমান মহশিনি, অধ্যাপক মহম্মদ আকিল, আখতার হোসেন ফারুকি, আব্দুর রজ্জাক প্রভৃতি জামিয়ার কর্মীরা হুমায়ুন সমাধিক্ষেত্রের উদ্বাস্তুদের থাকা খাওয়ার তদারকি করতেন। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে হোসেন ও আবাসি, অপসৃত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক জে এম লোবো-প্রভুর মুসলিম, উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন। অন্য উপদেষ্টারা ছিলেন শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনি, সার শোভা সিং ও রঘুনন্দন শরন। দিল্লির উদ্বাস্তু মুসলিমদের হাতে সম্পত্তি তুলে দেওয়া, এদেশে আগত উদ্বাস্তুরা যাতে মুসলিম সম্পত্তি দখল করতে না পারে তা দেখা, এবং শরণার্থীদের মধ্যে জমিবণ্টনেব মতো দুরূহ এবং বিপজ্জনক কাজের দায়িত্ব পড়েছিল প্রভু ও তাঁর উপদেষ্টাদের ওপর। বাড়ির সংখ্যা ছিল 5000 আর আবেদন করেছিলো 50000 জন; যাদের অধিকাংশই মরিয়া এবং যুক্তির ধার ধারে না। তত্ত্বাবধায়ক অফিসের কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল উদ্বাস্তুদের মধ্য থেকে। এবং উপদেষ্টাদের মধ্যে প্রায়শ মতপার্থক্য দেখা যেত। তত্ত্বাবধায়ক অফিস লাগাতার অবরোধ করা হতো। আমি যখন তার সাক্ষাৎকার নিই, সেই সময় প্রভু আমাকে বলেন, যে একজন শিখ উদ্বাস্তু একটি বাড়ি অন্যায়ভাবে দখল করেছিল। তাকে সেখান থেকে উৎখাত করা হলে সে কৃপাণ নিয়ে কমিটি-রুমে ঢুকে তাঁকে মারতে চেয়েছিল। হোসেন এবং সার শোভা সিং অনেক কষ্টে তাকে নিরস্ত করেন। হোসেনেব নিরপেক্ষতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রভু 10 কার্জন রোডের বাড়ির মালিকের কথা উল্লেখ করেন। এই ভদ্রলোক পাকিস্তান চলে গিয়ে পরে আবার ফিরে আসেন। হোসেন তাকে স্থানত্যাগকারী বলে ঘোষণা করেন। সার দত্তার সিং ও লিয়াকৎ আলি খান সম্পত্তি বিনিময়ের জন্য একটি ব্যক্তিগত চুক্তি করেন। এই বিনিময়, দেশের প্রচলিত আইনে অনুমোদনযোগ্য ছিল না, সেজন্যে প্রভু হোসেনের পূর্ণ সমর্থন পান, তখন এবং পরবর্তিকালে যখন তদন্ত অনুচিতও তখন।

উদ্বাস্তু ও মুসলিমরা যাতে সমস্ত বিদ্বেষ ভুলে শান্তিপূর্ণভাবে বন্ধুর মতো, ভাইয়ের মতো পাশাপাশি বাস করতে পারে, সেই অবস্থা তৈরি করা আগামী দিনের জরুরি কাজ। সেপ্টেম্বর মাসে বেতার আলোচনায় তাঁর বক্তব্যের সার কথা ছিল এটাই। দিল্লির অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়, প্রতিবেশীসুলভ সম[illegible] সম্পর্ক অস্বীকার করা হচ্ছে।

'হ্যাঁ, আপনারা বলতেই পারেন মানুষ শুধু প্রকৃতির একটি অংশই নয়। সে পাথর জন্তু গাছপালা নয়, প্রকৃতি তাকে যেমন তৈরি করেছে সে তেমন ভাবে থাকে না। মানুষ মানুষই; তার পৃথিবী সে নিজে সৃষ্টি করে, ধ্বংস করে। কথাটা সত্যি সে; জন্যেই আমি আপনাদের বন্ধু বলে ডাকছি। শুধুমাত্র এই দেশে জন্মাবার জন্যে

প্রকৃতি আমাদের ভাই করেনি। যুগ-যুগ ধরে স্বেচ্ছায় আমরা একসঙ্গে বসবাস করেছি, একে অন্যের আনন্দের বখরা নিয়েছি, অন্যের দুঃখে কষ্ট পেয়েছি, একে অন্যের প্রতি অমায়িক ছিলাম, অন্যের ভুলকে ক্ষমা করেছি, একে অন্যের ভাল দিকটা দেখেছি, একসঙ্গে পড়েছি শিখেছি, পরস্পরের ত্রুটি সংশোধন করেছি। আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছি, অন্যকে বুঝেছি, ভালবেসেছি, আনুগত্যের বাধ্যতা পূরণ করেছি। একে অপরের হৃদয়ে জায়গা পেয়েছি। সম্পর্কের অগ্নিশিখায় দাসত্বের রাত কাটিয়েছি। আজ যখন আকাশে স্বাধীনতার সূর্য তখন আমাদের হৃদয় কেন আলাদা হয়ে যাচ্ছে, কেন আমরা অন্যকে চিনতে অস্বীকার করছি? বন্ধুগণ! বন্ধুত্বের নিয়ম মেনে চলুন, বন্ধুকে শত্রু বলে ভাববেন না। শতাব্দী লালিত বন্ধুত্বকে মুহূর্তের উন্মাদনায় ছিন্নমূল করে দেবেন না। যারা পাগল হয়ে গেছে, তাদের সুস্থ করার জন্যে কি করতে পারেন; ভেবে দেখুন। তারাও আপনার ভাই, তারাও আপনার বন্ধু হতে পারে। বন্ধুত্বের জন্যে জামিন বা আনুগত্য দাবি করবেন না, যেমন শত্রুর কাছে চাওয়া হয়। বন্ধুত্বের মাধ্যমেই আনুগত্যের ভিত দৃঢ় হয়। সন্দেহ অবিশ্বাস ঘৃণার মাটিতে বন্ধুত্বের চারা বাঁচে না। স্নেহপরায়ণ ও বিশ্বাসী হোন। মানুষের প্রকৃতির ওপর আস্থা রাখুন তবেই দেখতে পারেন ওই চারার ফুলও সুগন্ধে ভরে যায়, কেমনভাবে চারপাশের মলিনতা সেই ফুলের উজ্জ্বল রঙের সৌন্দর্যে হারিয়ে যায়। ভাইসব! বন্ধুত্বের চর্চা করুন, নিয়ম মেনে চলুন, চাহিদা মেটান এবং অন্যকে মেটাতে অনুরোধ করুন।'

কাজ শুরু করা সম্ভব হতেই জামিয়ার দরজা উদ্বাস্তু শিশুদের জন্যে খুলে যায়। সফিকুর রহমান ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করছিলেন এবং সেই মুহূর্তের অপেক্ষায় বসেছিলেন যখন বোঝাপড়ার কাজে সামান্য সাড়া পাওয়া যাবে। 10 জানুয়ারি 1948 উদ্বাস্তু শিশুদের এবং প্রতিবেশী বড়া হিন্দুরাওয়ের বাবা-মায়েদের আমন্ত্রণ করা হয় মুসলিম শিশু ও অভিভাবকদের সঙ্গে একত্রে ফল ও মিষ্টি খাওয়ার জন্যে। স্থানীয় সমাজকেন্দ্র বর্তমানে যেখানে শফিক স্মৃতি বিদ্যালয় অবস্থিত সেখানে এই সুন্দর অনুষ্ঠানটি হয়। 13 জানুয়ারি হোসেন গান্ধিজির উদ্দেশ্যে একটি বিবৃতি দেন তাঁর অনশন সম্পর্কে :

'আমাদের কোনও সন্দেহ নেই আপনি উন্নত প্রজ্ঞা দ্বারা চালিত। আমরা মনে করি জনগণের চিত্ত সংশোধনের ডাক অত্যন্ত সময়োচিত। ঈশ্বর আপনাকে যে শক্তি ও বিশ্বাস দিয়েছেন তা ব্যর্থ হয় না, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নষ্ট হয় না। ঈশ্বর আপনার সঙ্গে আছেন; আপনি অবশ্যই সফল হবেন। আমরা লজ্জিত স্বাধীন ভারত আপনাকে বিদ্বেষ ও দুঃখ ছাড়া কিছুই দেয়নি। স্বাধীনতার উচ্চতম পর্যায়ের যে স্বপ্ন আপনি দেখেন, আমাদের অন্ধত্ব ও অপরাধ সত্ত্বেও যে কাজের উপযুক্ত বলে আজও আমাদের মনে করেন; সেই কাজ বাস্তবায়িত করার জন্যে আপনার নেতৃত্ব

থেকে ঈশ্বর যেন বঞ্চিত না করেন। আমাদের অন্তরের শ্রেষ্ঠত্ব একদিন অবশ্যই নিজেকে দৃঢ়রূপে প্রমাণ করবে, আপনার এই গভীর আস্থাই আমাদের বদলাতে পারে।[10]

গান্ধিজির অনশনের পর উত্তেজনা অবশ্যই কমতে শুরু করে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের রাক্ষসকে তাঁর জীবন উৎসর্গ না করে শান্ত করা যায়নি।

1948 সালের 30 অক্টোবর জামিয়ার সংসদের সভায় হোসেন তাঁর প্রতিবেদন শেষ করেন উপাচার্য পদে তাঁকে পুনরায় নির্বাচিত না করার অনুরোধ জানিয়ে।

'রজতজয়ন্তীর পর জামিয়ার নতুন বিভাগ খোলার জন্যে কোনও কাজ হয়নি। দায়িত্ব যেহেতু আমার, তাই আমি অপরাধ স্বীকার করছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে কর্মী স্বল্পতা ও জায়গার অভাবে নতুন বিভাগ খোলা সম্ভব নয়। কর্মী প্রসঙ্গে বলা যায়, নিজের ক্ষতি করে কোনও মহৎ কাজের ইচ্ছা যদি তাদের থাকেও, তবু বর্তমান বেতন হারে একজন শিক্ষিত কর্মীকে নিয়োগ করা খুবই কষ্টকর। দ্বিতীয়ত, আমার মনে হয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন সদস্য আনার ক্ষেত্রে আমরা ব্যর্থ। কারণ হয়তো অতীতের ত্যাগ সম্পর্কে আমাদের নিঃসংশয়তা অথবা এই প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সঠিক চিন্তা করার অক্ষমতা ....

'সরকারের কাছে কিছু চাওয়ার প্রশ্নে স্বাভাবিকভাবে আমি খুবই অনিচ্ছুক। পঁচিশ বছরের অভ্যাস এর কারণ। কিন্তু যখন দেখলাম কর্মীদের বেতনবৃদ্ধির জন্যে সরকারের কাছে সাহায্য চাইতে আমার সহকর্মীরা আগ্রহী এবং সরকারের কিছু দায়িত্বশীল অফিসার এমন অনুরোধ রাখতে সম্মত; আমি মৌলানা আজাদের সঙ্গে কথা বলে শিক্ষা দপ্তরে চিঠি দিই ... কিন্তু এক বছর অতিক্রান্ত, কিছুই করা হয়নি। সম্ভবত এমন ভাবেই সরকারি কাজ হয়; হয়তো বা আমার কোনও প্রভাব না থাকাই এর কারণ অথবা এই বিষয়ে লেগে থাকায় আমার গাফিলতি।

'পরিশেষে একটা ব্যক্তিগত অনুরোধ পেশ করার অনুমতি চাইছি আমার। ক্ষমতা খুবই সীমিত। জামিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমার তরুণ সহকর্মীরা যে উচ্চাশা সযত্নে লালন করে তা পূরণ করতে আমার ক্ষমতা যথেষ্ট নয়। তাছাড়া পরিস্থিতির চাপে অন্য অনেক কাজে আমি জড়িয়ে পরেছি এবং বিশেষ কিছু কারণে সেই কাজ আমি চালিয়ে যেতে চাই। এতদিন পর্যন্ত আমার একটা ভুল ধারণা ছিল যে, বাইরে আমি যে কাজই করি না কেন তার দ্বারা পরোক্ষে জামিয়া উপকৃত হয়। হয়তো, এজন্যেই জামিয়ার কাজে আমি কম সময় দিতাম। এর একটা ভাল দিক, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জামিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছেদ হলে যারা দায়িত্ব নিতে আগ্রহী তারা নিজেদের তৈরি করতে পারত। কিন্তু আমার বিশ্বাস তা হচ্ছে না পরন্তু

---

10. প্যারেলাল, 'মহাত্মা গান্ধি — শেষ পর্ব'। দ্বিতীয় খণ্ড। 1958 সংস্করণ, পৃ 712

আমার বাইরের ব্যস্ততা অসন্তুষ্টি ও বিক্ষোভ তৈরি করছে। গঠনমূলক চিন্তার পথ করতে একথা আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই ...'

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি জামিয়ার প্রাচীনপন্থীরা সকল নবাগতদের শত্রু মনে করত এবং নতুন রক্ত সঞ্চারণ ব্যতীত জামিয়ার কাজের উন্নতি বা সম্প্রসারণ সম্ভব ছিল না। এই নতুন রক্ত আনবার জন্যে অর্থের প্রয়োজন ছিল। সেই সব অনুদানের দরখাস্ত আমি করি, লিখিত তাগাদা দিয়ে অথবা ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে আরব্ধ আলোচনা আমিই করি, সেই সুবাদে এ কথা বলতে পারি যে উপাচার্য পদে হোসেনের থাকার জন্যে ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের আচরণে কোনও পার্থক্য হয়নি, যদিও মৌলানা আজাদ ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। স্বাধীনতার ছ বছর পরে, প্রধানমন্ত্রীর কাছে দুবার দরবার করার পর শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার জামিয়াকে আর্থিক অনুদান দেয় যার ফলে কিছুটা আর্থিক নিরাপত্তা এসেছিল। কারণ খুব সহজ। এ সমস্ত বিষয়ে সরকার কোনও কাজ করে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে করতে না বলা হয়, এবং প্রচলিত আইনে কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ নিতে অপারগ হলে উচ্চতর অথবা উচ্চতম কর্তৃপক্ষকে জানাতে হয়। 1954-55 সাল থেকে জামিয়া যে অনুদান পাচ্ছে, তা 1948-49 সালেই পেতে পারত যদি হোসেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে দরবার করতেন। তিনি 1946 সালে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যান এবং রজতজয়ন্তীর জন্য মোটা টাকার অনুদান নিয়ে আসেন। কিন্তু 1948 সালে এমন করতে তিনি আর ইচ্ছুক ছিলেন না।

এতে অবাক হবার কিছু নেই। 1948 সালে হোসেন মৌলানা আজাদ ও রফি আহমেদ কিদোয়াইয়ের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভারতীয় মুসলিম বলে পরিচিত ছিলেন এবং দেশের শাসকদের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। জাতীয় সরকারের অসংখ্য দায়িত্ব ছিল, প্রয়োজন ছিল সমস্ত মানবসম্পদকে বুদ্ধিমানের মতো সার্থকভাবে প্রয়োগ করার। জনগণের নেতা হবার সমস্ত গুণ এবং সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার আদর্শে অনেক উচ্চস্তরের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে কোন, কিছুর জন্যে যথেষ্ট ভাল বলে মনে হতো না। কোথাও কিছু ভুল ছিল, প্রকৃত যোগ্যর প্রতি দৃষ্টিহীনতা, কিছু মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত অথবা কাকুতি-মিনতির কাছে দুর্বল আত্মসমর্পণ, অথবা ব্যক্তিনির্বাচনে চাপ সৃষ্টি অথবা তাঁকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে বা ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে কারও ইচ্ছাকৃত চেষ্টা।

পুরাতন ব্যবস্থা নতুন ভাবনা

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদে কে প্রথম হোসেনের নাম সুপারিশ করেছিলেন তা জানা নেই। তাঁর নিয়োগ অবশ্যই যোগ্যতম। হোসেন নিজে আমাকে বলেছিলেন যে তাঁকে রাজি হতে হয়েছিল কারণ বিকল্পে যে বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম ছিল, তিনি দৃষ্টি এবং শ্রবণশক্তিহীন। তাঁর মেধাও খুব আকর্ষণীয় ছিল না। সরাসরি কোনও প্রশ্নের জবাবে নয়, পরিহাস ছলে তিনি একথা বলেছিলেন। সন্দেহ নেই, এ বিষয়ে তাঁর মতামত চাওয়া হয়েছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংসদ তাঁকে সর্বসম্মতভাবে নির্বাচন করবে, এই শর্তে সরকারি প্রার্থী হতে তিনি রাজি ছিলেন না। 1948 সালের 28 নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় সংসদ এক সভায় মিলিত হয়। অস্থায়ী উপাচার্য নবাব মহম্মদ ইসমাইল খান ওই সভায় পদত্যাগ করে হোসেনের নাম প্রস্তাব করেন। সংসদ পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে এবং হোসেনকে সর্বসম্মতভাবে উপাচার্য পদে নিয়োগ করে। দুদিন পরে তিনি দায়িত্ব বুঝে নেন। 29 নভেম্বর 1951, তিনি সংশোধিত আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আইন 1951 অনুযায়ী ছ বছরের জন্যে পুনর্নির্বাচিত হন।

উপাচার্য থাকাকালীন তিনি অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করেছেন। 1948 সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হন। অগস্ট 1949 সালে প্রতিবেদন পেশ করা পর্যন্ত তিনি এই কমিশনের সদস্য ছিলেন। 1952 সালের 3 এপ্রিল তিনি রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন। অক্টোবর 1952 থেকে জুলাই 1954 পর্যন্ত তিনি প্রেস কমিশনের সদস্য ছিলেন। যোগ্য হাতে দায়িত্ব দেবার জন্যে সকলে তাঁকেই পছন্দ করতেন। যে কোনও কাজে সাফল্যের জন্যে মনের একমুখীনতার প্রয়োজন। অতিরিক্ত কাজের বোঝা আর যাই হোক কখনওই একমুখীনতাকে সাহায্য করে না। আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থার সঙ্গে তাঁর ভিন্ন স্বাদের সম্পর্ক ছিল, যা অন্য যে কোনও সংস্থার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের চাইতে তৃপ্তিদায়ক ছিল। স্বাধীনতা ও দেশভাগের পরে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থার ভূমিকা, হোসেনকে এই সংস্থার কাজে আকৃষ্ট করে তোলে। উন্নতশীল এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রয়োজনের দিকে নজর দিয়ে সাংগঠনিকভাবে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থা সম্প্রীতি শান্তি ও আন্তর্জাতিকতাবাদের বাতাবরণ তৈরি করতে পেরেছিল। ম্যালকম ও এলিজাবেথ এডিসেশিয়ার[1] নেতৃত্বে ভারতে এই সংস্থা কাজ শুরু করে। মাদ্রাজে প্রধান কার্যালয় ছিল। 1950-এ হোসেন এই সংস্থার সভাপতি হন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের করিৎকর্মা ছাত্রনেতা বীরেন্দ্র আগরওয়াল সম্পাদক হন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সংস্থার শাখা খোলা হয়েছিল। ছাত্রস্বার্থে বেশ কিছু প্রকল্প এই সংস্থা বাস্তাবায়িত করে। আন্তর্জাতিক চেতনা গড়ে তুলতে ভারত সহ বিভিন্ন দেশে আলোচনা-চক্র সংগঠিত করা হয়। হোসেন ভারতের প্রতিনিধিরূপে তিনবার ইয়োরোপ যান। 1956 সনে হেলিসিংকি সম্মেলনে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমর্থন পেয়েছিলেন। বিহারের রাজ্যপাল নিযুক্ত হবার পর 1957 সালে তিনি সভাপতির পদ ত্যাগ করেন।

1949 তিনি মারাত্মকভাবে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে তাঁর কয়েকটি ভাষণ তৈরি করার ছিল এবং স্বভাবমতো তিনি শেষ মুহূর্তের জন্য তা স্থগিত রেখেছিলেন। সাক্ষাৎপ্রার্থীরা যাতে বিরক্ত করতে না পারে, সেজন্যে তিনি অধ্যাপক রশিদ আহমেদ সিদ্দিকির বাড়িতে আত্মগোপন করে লেখা শুরু করেন। সে-সময় তিনি বুকে যন্ত্রণা বোধ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক সময়মতো এসে পড়ায় তাঁর জীবন রক্ষা পায়। সুস্থ হতে প্রায় ছ সপ্তাহ সময় লাগে। প্রায় 5 বছর ধরে তিনি ডায়াবিটিসে ভুগছিলেন। এজন্যে তাঁকে কঠিন বিধিনিষেধ মেনে চলতে হচ্ছিল। নিজের ইচ্ছামতো খেতে বা কাজ করতে পারছিলেন না।

আলিগড়ের উপাচার্য হিসাবে তিনি জামিয়া মিলিয়ার তুলনায় অনেক সুখ ও বৈভবের মধ্যে ছিলেন। বেগম হোসেন সেখানে গরু-মোষের পরিচর্যা করতেন। ওকলাতে তাঁর পোষা ছাগলও ছিল। আমি যখন তাকে প্রথম দেখি তখন আমার মনে হয়েছিল, চারদিকে কাজের লোক পরিবেষ্টিত হয়ে করার মতো কোনও কাজ না পেয়ে তিনি অতৃপ্ত ছিলেন। এছাড়া পরিবারের সকলেই এই পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছিলেন। যদিও প্রথা হিসাবে এখনও প্রচলিত নয়, তবু একসঙ্গে টেবিলে বসে খাওয়াদাওয়া করা নতুন কিছু নয়। জনৈক আমেরিকান সাহেব যখন তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন, সে সময় আধুনিক সরঞ্জামযুক্ত বাথরুম না থাকায় হোসেন খুবই বিব্রত বোধ করতেন। ফলে, শীঘ্রই উপাচার্য আবাস আধুনিক সরঞ্জাম

---

1 ম্যালকম এডিসেশিয়ার পরবর্তিকালে সার জুলিয়ন হাক্সলির আমন্ত্রণে ইউনেসকোতে যোগ দেন। পরে ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল পদে উন্নীত হন। অতুলনীয় প্রতিভা এবং কর্মপ্রতিভার জোরে তিনি দু দশক ধরে এশিয়া আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহে ইউনেসকোর কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

দিয়ে সাজানো হয়েছিল। তাঁর শোয়ার ঘর, অতিথির ঘর দুষ্প্রাপ্য বই জীবাশ্ম নাগফণা দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁর সজাগ আগ্রহ ছিল। তবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন মুসলিম লিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ড. জিয়াউদ্দিন তাঁকে সংসদের সদস্যপদ থেকে বঞ্চিত করেন; তখন এই আগ্রহ কতটা বজায় ছিল্ বলা দুরূহ। ড. জিয়াউদ্দিন যখন বিতাড়িত হন তখন দায়িত্ব নেবার মতো কেউ ছিল না, এমনকী সমস্ত ভুল সংশোধন করার মতো কেউ তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল না। এই বিশ্ববিদ্যালয় কোনওক্রমে দেশভাগের দুঃখময় পরিণতি কাটিয়ে উঠেছিল। শুধু উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র বলে স্বাধীনতার পর আলিগড়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে ঈর্ষা করার কিছু ছিল না। ভারতে মুসলিমদের সর্ববৃহৎ ও প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানরূপে আলিগড় ছিল মুসলিম মর্যাদার প্রতীক। নিজের ভাবমূর্তি ও শিক্ষা বিস্তারের জন্যে যে কোনও ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় সরকার এ ধরনের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতির জন্যে নজর দিতে ও অর্থ বরাদ্দ করতে বাধ্য। কিন্তু আলিগড় যেহেতু একটি অনুভূতির প্রতীক; সেজন্যে কিছু-কিছু বিষয় আগে থেকেই নির্ধারিত হয়। একটা গোটা সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট রাখতে হয় বা অন্যভাবে বললে, একটি সম্প্রদায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। উপাচার্য সহ কর্তৃপক্ষের সাফল্য নির্ভর করে পারস্পরিক সম্প্রীতি কতটা অর্জন করা গেছে তার ওপর। উপাচার্য হন সেই নেতা, যাঁর সরকার ও মুসলিম জনমতের ওপর প্রভাব আছে। সরকার ও বেসরকারি সংস্থার কাছ থেকে কত অনুদান সংগৃহীত হলো, কত বিখ্যাত বিদেশি সমাবর্তন ভাষণ দিতে অথবা সাম্মানিক ডিগ্রি নিতে বিশ্ববিদ্যালয় এলেন, ছাত্রদের জন্যে কত চাকরি এবং সহকর্মীদের উচ্চাশা কতটা পূরণ করতে পারলেন, তার ওপর নির্ভর করে একজন উপাচার্যের সাফল্য। উপাচার্যকে শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রগণ্য হতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে জোয়ার আনার জন্যে, জ্ঞান অর্জনের কেন্দ্র হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধির জন্যে। এজন্যই ড. জিয়াউদ্দিনকে অঙ্কশাস্ত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক রূপে পরিচিত করা হয়। বাস্তবে, বেশ কিছুদিন ধরেই অধ্যাপক এম হাবিবের ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ও যশ নির্ভর করছিল। ড. জিয়াউদ্দিন তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রতিভা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে ঠিক যেমনটি আলিগড় চায়, তেমন উপাচার্য হিসাবে পরিগণিত হন। কিন্তু তিনিও বেশ কিছু শত্রু তৈরি করেছিলেন। তাছাড়া বিরোধীদের মোকাবিলা করার যে পদ্ধতি তিনি নিয়েছিলেন, তার ধার ক্রমশ কমে আসছিল। তাঁর সমর্থকরা যখন তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একাত্ম করে দেখতেন, এবং তাঁকে ভরসা করেই নিজেদের উচ্চাশা পোষণ করতেন, তাঁর বিরোধীরা তখন মনে করতেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঁচাতে গেলে উপাচার্যকে বহিষ্কার করতেই হয়, ফলে, তিন দশক ধরে সংঘাত ও সংঘর্ষ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। জর্জ এলিয়ট, সার

আর্থার কোনান ডয়েল ও মার্ক টোয়েনের মিলিত প্রতিভাই যার বিবরণ দিতে সক্ষম। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের জিজ্ঞাসার যে জবাব পাওয়া যেত, তার সঙ্গে রাশিয়ান কবি তিয়ুজেভ রাশিয়া সম্পর্কে যা লিখেছিলেন, তার তুলনা করা যায় :

মনের খাঁচার রাশিয়াকে বন্দি করা যায় না;
চলতি মানদণ্ডে যায় না তাকে মাপা,
আছে তার যে-সব গুণাবলি
রাশিয়াবাসীর তা জানা।

শিক্ষা দেওয়া বা শিক্ষা নেওয়ার জন্যে যারা বেশ কিছুদিন আলিগড়ে কাটিয়েছেন তাঁরা এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত হবেন। অন্যেরা শুধু অবাক হবেন। হোসেন এই বিশ্বাসীদের মধ্যে একজন। উপাচার্য হিসাবে তাঁর নিয়োগের কথা শুনে সহকর্মীদের অনেকেই কষ্ট পান, ক্ষুব্ধ হন। তাঁরা শুধু নিজেদের কথা, জামিয়ার কথা ভেবেছেন। হোসেন ও জামিয়ার সম্পর্ক চিরস্থায়ী এবং স্বেচ্ছায় এ সম্পর্ক ছেদ করা অসম্ভব এমন একটা ধারণা তাদের ছিল। আমি মনে করি, হোসেন জামিয়াকে তার প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশি দিয়েছেন। প্রয়োজনে তিনি নিজের মতো সিদ্ধান্ত নিতেই পারেন। মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় তত্ত্বে আমি কোনওদিনই বিশ্বাসী নই, তাই ওঁকে সাবধান করে বলেছিলাম, ওখানে গিয়ে তিনি কোনও সহযোগিতা পাবেন না। ভারাক্রান্ত মনে আমার বক্তব্যের বিরোধিতা করে তিনি বলেন, 'ওখানে কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যাবে।' অবশ্য তাঁর কথার মধ্যে কোনও উৎসাহ বা প্রত্যয় সেদিন আমি পাইনি।

প্রতীকী হলেও গুরুত্বহীন কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যেমন শুধু শিক্ষা ও শিক্ষণকেই মানদণ্ড হিসাবে বিচার করা হয়, একজন অবিশ্বাসী আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তাই করবে। তিনি যদি অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হতেন, তাহলেও সহযোগিতা ও কাজের পরিবেশ সম্পর্কে তাঁকে আমি একই উপদেশ দিতাম। যে কোনও কারণেই যাঁরা মুসলিমদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁরা আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে আক্রমণ করতেন নানা অজুহাতে শুধু তার প্রতীকী গুরুত্বের জন্যে, এই সত্য গুরুত্বের সঙ্গে বলা দরকার। ভারতের রাষ্ট্রপতির পৌরহিত্যে 8 ডিসেম্বর 1951 সালে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন সভায় হোসেন 1948 সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে কি পরিস্থিতির মধ্যে তাঁকে কাজ করতে হয়েছিল, তা বলেন :

'1951 সালের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করতে গিয়ে তিন বছর আগের কথা আমার মনে পড়ছে, যখন আমি উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছিলাম। প্রতিষ্ঠানের

পক্ষে দিনগুলি ছিল অস্বস্তিকর, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ছিল দুরূহ। ছাত্র-ছাত্রী ছিল খুবই কম। আশঙ্কা ছিল আরও কমে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় তার সর্বভারতীয় চরিত্র হারাবে। আমার সৌভাগ্য গত তিন বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক, বিশেষ করে শিক্ষক ও ছাত্ররা, সব প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির জন্যে আমাকে সব রকমের সাহায্য করেছেন। গত দুবছরে ছাত্রসংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আবাসিক ব্যবস্থা ও শিক্ষার আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের তুলনায় বর্তমানে এখানে যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী আছে।'

প্রতিবেদন শেষ করতে গিয়ে তিনি বলেন :

'এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম এবং সামর্থ্য সম্পর্কে দু চার কথা বলে আমি এই প্রতিবেদন শেষ করব। বিষয়টি খুবই জরুরি, কেননা গত 28 নভেম্বর উপাচার্য হিসাবে আমার কার্যকাল শেষ হয়েছে এবং মাননীয় অতিথি ইতিমধ্যেই দ্বিতীয়বারের জন্যে আমাকে ওই পদে নিয়োগ করেছেন। সাধারণভাবে আমি মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয় কালো দিনগুলো পিছনে ফেলে আসতে পেরেছে। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের আন্তরিক চেষ্টাতে তা সম্ভব হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্কট মোকাবিলায় ভারত সরকার যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। একটি সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক প্রশ্নে সম্পূর্ণ দরাজ হতে পারে না। নিজের আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই সরকার আমাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সাহায্য করেছেন। আমি মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ্য সভায় এ কথা বলতে চাই, ভারত সরকারের আর্থিক অনুদান ছাড়া এই দুরূহ আর্থিক সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। তিন বছর কাজ করার পর, আমরা যা করতে পেরেছি সে কথা ভেবে আমার মনে এখন সন্তুষ্টি বিরাজ করছে। এজন্য আমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

'আমাদের শিক্ষার ধীরগতি আমাকে অধৈর্য করে তোলে। এই বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্যম্ভাবীভাবে যে এটি কাটাতে পারে বলে আমি মনে করি। ক্ষণস্থায়ী জীবনে বিশ্বাসী একজনের এই অনুভূতি খুবই স্বাভাবিক। ভারতের জাতীয় জীবনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব অসীম। এ প্রত্যয় দৃঢ় না হলে জামিয়া মিলিয়ার চাকরি ছেড়ে এখানে আসতাম না। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজ এখানে করার আছে বলেই আমি উপাচার্যের পদ গ্রহণ করেছিলাম এবং এখনও কাজ করে যাচ্ছি। ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্রের 40 লক্ষ মুসলিম নাগরিকের সমস্যার কূটনৈতিক সমাধান সেই কাজের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আমাদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারাগুলিকে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সুসংহত রূপে গাথার জন্যে অনেক কিছু করার আছে। যে কোনও সূত্র থেকে প্রাপ্ত অতীতের সমস্ত ঐতিহ্যকে এমনভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, যাতে ধর্মের উর্ধ্বে উঠে প্রতিটি ভারতীয় নিজেকে এই অতীত ঐতিহ্যের অংশীদার মনে করতে পারে। মহান দেশের মুসলিম নাগরিকদের

ভারতের জাতীয় জীবনের সুসংহত বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে; এই বোধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। দেশের সেবা করার অর্থ ধর্মবিরোধিতা নয়। অদূরদর্শী এবং দুষ্ট সমালোচকরা এই কাজকে যথেষ্ট কঠিন করে তুলেছে। জাতীয় জীবনে সাম্প্রদায়িক হানাহানির স্মৃতি সংকীর্ণমনা ও অপরিণামদর্শী ব্যক্তিদের এ জাতীয় অনভিপ্রেত, অসহযোগিতামূলক মিথ্যাচারে সাহায্য করে। সাধারণভাবে ভারতীয় নাগরিক, সংবাদমাধ্যম এবং ওয়াকিবহাল নয়, এমন রাজনীতিবিদরা আমাদের সম্পর্কে যে কোনও খারাপ কথা সহজেই বিশ্বাস করেন। এই ব্যাগ্রতা কেন তা আমি বুঝি। কিন্তু ক্ষতিকারক এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে একজন অনুগত মুসলিম নিজ দেশে পরবাসীবোধে না আক্রান্ত হয়, তার জন্যে আমি অবশ্যই সব কিছু করব। এর ফলে অবশ করে দেওয়ার মতো হতাশা ও নৈরাশ্য জন্ম নেয়। মুসলমানদের পক্ষে বা আমাদের দেশের পক্ষে এ অবস্থা ভাল নয়। দেশকে গড়ে তোলা এবং জাতীয় অস্তিত্বের স্বার্থে দেশের সমগ্র মানবসম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার করা উচিত। আলিগড়ের ভাবনা, আলিগড়ের কাজ, ভারতের জাতীয় জীবনে আলিগড়ের অবদান, জাতীয় জীবনে মুসলমানরা কী ভূমিকা নেবে, তা নির্ধারণ করত। আলিগড়ের সঙ্গে ভারত কেমন ব্যবহার করছে তার ওপর জাতীয় জীবনের ছবিটা বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিল। প্রথমটি সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। ভারতের জাতীয় জীবনে আলিগড় অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। মেধা ও পরিষেবার মূল্যায়ন মুসলিমরা অবশ্যই সদ্যস্বাধীন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের, যার রাষ্ট্রপতি স্বয়ং আমাদের মধ্যে হাজির হয়ে আমাদের কৃতার্থ করেছেন—বিকাশ ও গঠনে সম্মানজনক ভূমিকা আশা করে।'

এই আদর্শ রূপায়ণে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যক্তিগতভাবে হোসেন কি করতে পেরেছিলেন, এবারে আমরা সেই আলোচনা করব।

দেশভাগের পর অভিজ্ঞ শিক্ষকরা আলিগড় ছেড়ে চলে যান। 1948 সালের শেষ দিকে মাত্র তিনজন অধ্যাপক ছিলেন। প্রাণীতত্ত্বের বিভাগীয় প্রধান ড. বাবর মির্জা প্রকাশ্যে মুসলিম লিগ তত্ত্বের কথা বলতেন। তরুণ শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে দু-চারজন দাঙ্গার ক্ষতির হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে পেরেছিলেন। হোসেন প্রথমেই ভয় ও সন্দেহের বাতাবরণ দূর করতে সচেষ্ট হলেন। শীঘ্রই তাঁর সদিচ্ছা প্রমাণিত হলো। বিদ্বেষ ও মস্তিষ্ক-ধোলাই তাঁর চরিত্র-বিরোধী তাও বোঝা গেল।

এর ফলে সর্বত্র একটা আস্থার ভাব ফিরে এলো। মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠনের সূচনা হলো। হোসেন ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে তরুণ প্রতিভা খুঁজতে শুরু করেছেন। অল্পদিনের মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক, রিডার ও লেকচারার আলিগড়ে আসতে শুরু করলেন। অত্যন্ত জরুরি একটা কাজ সহজেই হয়ে গেল। স্নাতকোত্তর শ্রেণীর দিকে হোসেনের সজাগ দৃষ্টি ছিল, প্রকৃত মেধাসম্পন্ন ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্যে বিদেশ পাঠাতেন। তিনি আলিগড় ছেড়ে আসার পর

দীর্ঘমেয়াদি এই পরিকল্পনার ফসল ফলতে শুরু করে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, বিভিন্ন বিভাগে আজ যাঁরা শিক্ষকতা করছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই হোসেনের কাছ থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলেন।

যে শিক্ষকরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তারা কি কাজ করছেন সে সম্পর্কে তিনি নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন। অনেকের কাজে তিনি খুব খুশি হতেন আবার অনেককে 'গতবার যখন দেখা হয়েছিল, তখন এই কথা বলেছিলে' বলে ধমক দিতেন। ধমকে কারও-কারও কিছুই হতো না। অকাজে বা সামান্য কোনও কাজে তারা নিজেদের ব্যস্ত রাখত কিন্তু অনেকের কাছে এই ধমক বলবর্ধক টনিকের কাজ করত। বিভাগীয় প্রধানরা স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেতেন। এমনকী, কোনও বিভাগে মতপার্থক্য হলেও তিনি হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে অটল থাকতেন। নিজেদের মতপার্থক্য নিজেদের মিটিয়ে নিতে বলতেন। একবার এজন্য এক অনভিপ্রেত অবস্থার সৃষ্টি হয়। পদার্থবিদ ড. পি এম গিল আমেরিকাতে সুনামের সঙ্গে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন। অনেক চেষ্টাচরিত্র করে হোসেন তাঁকে আলিগড়ে নিয়ে আসেন। সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করে দেন। গবেষণার জন্যে আমেরিকা থেকে কেনা আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে গুলমার্গের কাছে একটা মানমন্দির তৈরি করে দেন। এত কিছু করা সত্ত্বেও পদার্থবিদ্যা বিভাগে বিশেষ কাজ হতো না। যা কিছু মামুলি কাজ হয়েছিল, সেজন্যে তাঁর মতো ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল না। অন্যদিকে তাঁর বিভাগের কিছু ঘটনা এবং অন্যদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার বেদনাদায়ক ও মারাত্মক রাজনৈতিক অবস্থা তৈরি করে।

প্রায়শ অন্য কাজে আলিগড়ের বাইরে থাকলেও এবং প্রথম বছরের শেষ দিকে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হলেও যে, একজন কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তি এই সংস্থার প্রধান তা সহজেই বোঝা যেত। 1950-51 সালের বাজেটে 58131 টাকা ঘাটতি ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যয় সংকোচ করা হয়নি, বরং ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। যা কিছু করার ছিল করা হচ্ছিল। জার্মান সভাপতি কার্ল মানটে ভন হেনজ ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজি কলেজের বাড়ির নক্‌শা পেশ করেন এবং বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেন।[2] আঞ্জুমান তারিক্কি-ই উর্দু আলিগড়ে আবার স্থাপিত হয়। 1950 সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে

---

2. দিল্লিতে গণ্ডগোলের সময় হোসেনের সঙ্গে এম এ আব্বাসির পরিচয় হয়। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি বাস্তুকার ছিলেন। উদ্ধার ও পুনর্গঠনের কাজ শেষ হবার পর হোসেন আব্বাসির অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে আব্বাসির বদনাম ছিল। আব্বাসির প্রতি হোসেনের শ্রদ্ধা ও আস্থার কারণ জানা যায়নি। হোসেনও কাউকে এ সম্পর্কে কিছু বলেননি। জামিয়া মিলিয়ার শিক্ষক কলেজ হোস্টেল নির্মাণ করেছিলেন আব্বাসি। আলিগড়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

'হাজারি জবান' আবার প্রকাশিত হতে থাকে। প্রয়াত কাজি আব্দুল গফ্ফর[3] সচিব ও সম্পাদক নিযুক্ত হন। লুপ্ত 'ইনসটিটিউট গেজেট' 'মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় গেজেট', নামে প্রকাশিত হতে শুরু করে 1951 সালের জুলাই মাসে। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় নতুন উপাচার্য যা করেছেন এবং যা যা করতে চান, সেই দলিল প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়া সারা ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন পুনরায় কাজ শুরু করে, ওল্ড বয়েজ অ্যাসোসিয়েশন নতুনভাবে গঠিত হয়। 1951 সালের 24 এপ্রিল এই সংগঠনের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সংগঠন গঠিত হওয়ায় দেশভাগের পর উত্তর ভারতের মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের হারিয়ে যাওয়া যোগসূত্র আবার স্থাপিত হয়েছিল। 1950 সালে গৃহীত ভারতের সংবিধান অনুযায়ী সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধর্মীয় আচরণকে বাধ্যতামূলক করতে পারে না। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও এই আইন প্রযোজ্য ছিল। ফলে ধর্মীয় আচরণ বাধ্যাতমূলক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনটি পরিবর্তন করা দরকার হয়ে পড়ে। অধিকাংশ মুসলিম তা চাননি। যদিও তাঁরা মনে করতেন জোর করলে ধর্মীয় আচরণ তামাশায় পরিণত হয়। অমুসলিমরা যাতে বিশ্ববিদ্যালয় সংসদে আসতে পারেন, সেজন্যে আইন পরিবর্তনের দরকার ছিল। এ ব্যাপারেও জোরদার আপত্তি উঠেছিল। আশঙ্কা ছিল, সংসদে মুসলিমরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে। হোসেন মনেপ্রাণে পরিবর্তনের পক্ষে ছিলেন। এজন্যে তাঁকে ভারত সরকারের পছন্দসই নতুন আলিগড়ের সৃষ্টিকর্তা বলে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল।

1951 সালের জুলাই মাসে আবদুল্লা গাজি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। তিনি আমাকে বলেন, ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই হোসেনকে অনুপ্রবেশকারী বলে মনে করতেন। আলিগড়ের শুদ্ধিকরণের[4] জন্যে ভারত সরকার তাঁকে চাপিয়ে দিয়েছে বলে ভাবা হতো। উপাচার্যের বেতনের সঙ্গে জামিয়াতে তার প্রাপ্য বেতনের তুলনা করা হতো, বলা হতো প্রাণীতত্ত্বের বিভাগীয় প্রধান ড. বাবর মির্জা বা শিক্ষকশিক্ষণ কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক হবিবুর রহমান অনেক যোগ্য উপাচার্য হতেন। ছাত্র

---

3. কাজি আবদুল গফ্ফর 1920 সালে মৌলানা মহম্মদ আলির সঙ্গে লণ্ডন যান। তিনি খিলাফত আন্দোলনের নেতা ছিলেন। মৌলানা আজাদের আস্থাভাজন ছিলেন। তাঁকে আঞ্জুমান-তারিক্কি-উর্দু সংস্থার সচিব করা হবে এমন আশ্বাসের ভিত্তিতেই আঞ্জুমানকে সরকারি সাহায্য দেওয়া হয়েছিল। তিনি বৃদ্ধ ও অসুস্থ ছিলেন। তাঁর বেতন আসলে তাঁর পেনসন ছিল। আঞ্জুমানের সভাপতি হয়ে হোসেন, আবদুল গফ্ফরের ঘন ঘন দিল্লি যাতায়াতের খরচ দিতে আপত্তি করেন। নিয়ম বহির্ভূতভাবে তিনি এই অর্থ গ্রহণ করতেন। কাজিসাহেব মৌলানা আজাদের কাছে হোসেনের নামে কান ভারী করতেন। তার চরিত্র এই রকম ছিল।

4. হিন্দুধর্মে রূপান্তর।

সংসদের সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ আহমেদ, যিনি নিজেকে 'জার' বলে ভাবতেন এবং ছাত্ররা যাকে 'আন্ডা' (ডিম) নামে ডাকত উপাচার্যকে স্বাগত জানাতে, তিনি আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেন। কয়েকজন ছাত্রের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদে এবং চেহেলামের[5] ছুটি বাতিল করা হবে, এই গুজবের ভিত্তিতে তাঁকে আক্রমণ করা হয়েছিল। 1951 সালের 10 অক্টোবর রাওয়ালপিণ্ডিতে লিয়াকৎ আলি খানের হত্যার পর ছাত্ররা সাইরেন বাজাবার দাবি করে। শোক পালনের জন্যে সাধারণভাবে সাইরেন বাজানো হয়। অনেক ছাত্র আবার এই দাবির বিরোধিতা করে। প্রতিবাদীদের নেতৃস্থানীয় একজন ছাত্রকে যথেষ্ট প্রহার করা হয়। উন্মত্ত জনতা হোসেনের বাড়িতে এসে সাইরেন বাজাবার নির্দেশ দেবার দাবি জানায়। এমন দাবি না করার জন্যে তিনি তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। তা সত্ত্বেও তারা চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকায়, তিনি রেগে গিয়ে তাদের যা খুশি করতে বলেন। ঘরের তালা ভেঙ্গে দুর্বৃত্তরা সাইরেন বাজিয়ে দেয়।

সাধারণত ছাত্রদের ভাবাবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে এজাতীয় ঘটনা সংগঠিত করা হয়। ছাত্রদের একটা ছোট্ট অংশও হিংসাত্মক ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে। আলিগড় কোনও ব্যতিক্রম নয়। সেখানে দুর্বৃত্তদের প্রভাবিত কয়েকজন ছাত্র ছিল। অধিকাংশ কিন্তু, হাঙ্গামা থেকে দূরে থাকতে চাইত। সদাতৎপর স্বল্প কিছু ছাত্র শৃঙ্খলা বজায় রাখতে দৃঢ় ছিল। ছাত্রস্বার্থে তারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করে যায়। আলিগড়ের নতুন জমানায় যেমন বিরোধিতা ছিল, তেমন প্রকাশ্যে হোসেনের সমর্থনে কথা বলার লোকও ছিল। হোসেন সব সময় বাক্‌স্বাধীনতাকে প্রশ্রয় দিতেন। একজন শিক্ষক হিসাবে তিনি আশা করতেন, এর ফলে শেষ পর্যন্ত ছাত্ররা কিছু শিখতে পারবে। যদিও মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাঝেমধ্যে বাক্‌স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ করত। সাহায্যপ্রার্থীদের হোসেন অক্লান্তভাবে সাহায্য করতেন। উপাচার্যের বিশেষ তহবিলে না কুলোলে নিজের মাহিনার একটা অংশ এই খাতে ব্যয় করা হতো। তাঁর বাড়িতে কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে তাঁর আচরণের কথা;আমরা তাঁর পরিচারক ইশাকের কথা থেকে জানতে পারি। কয়েকজন ছাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যায়, পরিধানে ছিল চলতি কেতা অনুযায়ী কোমরের ওপর থেকে বোতাম খোলা আচকান। হোসেন আচকানের বোতাম খোলা রাখা পছন্দ করতেন না। তিনি তাদের তিরস্কার করেননি, শুধু কথা বলতে বলতে তাদের আচকানের বোতাম আটকিয়ে দেন। পরবর্তিকালের অভিভাষণ থেকে ছাত্রদের সম্পর্কে তাঁর ধারণা জানা যায়।

---

5. হিজরি সনের প্রথম মাস মহরমের 10 তারিখে ইমাম হাসানকে হত্যা করা হয়। শহিদ হবার 40-তম দিনটিকে 'চেহেলাম' বলে।

1951 সালের 11 অগস্ট ছাত্র সংসদের নবীনবরণ সভায় তাঁকে বক্তব্য রাখতে হয়েছিল। সেই বক্তব্যের সারাংশ মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় গেজেটে 24 অগস্ট প্রকাশিত হয়।

'আমাদের প্রত্যেকের ভিতর একটা জন্তু ও একটা মানুষ আছে। ভিতরের সেই জন্তুটাকে অবদমিত রাখা শিক্ষার উদ্দেশ্য। পশুদের অবদমন এবং মনুষ্যত্বের বিকাশই হলো সকল শিক্ষার রহস্য।'

'পরীক্ষা পাশ করে ডিগ্রি লাভ করার উদ্দেশ্য নিয়ে যারা এই প্রতিষ্ঠানে এসেছে, তারা খুব সাধারণ মান ও লক্ষ্যকে সামনে রেখেছে। একটা চাকরি বা অন্য কোনও জীবিকার কথাই ভাবছে। কিন্তু এটাই সব নয়। মনের উৎকর্ষ সাধন এবং সজীবতা বৃদ্ধিই শিক্ষার প্রধান কাজ। আমাদের চারপাশের পৃথিবী সম্পর্কে আমরা সজাগ হলেই কাজ শুরু করা যায়। যাতে সেই সঙ্গে চলতে পারি, তা দেখাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ। তোমারা এখানে এসেছ নিজেদের উৎকর্ষ সাধনে। পশুত্বকে অবদমিত করে তোমাদের ভিতরের মানুষটিকে জাগাতে। পশু ও মানবের মধ্যে প্রধান পার্থক্য: পশুর কোনও সামাজিক দায়িত্ব নেই। একটা নির্দিষ্ট স্তরের ওপরে পশু উঠতে পারে না। পড়াশুনার উদ্দেশ্য কিছু ঘটনা মুখস্থ করা, এ ধারণা ভুল। শিক্ষা যতক্ষণ না একটি ছাত্রের মেধা বৃদ্ধি করে, জ্ঞানার্জনের আর্তি না জাগায়, কষ্টসহিষ্ণু না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত ছাত্রটির মনের পরিপক্কতা আসে না। ইতিহাসের সমস্ত ঘটনা জানা থাকলেই ঐতিহাসিক হয় না। কবিতা পড়লেই কবিতা উপভোগ করা যায় না, সেজন্য প্রয়োজন হয় মনন ও আবেগের।

'প্রধান গুণগুলি একত্রিত করেই একটি মানুষ শিক্ষিত হয়ে ওঠে। ভাষা সাহিত্য ধর্ম সংস্কৃতি এই গুণসমূহের প্রতীক। গুণগুলি সংহত করে যে নিজের অস্তিত্বের মধ্যে নিয়ে আসতে পারে, তাকেই সফল বলা যায়। যে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়নি সেগুলি সমাধান করার জন্যে তুমি কি কোনও তাগিদ অনুভব করো? কবিতা পড়ার পর কবিতা লেখার কোনও প্রেরণা পাও? বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার সময় তুমি কি কোনও বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের নেশায় মশগুল হও?

'শিক্ষার্থী বন্ধু! শিক্ষাকে হালকাভাবে নিয়ো না। শিক্ষা মুখস্থ করার বিষয় নয়। কবিতা বা কলা, অঙ্ক বা বিজ্ঞানের সৌন্দর্য আবিষ্কার করে বা তার রহস্যের পরদা সরিয়ে তোমরা নিজেদের মনকে সুন্দর করে তুলতে পারো। জীবিকা অর্জনে সাহায্য করা শিক্ষার উদ্দেশ্য। কেউ যদি তা করে, তাকে স্বার্থপর বলা যায় না। সম্মানের সঙ্গে আমরা সমাজে বাস করব এবং সমাজকে সুন্দর করে তুলব। মৃত্যুর সময় যিনি জন্মের সময়কার তুলনায় ভাল সমাজ রেখে যেতে পারেন তিনিই সৎ মানুষ।

'ছাত্রাবাসের দিনগুলি তোমাদের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তোমরা নিশ্চয় নিজেদের ছাত্রাবাসগুলির উন্নতি করবে। পুরোনো ছাত্ররা দায়িত্বসচেতন হলে নতুনরা তাদের দেখে দায়িত্ব ভাগ করে নিতে শিখবে। পুরাতন ও নবীন, উভয়েই পরস্পরের

কাছ থেকে অনেক কিছু শিখবার আছে। নতুন সমাজের ভাষা তোমাকে বুঝতে হবে, জানতে হবে, তোমার রাগ বা আনন্দ প্রকাশের পদ্ধতি। ইউনিয়ন করার সময় শুধু কথা বলার কায়দা নয়, কথা শোনার গুণও রপ্ত করতে হবে। বলা খুবই সহজ কিন্তু, অন্যের কথা মন দিয়ে শোনা খুবই কঠিন। কোনও বক্তব্য সমর্থন করা বা বিরোধিতা করার কৌশলও তোমায় রপ্ত করতে হবে।

'ঐতিহ্য তৈরি অবস্থায় কেনা যায় না। ঐতিহ্য গড়ে তুলতে হয়, এবং নতুন নতুন ঐতিহ্য সংযোজিত করতে হয়। ক্ষতিকর কিছু ঐতিহ্যে যুক্ত হলে তা ছেঁটে ফেলতে হয়। একটা সুস্থ সমাজ তার সুন্দর ঐতিহ্যগুলি পালন করে, এবং, যা কিছু খারাপ তা নষ্ট করে দেয়। আমাদের ধর্মে মদ্যপান নিষিদ্ধ করার সুফলগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। মাতাল হলে মানুষ নিজের জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। যা কিছু মানুষকে পশুত্বে নামিয়ে নিয়ে আসে, সে সবই ক্ষতিকর এবং অবশ্যই নিন্দার্হ।

'শিক্ষার জন্যে যারা এখানে এসেছ তারা ইতিমধ্যেই একটা বড় কাজ করেছ। তারা প্রথমে নিজেদের জানবে, স্বাভাবিক ক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ হবে, চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে শিখবে। তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই জানে না, তাদের বৃত্তি কী হবে, কী তাদের করা উচিত, কোন পথে তারা চলবে। নিজের ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা, ভিতরের বিভিন্ন গুণের সমন্বয় করা প্রভৃতির মাধ্যমে একজনের চরিত্র গড়ে উঠে। এ ধরনের দৃঢ় চরিত্র যখন কোনও মহৎ কাজে নিয়োজিত হয়, তখন তা ব্যক্তিত্বময় হয়ে ওঠে। সেই ব্যক্তিত্ব যখন জীবনের মূল্যবোধসমূহ বাস্তাবায়িত করতে চায়, তখন তাকে ঈশ্বরের প্রতিভূ বলেই মনে হয় কেননা জীবনের সমস্ত মহৎ গুণের প্রতিভূ হিসাবে আমরা ঈশ্বরকে দেখতে অভ্যস্ত।

'দীর্ঘস্থায়ী এবং ধারাবাহিক নিঃসঙ্গতায় নয়, সমাজের মধ্য থেকেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। মানুষের মধ্যে থেকে মানুষের জন্যে কাজ করার ভিতর দিয়েই ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। অন্যের জন্যে ভাল কাজ করলে সবাই উপকৃত হয়, চরিত্রের বিকাশ হয়। সমাজের স্বার্থেই নিজের ভাল করার কথা ভাবো। সামান্যতম নৈতিক অধঃপতন গোটা সমাজকেই হেয় করে। আমরাই সমাজকে সম্মানিত বা অপমানিত করি। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের অপকর্মের ফলে গোটা সমাজ নিন্দিত হয়। আমরা সকলেই বদ নই! কিন্তু যে কজন বদ, তারা তো সমাজেরই অংশ, আমাদের মতো রক্তমাংসের মানুষ, তাদের জন্যে আমরাও দায়ী। তোমার প্রতিষ্ঠানের, তোমার সমাজের উন্নতির জন্যে তোমাকে সচেষ্ট হতে হবে। তোমর প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষতা তোমার হাতেই। তুমি সেই উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সরব হলে পরবর্তী প্রজন্ম আরও সুন্দর সমাজে বাস করবে।

'শিক্ষকের প্রতি তোমাদের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বদ ছাত্ররা একজন ভাল শিক্ষককে একতাল মাটিতে পরিণত করতে পারে। আবার ভাল ছাত্ররা একজন

মাঝারি শিক্ষককে, প্রজ্ঞার প্রতীক হিসাবে গড়ে তুলতে পারে। ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্কটা মা ও ছেলের সম্পর্কের মতো। মা যেমন তার শিশুকে ভালবাসেন, বুকের দুধ দিয়ে তাকে পালন করেন; একজন শিক্ষকের তেমনভাবেই তার ছাত্রদের ভালবাসা উচিত। ছাত্রদের উৎকর্ষতাকে শিক্ষককে উজ্জীবিত করে এবং তার মাধ্যমে মানব সমাজকে।

'তোমাদের সঙ্গে ছাত্রীরাও পড়ছে। তাদের প্রতি সর্বদা ভাল ব্যবহার করবে। অভদ্র ব্যবহার, তিক্ত মন্তব্য তোমাকেই ছোট করবে। একটি ছাত্রী একাধারে মা বোন স্ত্রী। এই মেয়েটিই একদিন কারও স্ত্রী হবে। তোমার স্ত্রীর প্রতি খারাপ ব্যবহার করেছে, এমন কোনও লোককে তুমি পছন্দ করবে?

'পড়া ও লেখা একই ধরনের কাজ। পরিপূর্ণ মহত্ত্ব অর্জন করা মানবজীবনের প্রধান লক্ষ্য। তোমাকে সেই উদ্দেশ্য পূরণ করতে হবে। নেওয়ার মতো মন থাকলেও প্রতিটি ধূলিকণা থেকেই অনেক কিছুই নেওয়ার আছে। ধাক্কা দিতে জানলে অনেক দরজা খুলে যায়। মৌলানা রুমের সেই কবিতাটি নিশ্চয় তোমরা পড়েছ, যেখানে কবি বলেছেন, 'জলই তৃষ্ণার্তকে খুঁজে বেড়াচ্ছে'।'

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-পদ গ্রহণের সময় দু ধরনের সুযোগের আশা করেছিলেন হোসেন। এক, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা তরুণ এবং সম্ভাবনাময় প্রতিভা একত্রিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধিচর্চা ও বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলা; দুই, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে একটা আকর্ষণীয় বাগান গড়ে তোলা।

পরিপূর্ণ সন্তুষ্টিতে মনের মতো করে তিনি বাগান গড়ে তুলেছিলেন। বাগানবিলাসী হলেও এবং প্রচুর জমি থাকা সত্ত্বেও ওকলাতে শখ মেটাবার উপায় ছিল না। ফুল ও উদ্যানপালন বিদ্যায় তাঁর জ্ঞান ছিল খুব সামান্য। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে যখন তিনি কর্নেল বি এইচ জায়দির বাড়িতে বিশ্রাম নিতে যান, সে সময় এ ঘাটতি তিনি পুষিয়ে নিয়েছিলেন। বেগম কুদসা জায়দির শখ এবং সামর্থ্য দুই-ই ছিল। হোসেন চারপাশের সাধারণ জিনিষের সৌন্দর্যের দিকে বেগম জায়দির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গুণগত উৎকর্ষতায় কাঠ মাটি তামার দর্শনীয় দ্রব্যাদি সোনারূপার চাইতে কোনও অংশে কম নয়, এই ধারনায় তিনি বেগমকে প্রভাবিত করেন। সৌন্দর্যের অনুসন্ধানে তাঁদের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। মুখ্যমন্ত্রীরূপে কর্নেল জায়দি রামপুরে বাগান তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন। বেগম জায়দির ফুল ফল গাছপালা বাগান পরিচর্যার জ্ঞান সম্বল করে হোসেন এই বিষয়ে পড়াশুনা শুরু করেন। কোথাও বেড়াতে গেলে স্থানীয় গাছগাছালি ও ফুল সম্পর্কে অনুসন্ধান করে তিনি সময় কাটাতেন। আলিগড়ে তাঁর উদ্যানবিশেষজ্ঞকে শীঘ্রই তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে উদ্যান বিষয়ক উপদেশ দিতে শুরু করেন। বুগেনভিলিয়া গোলাপ সহ বিভিন্ন

পুষ্পশোভিত ঝোপের বাহারে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর প্রতি বছর রঙিন হয়ে উঠত। পথের দু পাশের বড় বড় গাছের বাহারে অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি হতো।

কালানুক্রমিক বিবরণ দেওয়ার রীতি ভঙ্গ করে হোসেনের আনন্দজনক একটি অভিজ্ঞতার উল্লেখ করব। 1955 সালের গরম কালে হোসেন ও জায়দি পাহাড় ও দক্ষিণের আকর্ষণীয় সুন্দর জায়গাগুলি বেড়াতে যাবেন বলে ঠিক করেন। এই বেড়ানো তাঁর জীবনের অত্যন্ত আনন্দজনক অভিজ্ঞতা।

খরচা সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া দরকার। জায়দির কাছে জানতে চান বেড়াবার জন্যে কত খরচ হবে। আনুমানিক 500 টাকা লাগবে বলে জায়দি জানান। তার ধারণা ছিল হিসাবপত্তর যেহেতু তাঁর কাছে থাকবে, সেজন্য ঘাটতি কিছু হলে হোসেনের অজান্তে তিনি তা মিটিয়ে দিতে পারবেন। সে যাত্রায়, তাঁরা প্রথম থেমেছিলেন বম্বেতে। নেমেই হোসেন কত খরচা হলো হিসেব করছেন দেখে, জায়দি শঙ্কিত হয়ে পড়েন। যাইহোক, ঘটনা হলো সে যাত্রায় 500 টাকাও খরচা হয়নি। তাঁরা দুজনেই সংসদ সদস্য ছিলেন। সাংসদ হিসাবে ট্রেনে ভাড়া লাগেনি। বিভিন্ন স্থানে পাওয়া আতিথ্যে থাকাখাওয়ার খরচা লাগেনি। প্রায় সব টাকা খরচ হয়েছিল বকশিশ দিতে আর গাছপালা কিনতে।

বম্বেতে চারদিন কাটিয়ে তাঁরা পঞ্চগ্নিতে যান। হোসেন হাঁটাহাটি মোটেই পছন্দ করতেন না। অথচ তাঁরা স্বাস্থ্যের জন্যে তা ছিল জরুরি। জায়দি মাইলখানেক দূরে কোনও গাছ দেখে এসে হোসেনকে গল্প বলতেন। হোসেন গাছটা দেখার প্রলোভন জয় করতে পারতেন না। পরদিন সকালে দুজনে ধীরেসুস্থে সেখানে গিয়ে গাছটা দেখে আসতেন। এরপর তাঁরা শিবাজির জন্মস্থান মহাবালেশ্বর, প্রতাপগড়, সিংহগড় সাতরা হয়ে পুনায় উপস্থিত হন। প্রাচীন মারাঠা ইতিহাস এবং শিবাজি সম্পর্কে নানান বই তাঁদের সঙ্গে ছিল। কায়িক পরিশ্রম ছাড়াও মারাঠা ইতিহাসকে নতুন করে লেখার মননশীল পরিশ্রম তাঁরা করেছিলেন। পুনা থেকে ব্যাঙ্গালোর। তিনদিন পরে মহীশূর। মহীশূর থেকে তাঁরা কুর্গে যাবেন স্থির করেন। চিফ কমিশনার শাসিত রাজ্য কুর্গের রাজধানী ছিল মারকারা। যেখানে ভারতের দুই প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ কারিয়াপ্পা ও থিমাইয়া বাস করতেন। রেল যোগাযোগ না থাকায় সেখানে যাবার আশা তাঁরা প্রায় ত্যাগ করেছিলেন। সে-সময় পরিবার পরিজন নিয়ে কুর্গ থেকে এক ব্যবসায়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে মহীশূর এসেছিলেন। তাঁর খালি গাড়ি দুটি কুর্গে ফিরে যাচ্ছিল। তিনি ওঁদের ওই গাড়ি দুটি ব্যবহার করতে অনুরোধ করেন। ঘটনাটি শুধুমাত্র ঈশ্বরপ্রেরিত ছিল তা নয়, যাত্রীরা অবশিষ্টাংশের জন্যে সুলক্ষণযুক্ত ছিল। গৃহকর্তারা সর্বত্র ওঁদের গাড়ি দিয়ে পরবর্তী গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

কুর্গে তাঁরা জনৈক চা-বাগিচা মালিকের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। বাগিচা মালিকের গাড়ি করে তাঁরা চা ও কফি বাগান ঘুরে দেখেন। তারপর কালিকট।

মহম্মদ ইশাক নামে মালাবার জেলার এক তরুণ তাঁদের আসার কথা প্রকাশ করে দেন। ইশাক জামিয়া মিলিয়াতে পড়াশুনা করেছিলেন এবং সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। যেখানে শহরের মান্যগণ্যদের উপস্থিতিতে তাঁদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ওই সভায় হোসেন ও জায়দিকে সময়োপযোগী বক্তব্য রাখতে হয়েছিল। এখানে একজন ব্রাহ্মণ তাঁদের দুপুরে খাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানান। তিনি যখন শুনলেন প্রত্যেকদিন দুপুরের নিমন্ত্রণ ওঁরা ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছেন, তখন তিনি তাঁদের প্রাতঃরাশে আমন্ত্রণ করেন : 'অনুগ্রহ করে প্রাতঃরাশে আসুন এবং ব্রাহ্মণের কফি পরখ করে যান।' বাস্তবিক এত সুস্বাদু কফি তাঁরা ইতিপূর্বে পান করেননি।

কালিকটকে কেন্দ্র করে তাঁরা পশ্চিম নীলগিরি এলাকা ঘুরে দেখেন। নীলগিরির সৌন্দর্য তাঁদের বিস্মিত করে। তারপর তাঁরা কোচিন ও আলেপ্পি যান। পামারিয়ার ও আচানকোভিল নদীর মোহনায় আলেপ্পি শহর, যাকে ভারতের ভেনিস বলা হয়। মালাবার জেলার খ্রিস্টান অধ্যুষিত এলাকাগুলি তাঁরা ঘুরে দেখেন। পেরিয়ার লেক ও বন্যপ্রাণী রক্ষণশালাও তাঁরা ঘুরে দেখেছিলেন। এরপর কুইলন। যেখানে কাজু ব্যবসার প্রধানতম ব্যক্তি হোসেনের কাছে 15 লক্ষ টাকার চেক নিয়ে আসেন। অনুরোধ করেন, কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে একটি মুসলিম কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে। হোসেনকে রাজি হতে হয়। আজও সেখানে ওই মুসলিম ভদ্রলোকের নামে একটি কলেজ আছে।

কুইলন থেকে তাঁরা ত্রিবান্দ্রম হয়ে কন্যাকুমারী যান। ফেরার পথে ত্রিবান্দ্রম থেকে ট্রেন ধরে তারা মাদ্রাজ আসেন। এই ভ্রমণের স্মৃতি হিসাবে তাঁরা 150 টি গাছ নিয়ে আসেন।

বাগান ছাড়াও আলিগড়ে থাকাকালীন হোসেন জীবাশ্ম সহ বিভিন্ন ধরনের পাথর ও স্ফটিক সংগ্রহে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ পরিদর্শনকালে তাঁর এই শখ জাগে। যে ভাবে তিনি এই বিভাগের প্রশংসা করছিলেন, তাতে আমার মনে হয়েছিল সত্যিকারের জ্ঞানের চর্চা এই বিভাগেই হয়। বিভাগীয় কাজে তিনি খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। এই বিভাগের সংগ্রহ বৃদ্ধির জন্যে সম্ভাব্য সব সাহায্য তিনি করেছিলেন এবং নিজেও সংগ্রাহক হয়েছিলেন।

আলিগড়কে একটি খ্যাতিসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গড়ে তোলার জন্যে হোসেনের প্রচেষ্টা কতটা ফলপ্রসূ হয়েছিল আমি তা খোঁজার চেষ্টা করেছি। সমীক্ষার সাম্প্রতিক রীতি অনুযায়ী একটি সুসংবদ্ধ প্রশ্নমালা তৈরি করে ব্যাপকসংখ্যক শিক্ষিত মানুষের মধ্যে বিলি করা হয়। পূরণ করা জবাব থেকে হোসেন কেমন উপাচার্য ছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্যের গুরুত্ব কতটা ছিল, তাঁর সাফল্য কি কি, তাঁর ব্যর্থতা কোথায়, তাঁর সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ কি কি প্রভৃতি প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত জবাব পাওয়া যায়। আমি অবশ্য মনে করি, উপাচার্য হিসাবে তাঁর সাফল্যের শ্রেষ্ঠ বিচারক

হোসেন নিজেই। ইতিপূর্বে উদ্ধৃত 1951 সালে ছাত্রদের কাছে দেওয়া হোসেনের বক্তব্য সহ অন্যান্য বক্তব্য ঠিকমতো ব্যাখ্যা করতে পারলে আমাদের সব জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়া যাবে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার পর 1952 সালের 11 অগস্ট সার সৈয়দ হলে তাঁর সম্মানে প্রদত্ত ভোজসভায় হোসেন বলেন :

'চারমাস পরে আলিগড়ে ফিরে খুব ভাল লাগছে। আলিগড়ে আমি সুখি থাকি। ছাত্রাবস্থায় আলিগড়কে আমার সর্বস্ব বলে মনে হতো। আমার বাড়ি, আমার বাগান, আমার জন্মভূমি। কোনও কারণে অল্প সময়ের জন্যে অন্যত্র গেলেও সর্বদা আলিগড় আমার স্মৃতিতে বিরাজ করত। আলিগড়কে নিয়ে আমি ভাবতাম। আলিগড়কে ঘিরেই ছিল আমার জীবনের স্বপ্ন। অথচ ছাত্রাবস্থায় আমাকে এই আলিগড় ত্যাগ করতে হয়েছিল। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলাম। আমরা যেমনভাবে চাইছিলাম কর্তৃপক্ষ তেমনটি হতে দিতে রাজি ছিলেন না। মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে একমত হচ্ছিলেন না। আমি তখন সাহেববাগে থাকতাম। পুলিশ আমাকে ট্রাকে তুলে রেল স্টেশনে নিয়ে এলো। আমার এখানে আসা নিষিদ্ধ হলো। এরপর সহকর্মীদের নিয়ে জামিয়ার কাজ শুরু করলাম। এখানে বিদ্রোহ করে আমরা জামিয়া মিলিয়া গড়ে তুলেছিলাম কিন্তু কখনও জামিয়াকে আলিগড়ের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দেখিনি। 27 বছর ধরে আন্তরিকভাবে আমি যে জামিয়া মিলিয়াতে কাজ করেছিলাম, তার একমাত্র কারণ আমি ভাবতাম আমি আলিগড়ের জন্যেই কাজ করছি। একদিন আলিগড়ে ফিরে আসব, আলিগড়কে আমার আশাআকাঙ্ক্ষার প্রতীক করে তুলব বলে আমি নিশ্চিত ছিলাম।'

যেখান থেকে উদ্ধৃত অংশ অনুদিত হয়েছে, সেই মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় গেজেটে আক্ষরিক প্রতিবেদন ছাপা হয়নি, কিন্তু সংক্ষিপ্তসার সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। আগের দিকে মুদ্রিত আলিগড়ে শিক্ষার আদর্শ ও পরিবেশ বিষয়ক আলোচনায় যে তীক্ষ্ণ সমালোচনা তিনি করেছেন, তার সঙ্গে আলিগড়ে ফেরার আর্তি যথেষ্ট অসংগতিপূর্ণ। আগে উদ্ধৃত বক্তব্য রাখার আট দিন পর পরে হোসেন ছাত্র সংসদে ভাষণ দেবার সময় বলেন :

'একটা দেশের সবচেয়ে বোধশক্তিসম্পন্ন অংশের মানুষ হিসাবে তোমরা সেই মুষ্টিমেয় অংশের প্রতিভূ, যারা জীবনের অধিকাংশ সময় জ্ঞান অর্জনে ব্যয় করেছ। তোমরা সৎ চরিত্রবান হবে এমনটাই আশা করা হয়। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কি ঘটছে, সেখানকার ছাত্ররা কি করছে, এসব নিয়ে ভেব না। সত্যিই আমাদের তেমন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় নেই। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে অশিক্ষিত বর্বরদের মতো ব্যবহার দেখা যায়, তবে তা কতটা দুঃখজনক হবে একবার ভেবে দেখো। আমরা কোনও

কিছু খতিয়ে দেখি না, আমাদের কোনও আত্মনিয়ন্ত্রণ নেই। চোদ্দ-পনেরো বছর লেখাপড়া করেও যদি একজন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারে, তাহলে সে পশুর চাইতে ভাল কীসে? বেপরোয়া এবং শ্রদ্ধাহীনতার মতো অপরাধ প্রত্যেক সৎ মানুষের এড়িয়ে চলা উচিত। মানুষরূপে আমরা যে মর্যাদা পাই, তার জন্যেই আমাদের আত্মানুসন্ধান করা উচিত। তোমরা অবশ্যই নিজেদের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলবে, অন্যথায় তোমাদের এখানে আসা, শিক্ষাগ্রহণ সবই আত্মপ্রবঞ্চনা হবে।'

জাকির হোসেনের কথা বলার ধাত যারা জানেন, তাঁরা নিশ্চয় অনুভব করেছেন যে, 1951 সালের 11 অগস্ট যে ভাষণ তিনি দেন তাতে তাঁর শিক্ষায় ও সংস্কৃতিকে যতটা ভর্ৎসনা করা সম্ভব, তিনি তাই করেছিলেন। আবার 1952 সালের 19 অগস্টের ভাষণ থেকে বোঝা যায়, অবস্থার কোনও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। এমনকী যাঁরা তাঁর বক্তব্য বুঝতে পেরেছেন তাঁরাও হোসেনের কাজে সাড়া দেননি। এই অভিযোগ তাঁর ভাষণে হোসেন করেছিলেন। সার সৈয়দ আহমেদ খানের উচ্চাশা ও ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি কথাগুলি বলেছিলেন। 17 অক্টোবর 1954, সার সৈয়দ-দিবস হিসাবে পালিত হয়েছিল। মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় গেজেট অবাক হয়ে উল্লেখ করেছিল হোসেন ওই সভার প্রস্তুতির জন্যে সারা সকাল ব্যস্ত ছিলেন। উপাচার্য হিসাবে বিভিন্ন সভায় তিনি যে সম্মান পান, তার চাইতে অনেক বেশি সমাদারে তিনি অতিথিদের ওই সভায় অর্ভথ্যনা জানান।

'সার সৈয়দ কিছু একটা করতে চেয়েছিলেন।[6] এক জীবনে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি বাঁচতে চাইতেন। কিন্তু তাঁর লোকেরা তাঁকে মারতে চাইত, কারুও এক জীবনে কত কাজ করা যায়, তা তিনি প্রত্যেককে দেখিয়েছিলেন। লোকেরা কাজ করতে চাইত না, কাজ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিত।

'সার সৈয়দ অন্যের ফেলে রাখা কাজে হাত দিতেন। কৃষির ওপর তিনি বই লিখেছিলেন। তিনি অনেককে এই বিষয়ে বই লিখতে বলেছিলেন। কেউ যখন লিখলেন না, উনিই লিখতে শুরু করলেন। এই সভায় অনেক বিশেষজ্ঞ উপস্থিত আছেন, যাঁরা মোটা মাইনে পান। নিজেদের বিষয়ে তাঁরা কটা বই লিখেছেন? বিজ্ঞানবিষয়ক সমিতি গঠন করে সার সৈয়দ অনুবাদের কাজ শুরু করেন। এই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তিনি উর্দু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে চাইতেন, লোকের তাতেও আপত্তি। তিনি একটা কলেজ স্থাপন করেন। কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত করে, ব্যাপকভাবে ইংরাজি চর্চার ব্যবস্থা করে, পারশিয়ান ও আরবির শিক্ষাকেন্দ্র করে গড়ে তুলে তিনি কলেজের কাজের পরিধি বাড়াতে চাইছিলেন। অনেক কিছু করার স্বপ্ন দেখতেন সার সৈয়দ। কিন্তু একজনের পক্ষে সব কিছু করা সম্ভব নয়। তাঁর

---

6. প্রতিবেদন আক্ষরিক ছিল না।

সাহস উচ্চাশা দৃঢ়তা, লোকে সহ্য করতে পারত না। তাঁর সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্যে তিনি কাজ করতে চাইতেন। অলস লোকেরা চাইত তাঁকে টেনে নামাতে। সার সৈয়দ তাদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় এসেছিলেন। ঝক্কি ঝামেলাহীন সহজ সরলজীবন যাঁরা পছন্দ করতেন, তাঁদের তহশিলদার বা ডেপুটি কালেকটর পদে নিয়োগ করা হতো, কেরানিগিরি যারা পছন্দ করত, তাদের কেরানির চাকরি দেওয়া হতো। উচ্চাশা ও সাহস যাদের ছিল তাদের নিজের সহযোগী করে নিতেন।

অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা সংগঠনের প্রতি তিনি বিশেষ নজর দিতেন এবং তাঁর পদ মর্যাদায় যতটা সম্ভব প্রশ্রয় দিতেন, পরিকল্পিত এই সমালোচনা বন্ধ করা এবং নিজেকে অনেকটা ভারমুক্ত করার জন্যে এই পন্থা নিয়েছিলেন। এক বছরের মধ্যে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, আলিগড়ে তাঁর পক্ষে যতটা করা সম্ভব তিনি করেছেন। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রে দেখা যাচ্ছে, 1956 সালের মার্চ মাসে বন্ধুরা তাঁর পদত্যাগের ইচ্ছা জানতে পারেন। আমরা অবশ্যই ধরে নেব, 1955 সালের মাঝামাঝি তিনি এ বিষয়ে মনস্থির করে ফেলেছিলেন। তিনি শুধুই পদত্যাগ করতে চাননি। তাঁর কার্যালয়ের শেষ অধ্যায়কে তিনি এমনভাবে রাঙাতে চাইছিলেন যাতে, তাঁর সময়ের সার্থকতা ও সৌন্দর্য বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলে সহজেই অনুভব করতে পারে। কেউ যাতে অনুমান না করতে পারে যে হোসেনের আসল উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ধার শোধ করা। সামান্য বুদ্ধি আছে এমন যে-কেউ, সহজেই ধরতে পারেন এখন আর কোনও সমঝোতা সম্ভব নয়। 1955 সালের নভেম্বর মাসে মৌলানা আজাদ পাঠাগার ও সাইফি ছাত্রাবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার জন্যে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। জওহরলাল তখন খ্যাতির মধ্যগগনে। তাঁকে স্বাগত জানিয়ে হোসেন বলেন :

'ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মতো একজন অতি প্রিয় এবং সম্মানীয় অতিথিকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাগত জানাতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে। কঠিন দায়িত্ববহ এই সৌভাগ্য। ভাষার সাহায্যে আনুষ্ঠানিক স্বাগত জানানো যায়। বর্ষার ঘন কালো জলবাহী মেঘ যখন তপ্ত তৃষ্ণার্ত পৃথিবীর ওপর দিয়ে উড়ে যায়, তখন জীবনের লুকোনো তরঙ্গে প্রতিটি ধূলিকণা আলোড়িত হয়। শরতের মাতাল হাওয়া বয়ে যাবার পর গাছগাছালির প্রাণরস শিরায় শিরায় প্রবাহিত হতে থাকে। ভীরু সন্ত্রস্ত চাউনিতে কুঁড়িগুলি বসন্তকে স্বাগত জানায়, দিলখোলা আনন্দে ভেসে যায়। তাদের আবেগ ভাষার অতীত। বসন্তে সমস্ত বাগান উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, খুশির জোয়ারে ভেসে যায়, কিন্তু তা ভাষায় প্রকাশ পায় না। এমন সুন্দর মুহূর্তগুলি চোখের তারার নাচে, হৃদয়ের উষ্ণ ভালবাসায় সার্থকভাবে প্রকাশ করা যায়, মানুষ কিন্তু তা ভুলে যায়। ভাবে নয়, সে নিজেকে প্রকাশ করতে চায় ভাষায় এবং নিজের সীমাবদ্ধতায় নিজেই লজ্জা পায়। বোকার মতো আমিও

আমার অনুভূতি সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করার জন্যে মঞ্চে উঠেছি এবং আমি যে ব্যর্থ হব তাও জানি। তবু আমি আশা করি আমাদের প্রিয় পণ্ডিতজি আমার কথা বুঝতে পারবেন।

'পণ্ডিতজি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে, তার পরিচালকবৃন্দের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে ভালবাসায় মোড়া অভিনন্দন জানাই। আমরা জানি বিশ্ববিদ্যালয় জিনিস সওদা করে না। চরিত্র গঠন করে মনের বিকাশ ঘটায়। উদ্দেশ্য সাধনে দেশের খ্যাতনামা শিক্ষকদের, দরাজহৃদয়ের মানুষকে, মেধাসম্পন্ন ছাত্রদের একত্রিত করার সৌভাগ্য তাদের আছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে চিন্তাচেতনা ও কাজ করার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হয়। কেননা, স্বাধীনতার বাতাবরণে জ্ঞান এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। জাতি গড়ার কারিগর বলে শিক্ষকদের প্রাত বিনয় ও সম্মান দেখাতে হয়। তরুণ প্রজন্মকে শিক্ষিত করার দুরূহ কাজ তারাই করতে পারে। ছাত্ররা যাতে সুখে থাকতে পারে, একাগ্রতায় পড়াশোনা ও গবেষণা করতে পারে, কর্তৃপক্ষের সেদিকে নজর রাখা উচিত। ভাল শিক্ষক ও পরিশ্রমী ছাত্রকে তারা এমন এক জায়গায় আনতে পারে, যেখানে শিক্ষকের জ্ঞান এবং ছাত্রের জ্ঞানের তৃষ্ণা, শিক্ষকের বিজ্ঞতা; ছাত্রের কল্পনা, শিক্ষকের স্নেহ; ছাত্রের শ্রদ্ধা মিলিয়ে, মন ও মননের বিকাশ ঘটে। কাজের ভিতর দিয়ে জাতীয় জীবনের উন্নতি ও শুদ্ধিকরণে তারা আগ্রহী হয়ে ওঠে।

'আমি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে আপনি তাদের ভাবনার সহযাত্রী এবং তাদের ইচ্ছাকে কার্যকরী করতে প্রয়োজনীয় সাহায্য আপনিই দিতে পারেন।

'এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তরফ থেকে আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই। তারা জনগণের সেবক এবং নিজেদের কাজের সামাজিক গুরুত্ব কতটা, তাও জানে। ছাত্রদের তারা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদ বলে মনে করে। ছাত্রদের সঠিক শিক্ষায় মানুষ করার অনির্বচনীয় আনন্দ তারা অনুভব করতে পারে। পরিপূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে শিক্ষার সুন্দর পরিবেশে কেমনভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হয়, তা তারা জানে। ছাত্রদের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্যে শ্রেণীকক্ষে অথবা খেলার মাঠে, আবাসিক জীবনে বা বিনোদনমূলক কাজে শিক্ষকরা নিজেদের উজাড় করে দিতে আগ্রহী। আপনার ব্যক্তিত্বে তারা একটি পরিশীলিত মন ও দরাজ হৃদয়ের সমন্বয় দেখাতে পায়। সমাজসংস্কারে আপনার প্রত্যয় দৃঢ় পদক্ষেপে যারা অনুপ্রেরিত হয়ে নতুন-নতুন দায়িত্ব নিতে চায়, তাদের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

'সর্বোপরি পণ্ডিতজি, যাদের উন্নতির জন্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে, সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ সেই সব ছাত্রছাত্রীর তরফ থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আপনাকে কাছে পেয়ে তাদের চোখ খুশিতে উজ্জ্বল। আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার প্রতি ভালবাসা, আপনার প্রতি আস্থা তারা সঞ্চিত ধনের মতো বহন করবে।

'স্বাধীনতা অর্জনে আপনার ত্যাগ, দাসত্ব থেকে দেশের মুক্তির জন্যে ব্যক্তিগত বিপদ উপেক্ষা করেও যে প্রয়াস আপনি নিয়েছিলেন, তার জন্যে শ্রদ্ধায় তারা অবনত। অর্জিত স্বাধীনতা বজায় রাখা এবং জনগণের চোখে স্বাধীনতার ভাবমুর্তি বৃদ্ধির জন্যে যে পরিশ্রম আপনি করছেন; তা দেখে তারা মুগ্ধ। এই কাজে আপনাকে সাহায্য করতে তারা উদগ্রীব। আপনার প্রতি তাদের ভালবাসা এবং অনুগত্য এত তীব্র, যে যৌবনের আবেগে তারা অন্য বয়স্কদের প্রতি বিরাগ হলেও, আপনার প্রতি তাদের আস্থা অটুট। সে কথা আপনি ভালভাবে জানেন। আপনাকে ঘিরে তাদের আশাআকাঙ্ক্ষা এত প্রবল যে, কোনও কারণে আপনি তাদের ওপর বীতশ্রদ্ধ হলে ভগ্নমনোরথ ছাত্ররা দুষ্কর্ম করে বসে। কিন্তু পণ্ডিতজি, আমরা বয়স্করা কি এ ব্যাপারে কম দোষী? দীর্ঘ পয়ঁত্রিশ বছর ছাত্রদের সঙ্গে থেকে একথা আমি খুব জোর দিয়ে বলছি, আমাদের ছাত্রসমাজ খুব ভাল। দেশের প্রতি ভালবাসা, দেশের সম্মান বৃদ্ধি করা, দেশের ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা, প্রতিটি বিষয়ে তারা সোনার চাইতে দামি। আমি যখন বলছি, আপনি তাদের সবচেয়ে প্রিয়, তখন আমি কোনও গোপন কথা ফাঁস করছি না। তাদের তরফ থেকে আমি আপনাকে স্বাগত জানাই। আমি জানি, তাদের হৃদয়ের আবেগের কাছে, তাদের চোখের উচ্ছ্বাসের কাছে আমার কোনও কথাই যথেষ্ট নয়।'

নিজের ঢাক পেটানো নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অবদান সম্পর্কে হোসেন কোনও কথাই বলেননি। নিজেকে তিনি দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। অবশ্য বিষয়টি বাস্তববর্জিত নয়। কেননা, সার সৈয়দ-দিবস অনুষ্ঠানের এক বছর পরেও কোনও উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি। স্তাবকতার প্রশ্ন নেই, বিষয়টিকে আমরা আদর্শসঞ্জাত বলতে পারি। বলতে পারি, অনীহা নয় হৃদয় উচ্ছ্বাস, দুঃখ নয়, আশা ও আস্থার প্রকাশ। এমনটাই আমরা দেখতে পাই 'বিচ্ছেদই স্বর্গ' এমিলি ডিকসনের এই স্ববিরোধী উক্তিতে।

কোনও কাজ অপরিচ্ছন্নভাবে বা দায়সারাভাবে শেষ করা হোসেনের একবারেই পছন্দ হতো না। এবং সত্যিকারের সন্তুষ্ট তিনি কালেভদ্রে হতেন। আমার মনে আছে, আমরা দুজনে যে কটি মুসলিম শবযাত্রায় অংশ নিয়েছি প্রতিবারই শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে তিনি আমাকে বলতেন : 'মুজিবসাহেব, আমার অন্ত্যেষ্টির সময় এমন অপরিচ্ছন্নভাবে কাজ করা হলে, আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমি কিন্তু চিৎকার করতে শুরু করব!' তিনি ঠিক করেছিলেন, অতিথির হাতে তাঁর পদত্যাগপত্র

পাঠিয়ে দেবেন। যে-সময় তাঁর পদত্যাগপত্র বিবেচনা করা হবে, সেই অবসরে তিনি সৌদি আরব ঘুরে আসার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন। তারপর আলিগড় ফিরে এসে চুপচাপ সরে যাবেন। কিন্তু তাঁর কার্যকাল তাঁর ইচ্ছামতো শেষ হয়নি। প্রধানমন্ত্রীকে বরণ ও সৌদি আরব যাত্রার মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সরব হয়ে ওঠে। শিক্ষা সংসদের সভার পা তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, 'ওদের যাহোক কিছু বলতে হবে এবং আমি তাতেই মারা যাব।' আলিগড় ত্যাগ করার প্রাক্কালে তিনি কিছু বক্তব্য রেখেছিলেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সেই বক্তব্য থেকে জানা যায়, আলিগড়ে আর কিছু ভাল হবে, সে আশা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। 1957 সালের দীক্ষান্ত-ভাষণে তিনি আলিগড় সম্পর্কে যথেষ্ট আবেগ প্রকাশ করেছিলেন। উপাচার্যরূপে কাজ করার শেষ দিকে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল, তা সংশোধন করাই ছিল এই ভাষণের মূল উদ্দেশ্য।

অন্তবর্তী সময়ে

আলিগড় ছাড়ার পর হোসেন অন্তত কিছুদিন শান্তিতে নিরুপদ্রব জীবন কাটাতে পারবেন ভেবেছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে তাঁর কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল, একমাত্র এই আশাই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু অদ্যাবধি তা বাস্তবায়িত হয়নি এবং ভবিষ্যতে হবে এমন আশা খুবই ক্ষীণ, কেননা মানসিকভাবে তিনি নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন করতে পারেন না। তাঁর যোগ্যতা ব্যাপকভাবে সমাদৃত। যোগ্য সুযোগ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা অমার্জনীয় অপরাধ।

এ জন্যেই হোসেনকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, পরিকল্পনা কমিশন এবং ইউনেসকো থেকে বাইরে রাখার আমলাতান্ত্রিক সিদ্ধান্তে সামান্য কয়েকজন সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। আলিগড় ছাড়ার প্রাক্কালে তাঁকে সম্মান জানাতে কয়েকটি বিদায়-সভা অনুষ্ঠিত হয়। ড. খালিক আহমেদ নিজামির নৈশ ভোজের নিমন্ত্রণ তিনি নেননি, বলেছিলেন, যেদিন অকপটে সব কথা বলতে পারবেন, সেদিন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন। কয়েকদিন পর সকালের উপাসনা শেষ করে, তিনি নিজামির বাড়িতে আসেন এবং তাঁকে মৌলানা আজাদের সঙ্গে আলোচনার বিষয় জানান। তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণের অনুরোধ করা হয়েছে, সেকথাও জানান। এমন দায়িত্ব তিনি আশা করেননি। তবে অনুরুদ্ধ হবার পর সেই দায়িত্ব পালনের ইচ্ছার কথাও বলেন। পরবর্তিকালে কোনও কারণ না দেখিয়া মৌলানা আজাদ তাঁর মত পরিবর্তন করেন। হোসেন আকাশবাণী মারফৎ ড. দেশমুখের ওই পদে নিয়োগের কথা জানতে পেরে অপমানিত বোধ করেন।[1] সম্ভবত কৈফিয়ৎ দেবার জন্যে শিক্ষামন্ত্রক থেকে যে ফোন এসেছিল তিনি তা ধরেননি। এরপর, তিনি যখন দিল্লি যান হুমায়ূন কবির তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানান, মৌলানা আজাদ হোসেনের সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী। জবাবে ড. হোসেন বলেন, 'মৌলনা আজাদকে বলবেন তাঁর বাড়ি থেকে

---

1. প্রধানমন্ত্রী হোসেনকে ওই পদে চাইছিলেন। সাংসদ বীরেন্দ্র আগরওয়ালার কাছে শুনেছি; প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'মৌলানা আজাদের মত পরিবর্তনের অর্থ পিছন থেকে ছুরি মারা।'

আমার বাড়ি যতটা দূরে, আমার বাড়ি থেকে তাঁর বাড়ি ঠিক ততটাই দূরে।' অনেক পরে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে দুজনের দেখা হয়। তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে, মৌলানা আজাদ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থা বিচারে একজন শক্তসমর্থ মানুষের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন। মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য হিসাবে পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের 100 বছর পূর্ণ হচ্ছে, তাদের জন্যে এক কোটি টাকার সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। এই একটা ঘটনা প্রমাণ করে চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি কতটা দূরদর্শী হতে পারতেন।

কোনও শক্ত মানুষের প্রয়োজনে বা কোনও রাজনৈতিক চাপে পড়ে মৌলানা আজাদ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করেননি। আমার মনে পড়ছে, হোসেন আমাকে বলেছিলেন, পরিকল্পনা কমিশনেও তাঁর অর্ন্তভূক্তি মৌলানা আজাদ পছন্দ করেননি। কারণ, 'তখন আমি বেশি গুরুত্ব পাব তাঁর তুলনায়।' দিল্লিতে হোসেনের প্রভাব প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা, মৌলানা আজাদ কেন চাইতেন না, সে কারণ খুঁজে কোনও লাভ নেই। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশনে তিনি সম্পদ হতে পারতেন। 1956 সালের সেপ্টেম্বর মাসে[2] রাজ্যসভায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ওপর প্রদত্ত ভাষণ থেকে এ বিষয়ে তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রগাঢ় জ্ঞানের কথা জানতে পারি। তিনি কমিশনের কাজ ও উদ্দেশ্যের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছিলেন।

পরিকল্পনা-বিষয়ক মন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি ভাষণ শুরু করেন : '...... তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি মনে করি, আমরা যে ভুল করে সাফল্য পেয়েছি, এই কথা তাঁকে জানানো দরকার। কারণ প্রথম পরিকল্পনাকালে, তথ্যের নিদারুণ খামতির কথা তার চাইতে ভাল আর কে জানে? পরিকল্পনা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ কতটা দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ ছিল, সে কথা তার চাইতে বেশি আর কে জানে? সে সময় সুনির্দিষ্ট এবং পরিপূর্ণ কর্ম-পরিকল্পনা পেশ করা কত কঠিন ছিলন, তিনি ছাড়া আর কে জানবে? পরিকল্পনা ছিল সম্পূর্ণ অস্পষ্ট। আকার অসন্তোষজনক। তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রায় ছিল না। মানুষ জানত না তারা কি করতে যাচ্ছে। অবস্থাটা ভুলের মধ্য দিয়ে সাফল্য পাওয়ার নামান্তর। আমরা এজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। দারিদ্র অজ্ঞতা অসুস্থতা সহ, সমস্ত কালো শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের লড়াই পুনরায় ভুলের মধ্য দিয়েই সফল হবে, এমন মনে করা বোকামি। প্রথম পরিকল্পন সাফল্য এসেছিল ঠিকই; কিন্তু অর্জিত সাফল্য আর বেশি সাফল্য হলো না কেন, আরও কম ত্যাগে, আরও কম অর্থব্যয়ে, সাফল্য আনা যেত কি জাতীয় তিক্ত প্রশ্নগুলিকে চাপা দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। পরিকল্পনা

---

2. রাজ্যসভার চর্তুদশ অধিবেশনে সংসদীয় বিতর্ক : চর্তুদশ খণ্ড (সেপ্টেম্বর 1-13, 1956) পাতা 3532-42

কার্যকরী করতে যে সমস্ত উপাদান প্রয়োজন তার পরিপূর্ণ ও যথাযোগ্য ব্যবহার হয়েছিল কি না জাতীয় প্রশ্ন আমাদেরই তোলা উচিত।

'অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্যে যখন একটি ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়, তখন সংসদের উচিত সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় তন্নতন্ন করে খতিয়ে দেখা। আমার সন্দেহ প্রথম পরিকল্পনাকালে তা করা হয়নি। অগ্রাধিকার নির্ধারণে কোনও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে কিনা জানতে পারলে, আমি খুশি হব। আমরা জানতে আগ্রহী; যুক্তিযুক্ত নিয়ম মেনে পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়েছিল কী? আমরা কী একে অন্যকে প্রভাবিত করে এমন যুগপৎ সমস্যার সমাধান করতে চাইছি? এই সভার বিভিন্ন বক্তার বক্তব্য শুনে ও বাইরের কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলে আমার ধারণা হয়েছে, আমরা যে কোনও রাশি থেকে শুরু করি এবং তার ফলে যা হবার তাই হয়েছে। আসলে বিষয়টি এক যুগপৎ সমীকরণ, যেখানে অনেক অজানা বিষয় আছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হলে অনেক অজানা তথ্য অজ্ঞাত থেকেই যায়। 'এরকম আর হবে না' ঘোষণা শুনতে পেলে সভা আনন্দিত ও আশ্বস্ত হতে পারত; বাস্তবে তা করা হয়নি। পরিকল্পনা ও পরিকল্পনার আকার দেখলেই এ সত্য পরিষ্কার হয়ে যায়। মৌলশিল্প প্রতিষ্ঠাই যে অর্থনৈতিক উন্নতির চাবিকাঠি, এই সরল কথাটা অস্বীকার করা হয়েছে। বুনিয়াদি শিল্পে লগ্নীর পরিমাণ যথেষ্ট কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিবহণে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমার ধারণা অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৌশলগত পরিবর্তন করা হচ্ছে। যার অর্থ, সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের ভূমিকা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। আমরা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইছি। তাই এই পরিবর্তন গভীর অর্থবহ। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহকে বেসরকারি ক্ষেত্রের ক্রীতদাসে পরিণত করা হচ্ছে। ব্যক্তি-মালিকানা ক্ষেত্রের চাহিদা বাড়াতে হবে; তাই পরিবহণের সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে আর বেশি বেশি করে রেলওয়ের সরঞ্জাম, জাহাজ তৈরি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ, লোহা, কয়লা জাতীয় দ্রব্যাদি উৎপাদনে সচেষ্ট হতে হবে। বেসরকারি ক্ষেত্রে যন্ত্রাংশ রাসায়নিক দ্রব্যাদি সার প্রভৃতি উৎপাদন করতে হবে। তারা যাতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র থেকে কম দামে প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল জোগাড় করতে পারে দেখতে হবে। যদিও সরকারি সংস্থাসমূহ দেশের উন্নতিতে যোগ্য ভূমিকা পালন করছে না। সম্ভবত, পরিকল্পনা রূপকারদের মাথায় এই কথাটাই কাজ করছে; যদি না ইতিমধ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য থেকে আমরা বিচ্যুত হয়ে থাকি। বিশেষভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশের জন্যে যেখানে রাষ্ট্রীয়করণের কথা বিশেষভাবে ভাবা হয়েছে, সেখানে বেসরকারি ক্ষেত্রের এই গুরুত্ব অত্যন্ত ক্ষতিকর, সবচেয়ে মজার ব্যাপার, সাধারণভাবে উন্নতির যে ঘোষিত নীতি, তা অপরিবর্তিত রয়েছে। কার কার মনে অস্পষ্ট ধারণা আছে, এমন

ভাষায় বলা যায় সমাজতন্ত্রের প্রথম দিকে অত্যন্ত কৌশলে ধনতন্ত্র তাকে শোষণ করে। অতএব সমাজতন্ত্রকেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। নিজের স্বার্থ বিষয়ে একজন পুঁজিবাদি সর্বদা সচেতন। মুনাফা সম্পর্কে তার লালসা অপরিসীম। তার সমর্থনে শুধু এটুকু বলা যায়, সে শিল্পটাকে চেনে, মুনাফাটা ভালই বোঝে। সেজন্যে আমাদের খুব সতর্ক হতে হবে। আপনারা একটা কঠিন পরীক্ষা করছেন, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কথা ভাবছেন, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইছেন। এমন পরিস্থিতিতে পরিকল্পনার প্রাথমিক স্তরেই রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকে পুঁজিবাদির ক্রীতদাসে পরিণত করলে পরিণতি ভয়াবহ হবে, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থা ব্যাহত হবে।

'বাড়তি কিছু বিপদ আমি দেখতে পাচ্ছি। 4800 কোটি টাকার খরচ যেভাবে জোগাড় করা হবে, তার মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা আছে। বাজেট বরাদ্দ আছে 1200 কোটি, ধার করা হবে 1200 কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট, 800 কোটি টাকা বিদেশি সাহায্যের কথা বলা হয়েছে। অবশিষ্ট 400 কোটি টাকা কোথা থেকে আসবে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই। ধার এবং ঘাটতি অর্থনীতির পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর। ঘাটতি সামলানো সম্ভব অধিক উৎপাদনে খাদ্যশস্য উৎপাদনে ভারতে বৃষ্টির গুরুত্ব অপরিসীম। সেজন্যে ফসলের হার যথেষ্ট কম-বেশি হয় বিভিন্ন বছরে। এদিকে আমাদের নজর রাখা উচিত। খাদ্যশস্য উৎপাদন কি হওয়া উচিত ভেবে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেওয়া যায় না। 1200 কোটি টাকার ঘাটতি অর্থনীতির মানে বছরে শতকরা 75 ভাগ বেশি নোট (কাগুজে টাকা) ছাপানো। পরিকল্পনার যে পরিকাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছে, আমার ধারণা তার ফলে জাতীয় আয় শতকরা পাঁচ ভাগও বাড়বে না, খুব বেশি শতকরা তিন ভাগ বৃদ্ধি হলেই আপনাদের সন্তুষ্ট হতে হবে। 75% নোট ছাপানো বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় আয়ের এই সামান্য বৃদ্ধির অর্থ, আবার বিদেশিদের কাছে হাত পাতা। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অর্থ বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি। ফলে বিনিয়োগ কমতে বাধ্য। বিনিয়োগ কম হলে জাতীয় আয়ও কম হবে। ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দেশের মানুষের মনে উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। তাদের ধারণা হয়েছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হবে, গৃহীত হবে নানান কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড। এই অবস্থায় বিনিয়োগ কম হলে, মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়লে হতাশা দেখা দেবে। মানুষের মোহভঙ্গ হবে। সেই অবস্থা সরকার কেমন করে মোকাবিলা করবে; জানি না। ব্যক্তিপুঁজি সুচতুর ভাবে চেষ্টা করছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে পঙ্গু করতে। এ ধরনের অনিশ্চিত অবস্থায় তখন অবাধ নীতির দাবি জোরদার হবে। পরিকল্পিত অর্থনীতিকে পদে-পদে বাধা দেওয়া হবে। গণতন্ত্রে অবশ্যই যে কোনও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা যায়। গণতন্ত্রের সার্থকতা সম্পর্কে এ কথা বলা হয়। কখনও কখনও গণতন্ত্র দূরের জিনিস দেখতে পায় না। এবং একটি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে

মোহহীন হলে গণতন্ত্রে যা কিছু করা হয়েছে, সবই অস্বীকার করা হয়। ব্যক্তি পুঁজিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা হতে পারে তখন।

'আমি মনে করি সম্পদ সংগ্রহে সাহসী প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে এই সমস্ত আশঙ্কার কোনও কারণ থাকত না। সম্পদ আরও বেশি সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল। ভারতবাসীর দারিদ্র, অনাহার-সীমা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। দারিদ্র বাস্তব সত্য, আমাদের সে কথা মনে করিয়ে দেবার দরকার নেই। একমাত্র অন্ধ ব্যক্তিরা আমাদের দেশের দারিদ্র দেখতে পায় না। কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, দারিদ্রকে চিরস্থায়ী করার জন্যে অনেক সময় দারিদ্র ও অনাহার-সীমাকে ব্যবহার করা হয়। এ দেশে দারিদ্র্য আছে ঠিকই, কিন্তু সে দারিদ্র মেহনতি মানুষের। বিত্তবান মানুষ যারা জাতীয় আয়ের 23 শতাংশ সৃষ্টি করে, তাদের নয়। শতকরা হিসাবে যা যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সমতুল্য। এই অবস্থায় বেশি সম্পদ সংগৃহীত না হবার কোনও কারণ আমি অন্তত দেখছি না। জাতীয় আয়ের অন্তত 15 শতাংশ উন্নয়নমূলক কাজের জন্যে বরাদ্দ করা যায়। এই পরিমাণ অর্থ যদি সৃষ্টিমূলক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, তাহলে বৃদ্ধির হার অনায়াসে পাঁচ শতাংশের পরিবর্তে 10 শতাংশে হতে পারে। আমাদের বর্তমান হিসাবপদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ এবং ভ্রান্ত। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অত্যন্ত শিথিল। অর্থনীতিতে সাযুজ্যতাহীন বিনিয়োগ এবং যে কোনও ভাবে বরাদ্দ অর্থ খরচ করার প্রবণতার জন্যে পণ্য উৎপাদনের তুলনায় ব্যয় অনেক বেশি হয়। জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়বে। ফলে অধ্যাপক শিক্ষক সরকারি চাকুরে প্রভৃতি নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ, যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হবেন। অথচ এরাই সভ্য সমাজের সঙ্গে বর্বর সমাজের পার্থক্য করে। কাউকে ভয় দেখাতে একথা বলছি না। মুদ্রাস্ফীতির প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে। আমি মনে করি, এখানে তা উল্লেখ করা দরকার। কেননা দারিদ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অপর নাম পরিকল্পনা। যুদ্ধে যে কোনও অবস্থার জন্য তৈরি থাকতে হয়। কোনও ঘটনা ঘটে যাবার পর পরিকল্পনা করে লাভ নেই, কেননা তখন তার তা কার্যকরী হবে না। পরিকল্পনা রূপকারদের যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তৈরি থাকা দরকার। আমি মনে করি, প্রয়োজন বোধ করলেই চালু করা যাবে এমন একটি প্রগতিশীল অথচ কঠিন কর-কাঠামো তৈরি রাখা দরকার। খাদ্য বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রয়োজনে সরকারি বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। ব্যবস্থাগুলি খুবই ভাল। কিন্তু, আপৎকালীন অবস্থায় কোনও কিছু না ভেবে পরিকল্পনাহীন ভাবে চালু করলে, এই ব্যবস্থা ক্ষতিকর হতে বাধ্য। যদি ঠিকমতো ভাবনাচিন্তা করা হয় তাহলে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি কার্যকরীভাবে আটকানো যায়।

'শেষে আমি শিক্ষাসংক্রান্ত দু-একটা কথা বলব, আমি যতদূর বুঝেছি পরিকল্পনা জাতীয় লক্ষ্য সাধনের একটা মাধমে। 6-14 বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রশ্নে

যত সুনির্দিষ্টভাবে জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে, এমন গুরুত্ব দিয়ে অন্য কোনও ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়নি। 6-14 বছরের শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসার নির্দেশ আমাদের সংবিধানে আছে। কত মাইল রেলপথ হবে, কত টন ইস্পাত উৎপাদনে হবে, সে ব্যাপারে বা অন্য কোনও বিষয়ে এমন সুনির্দিষ্ট নির্দেশ নেই। আর পরিকল্পনা কমিশন ইচ্ছাকৃতভাবে নির্লজ্জের মতো সংবিধানের সেই নির্দেশ অমান্য করেছে। আমি মনে করি-এর চাইতে ক্ষতিকারক আর কিছু হতে পারে না। একটি লক্ষ্য, একটি সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিলে সন্নিবেশিত হলো। সেই দলিল সামনে থাকা সত্ত্বেও এমন একটা নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে যার ফলে আগামী 15 বছরেও 6-14 বছরের শিশুদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যাবে না। আমি জানি সার্জেন্ট -প্রকল্পে বলা হয়েছে সকলের জন্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে 40 বছর লাগবে। স্বাধীনতার পরে এই প্রশ্নে আমরা যথেষ্ট বিপর্যস্ত ছিলাম। আমার মনে পড়ছে, এই প্রশ্নে মর্মস্পর্শী বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ বলেছিলেন, এ আমাদের জাতীয় লজ্জা। আমাদের দাস-মনোবৃত্তির জন্যে শিক্ষার সামান্য সুযোগ দেওয়া হবে চল্লিশ বছর ধরে। তিনি বলেছিলেন, এ কাজ দশ বছরে করা যায়। কিছু সন্দেহবাতিক বিশ্বনিন্দুকরা তখন বলেছিল, কুড়ি বছর পরেও আমরা দশ বছর না কুড়ি বছরে করা সম্ভব, নিয়ে বিতর্ক করব। সে অন্য কথা। দশ বছরের মধ্যে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় 6-14 বছরের শিশুদের আনা হবে এই ছিল জাতীয় ইচ্ছা। অথচ পরিকল্পনায় এ বিষয়ে কোনও উল্লেখ নেই। শুদু তাই নয়, শিক্ষাকে বিমাতৃসুলভ দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। জাতীয় জীবনে, জাতীয় অর্থনীতিতে এই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব কত অপরিসীম, সেই প্রশ্নে আমি যাচ্ছি না কেননা তা স্বতঃসিদ্ধ। বুনিয়াদি শিক্ষা কমিটি সাত বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলেছিল। সার্জেন্ট-কমিটি আট বছরের। তারা এক বছর বেশির সুপারিশ করে। প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন আট বছর সাত বছরের চাইতে ভাল। এক্ষেত্রে ভারতবাসীর সঙ্গে চালাকি করা হয়েছিলো। আট বছরকে পাঁচ বছর ও তিন বছর এই দুই পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছিল। যার ফলে, প্রত্যেকেই পাঁচ বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা ভাবতে শুরু করে। বুনিয়াদি শিক্ষা কমিটি কিন্তু তা চায়নি। সময়সীমা অন্তত সাত বছর হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখন দেশের সকলে যখন আট বছরের পক্ষে মত দিয়েছে; আট বছরই হওয়া উচিত। কিন্তু পরিসংখ্যান থেকে দেখতে পাচ্ছি, সবাই চাইছে বাধ্যতামূলক শিক্ষা এগারো বছরে শেষ হোক। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সুপারিশপত্রের 501 পাতায় বলা হয়েছে, 6-11 বছরের স্কুলে যাওয়া ছেলেমেয়ের সংখ্যা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তুলনায় 25% বেড়েছে। 25% বৃদ্ধি খুব সন্তোষজনক নয়, কিন্তু এই বৃদ্ধি 6-11 বছরে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। আসলে এগারো থেকে চোদ্দো বছর পর্যন্ত

স্কুলে পড়ুয়া শিশুদের সংখ্যা বর্তমানে পথম পঞ্চবার্ষিকীর তুলনায় অনেক কম। কী প্রবঞ্চনা!'

হোসেনের প্রশ্নগুলি জনসাধারণের নজর কেড়েছিল। সংবাদপত্রে সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। জনমত সংগঠিত হয়েছিল। কেন এমন হচ্ছে, সরকার কেন নীরব প্রভৃতি প্রশ্ন তুলে সংবাদপত্রে বহু চিঠি ছাপা হয়। হোসেনের তরফে প্রকাশ্যে মতামত ব্যক্ত করার এই ছিল প্রথম এবং শেষ উদাহরণ। জামাই খুরশিদ আলম খানকে তিনি বলেছিলেন, এই বক্তব্য রাখার আগে প্রধানমন্ত্রী রাজ্যসভায় তাঁর ধারাবাহিক নীরবতার কারণ জানতে চান। জবাবে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বলেন : 'আমি আর কি বলব? প্রশংসা বা সমালোচনা করতে পারি। দলে প্রশংসা করার অনেক লোক আছেন। আর সমালোচনা করলে আমি অপরাধী বলে বিবেচিত হতে পারি।' কিন্তু, সংসদীয় বির্তক অংশ না নেবার জন্য তাঁর এই বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী গুরুত্ব দেননি। সেইজন্যেই রাজ্যসভায় তিনি এই বক্তব্য রেখেছিলেন। বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সৌজন্য দেখিয়ে তিনি যদি নিজেকে সংযত না রাখতেন, তাহলে রাজনৈতিক বিতর্ক কি বিপুলভাবে সমৃদ্ধ হতে পারত, এই ভাষণ থেকে তা সহজেই বোঝা যায়।

যে ভাবে হোসেনকে ইউনেসকোর সভায় অংশ নিতে হয়েছিল তা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এবং আমলাতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রতীক। ইউনেসকোর সাধারণ সভায় ভারতের প্রতিনিধি নির্বাচন কার্যত পিঠ-চাপড়ানো ব্যাপার। যদিও নীতিগত ভাবে যোগ্যদের মধ্য থেকে এ কাজ করার কথা। প্রতিনিধি দলের সংহতির দিকে নজর না দিয়ে, প্রতিবার বিভিন্ন ব্যক্তিকে সদস্য মনোনীত করে জাতীয় স্বার্থ কতটা চরিতার্থ করা যাবে, এ প্রশ্ন কখনও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়নি। ড. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে প্রথম প্রতিনিধি দলে অধ্যাপক সায়াউদ্দিন ও হোসেন ছিলেন। তাঁরা তিনজনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পেরেছিলেন। তারপর দীর্ঘ এগারো বছর হোসেনের কথা কারও মনে ছিল না। 1956 সালে কৌশলগত কারণে তাঁকে সদস্য করা হয়েছিল।

দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ইউনেসকো সম্মেলনের সাধারণ সভায় সে-বছর ভারতীয় প্রতিনিধি দলের বেসরকারি মুখপাত্র ছিলেন হোসেন। তাঁর বক্তব্যের উপসংহার উল্লেখযোগ্য :

'আগামী দু বছরে যে তিনটি বৃহৎ প্রকল্পের কথা বলা হয়েছে, আমরা ভারতীয় প্রতিনিধি দল তা সমর্থন করছি। সাধারণভাবে তিনটিতে, বিশেষ করে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পারস্পরিক উপলব্ধিতে আমরা বিশেষ আগ্রহী। অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের কাছে প্রস্তাবের অনিশ্চিত অবস্থা গুরুত্ব পাবে। বলা হয়, পূর্ব ও পশ্চিমের কোনও ভৌগলিক সীমারেখা নেই। উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে — উঁচু জমি এবং নিচু জমি, শীতপ্রধান এবং গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ রকম পার্থক্য আছে। পূর্ব ও পশ্চিমের কোনও বিভাজন রেখা নেই, নেই কোনও নির্দিষ্ট সীমান্ত। কিন্তু কার্যত ভৌগলিক ব্যবধানের কথা বলা হচ্ছে না। সংস্কৃতি রাজনীতি ও সামাজিক অবস্থানে, ব্যক্তি ও সমাজের সংজ্ঞা, সভ্য সমাজ গড়ার অঙ্গীকারে এবং সামাজিক মূল্যবোধের বাতাবরণে এই পার্থক্য বর্তমান।

'পূবের মহত্ত্ব তার মূল্যবোধে, পশ্চিমের মহত্ত্ব তার কৌশলে। এই বক্তব্য নিশ্চয় খুব শ্লাঘার বিষয় নয়। আজকের পৃথিবীর আধুনিক জীবনযাত্রা; এই জাতীয় বক্তব্যের যতটুকু সারবত্তা আছে, তাও মুছে ফেলতে চাইছে। আজকের পৃথিবী যুক্তিযুক্ত কৌশল ও নৈতিক শক্তির সমন্বয় দেখতে চায়। সন্ন্যাসী ও সাহসী বীর — বুদ্ধ ও সিগফ্রিডকে একত্রিত দেখতে চায়। মানবসমাজ ক্রমশ নৈতিক মূল্যবোধে নিয়ন্ত্রিত যুক্তিপূর্ণভাবে সক্ষম জীবনযাত্রা রপ্ত করছে। অর্থাৎ, আধুনিক জীবনের বিবর্তনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তির পরস্পরকে বোঝা এবং পরস্পরের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

'এজন্য ভারতীয়রা মনে করেন ইউনেসকোর প্রস্তাবিত প্রকল্প যথাযথ ও যুক্তিপূর্ণ। ব্যাপক কর্মকাণ্ডে আমাদের শক্তি খুবই সীমিত। সেজন্যে এমন ব্যবস্থা নেওয়া দরকার যাতে যেখানে যা কিছু উন্নতি হয়েছে, তার পরিপূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব এবং বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই আমাদের সীমিত সামর্থ্য প্রয়োগ করা যায়। এই প্রকল্পের বিশেষজ্ঞরা যে-সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবেন একটি কমিটি তা কার্যকরী করতে সক্ষম হবে।

'অনেক সময় নিয়েছি। যে দুঃখজনক পরিস্থিতিতে আজ আমরা এখানে মিলিত হয়েছি, সে বিষয়ে দু-একটি কথা উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করব। 1945 লন্ডন সম্মেলনে ইউনেসকোর সংবিধান গৃহীত হয়। সে সম্মেলনে আমি উপস্থিত ছিলাম। পৃথিবী সবেমাত্র যুদ্ধের ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছে। এই বিপর্যয় যাতে আর না হয়, সেজন্যে সারা পৃথিবী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। মানুষের মনে শান্তির বাতাবরণ তৈরি করার জন্যে এই সংগঠন গড়া হয়। যা কাজ হয়েছে, তার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। সাম্প্রতিককালে লজ্জাজনক আগ্রাসন, আমাদের নতুন মানবসমাজের ধারণাকে আঘাত করেছে। তাছাড়া মিশর ও হাঙ্গেরিতে যা হচ্ছে, তাতে মনে হয় মানুষের মনে শান্তির ধারণা আজও অস্বচ্ছ এবং অস্পষ্ট।

'শিক্ষামূলক সংস্থা আমাদের। পৃথিবীতে মাত্র দুজনই কোনও অবস্থাতে আশা ত্যাগ করে না। একজন মা তার সন্তানের ওপর, একজন শিক্ষক তার ছাত্রের ওপর। এরা পরস্পরের ওপর সর্বদাই ভরসা রাখে। আমরা নিরাশ হব না, আমরা পরিতৃপ্ত হতে পারি না। আমাদের সংস্থা সরকার-নির্ভর। সরকার সব সময়ই সরকার। আমাদের মনে রাখা দরকার, আমাদের সংবিধানের মুখবন্ধে আছে : 'বিভিন্ন দেশের সরকারসমূহ যারা এই সংবিধানের অংশীদার, তাদের জনগণের পক্ষ থেকে ঘোষণা

করছে ....।' আমাদের সরকারগুলি যে নির্দেশ অমান্য করছে না, তা দেখার জন্যে জনগণের কাছে আমরা দায়বদ্ধ। এই সভায় আমরা যদি বিশ্ববিবেকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারি, তাহলে আমরা নিজেদের বিবেকের কাছেও পরিষ্কার থাকব।

'শিক্ষক বৈজ্ঞানিক শিল্পী বুদ্ধিজীবী নেতা, প্রত্যেকেরই শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে দেখা উচিত মানবসমাজ যাতে বর্বর না হয়। আমি আশা করি, এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন; তাঁরা কেউ সে দায়িত্ব অস্বীকার করবেন না।'

হোসেন 1956 থেকে 1958 ইউনেসকোর কার্যনির্বাহী সভার সদস্য ছিলেন। দুটি সভার আলোচনা থেকে, নীতির ধারাবাহিকতার গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু প্রায়শ দেখা যায় ব্যক্তিকে খুশি করতে নীতিকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। অযোগ্য লোককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ইউনেসকোর সভায় হোসেনের উপস্থিতি, তাঁর বাগ্মিতার নিদর্শন অনেকটা প্রমোদভ্রমণের মতো। তাঁর ক্ষমতার স্থায়ী ও পরিশীলিত প্রয়োগ নয়।

মাতৃভূমির ভাবমূর্তি গঠনে

এক : বিহারের রাজ্যপাল

1957 সালে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা[1] যখন তাঁকে বিহারের রাজ্যপাল নিয়োগ করেন সে সময় গান্ধিজি ইয়োরোপে ছিলেন। তাঁর চোখে অস্ত্রোপচার করা হয় এবং তিনি বাদ কিসিনজেনে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তাঁর ঠিকানা জানেন, এমন একজনকে অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাঁর কাছে তারবার্তা পাঠানো হয়। তিনি অত্যন্ত শান্তভাবে বিষয়টি নেন। দিল্লি ফিরে তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবেন বলে জবাব দেন। তিনি নিশ্চয় এই সময়ে বিষয়টি সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা করেন, দেশে ফিরে তাঁর সম্মতি জানান। 1957 সালের 6 ডিসেম্বর তিনি বিহারের রাজ্যপালরূপে দায়িত্বভার নেন।

সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক জায়গায় নিযুক্ত করা রাজনীতিকদের অন্যতম পরীক্ষা। সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও হোসেনকে রাজ্যপালের মতো প্রকৃত ক্ষমতাহীন সাংবিধানিক পদে প্রতীকী নিয়োগ করা সঠিক কিনা, সে প্রশ্ন উঠতে পারে। মনে হয়, প্রধানমন্ত্রীর কাছে রাজনৈতিক বিচারই গুরুত্ব পেয়েছিল। বিহারের শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে তখন মতবিরোধ ছিল। সেই বিরোধ মীমাংসায় হোসেনের মতো নিরপেক্ষ ও সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল। শোনা যায়, হোসেনের নিয়োগে আপত্তি করেছিলেন এমন একজনকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাকির হোসেনের যোগ্যতার সঠিক ব্যবহার করা হয়নি এবং রাজ্যপাল হিসাবে তিনি সফল হবেন। আসল কারণ, হোসেনের প্রতি অশেষ আস্থা থাকলেও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তাঁর জন্যে বিশেষ কিছু করার ছিল না। 1958 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মৌলানা আজাদের মৃত্যুর পর, হোসেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হচ্ছেন বলে গুজব রটে হোসেনের কাছ থেকেই শুনেছি, সে-সময় তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ হলেও এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে কোনও কথা বলেননি।

সরকারের পছন্দ এবং তাঁর সে পদ গ্রহণ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলতে পারেন একমাত্র হোসেন। তাঁর মেজাজ ও মর্জি অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। তাঁর মনের কথা বেশি লোকে জানুক, তিনি পছন্দ

---

1 বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি মৌলানা আজাদ এ প্রস্তাবে খুশি ছিলেন না।

করতেন না। আমরা সেজন্যে সমস্ত সম্ভাবনাগুলি আলোচনা করে একটি ধারণায় পৌঁছতে পারি।

হোসেন বুঝতে পেরেছিলেন, সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে তিনি অংশ নিতে পারবেন না। দলের স্বার্থে নিজের আদর্শ ও লক্ষ্যকে জলাঞ্জলি দিতে হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমালোচনায় তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা বন্ধ করতে হবে। এর অর্থ, আত্মপ্রবঞ্চণা, যে কোনও ক্ষমতা এবং সম্মানের তুলনায় বড় বেশি মহার্ঘ। তিনি বিকল্প পথে রাজনীতি থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত, নিলেন, বলা যায় চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। অব্যর্থ কৌশলে তিনি যে কোনও বিতর্ক এড়াতে পারতেন। গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক যে কোনও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারতেন। প্রতিটি কাজে সততা যোগ্যতা ও ক্ষমতার ছাপ রাখতে পারতেন। প্রতিটি গণতন্ত্র সব সময় এমন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন অনুভব করে। একজনের ক্ষমতা ও আত্মত্যাগ, সে লক্ষ্যে পৌঁছবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। গণতন্ত্রে কোনও কাজ গুরুত্ব সহকারে করতে গেলে সহমতাবলম্বী সহকর্মীদের সমর্থন অবশ্য প্রয়োজন। তিরিশ বছর ধরে শিক্ষাজগতে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে হোসেন বুঝতে পেরেছিলেন, এই সমর্থন সংগ্রহে তিনি অপারগ। তা সত্ত্বেও, হয়তো চেষ্টা করতেন কিন্তু দুর্বল হৃদ্‌যন্ত্র, বহুমূত্র রোগ, চোখের ছানির জটিল অবস্থা তাঁকে কঠিন পরিশ্রম করতে দিত না। তাঁর উদ্যোগ সাহস ও স্বপ্নের কোনও মনগড়া খামতির জন্যে নয়, তাঁর শরীরে বিভিন্ন রোগের সুস্পষ্ট আনাগোনার জন্যে তিনি রাজ্যপালের আলংকারিক পদগ্রহণে সম্মতি জানান।

তাছাড়া তাঁর প্রকৃতিও এমন একটা পদ গ্রহণে সাহায্য করেছে। তিনি সব সময় পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারতেন। এই গুণের জন্যে তিনি অন্যান্য গুণমুগ্ধদের অনেকের ধারণা যথেষ্ট কারণ ছাড়াই তিনি খুব তাড়াতাড়ি সক্রিয় জীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। এজন্যে, তারা ক্ষোভ প্রকাশও করেন। বুঝতে পারেন না, রাজ্যপাল পদ গ্রহণ করে তিনি ঈশ্বর নির্দেশিত পথই বেছে নিয়েছেন, তাঁর প্রকৃতিতে মানানসই কাজ গ্রহণ করে নিজের চারপাশে ব্যক্তিত্বের মহিমা তৈরি করেছিলেন।

1957 সালের 7 জুলাই বিহারের রাজ্যপাল হিসাবে হোসেন শপথ গ্রহণ করেন। রাজ্যবাসীদের প্রতি এক আবেদনে তিনি বলেন : 'বিহারের ভাই ও বোনেরা, আজ দুপুরের কিছু আগে রাজ্যপালের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। সংবিধানের প্রতি অনুগত থাকার ও দেশের মানুষের উন্নতি নিজের শক্তি নিয়োগ করার শপথ নিয়েছি ঈশ্বরের নামে। আপনাদের কাছে সেই একই প্রতিজ্ঞা করছি। এই কাজে আপনাদের সহযোগিতা ও সমর্থন আশা করছি।

'বিহারে তথা সারা দেশে শোকের মধ্যে এ দায়িত্ব আমি নিয়েছি। আজ আমরা একজন প্রবীণ নেতা ও দীর্ঘদিনের সহকর্মীকে হারিয়েছি। অনুগ্রহ বাবু[2] সারা জীবন বিহারের সেবা করে গেছেন। গান্ধিজির চম্পারন আসার সময় থেকে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অনলস ভাবে বিহারের উন্নতির জন্যে কাজ করে গেছেন। তাঁর শূন্যতা পূরণ করা কঠিন। অনুগ্রহের সংগ্রাম কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। কর্মঠ মানুষের মধ্যে মহান ব্যক্তিত্বরা বেঁচে থাকেন। একজন কর্মবীরের মৃত্যুর পর সহকর্মীরা তার আরব্ধ কাজের দায়িত্ব নেন। সংগ্রাম চলতেই থাকে। স্বাধীনতার জন্যে লড়াই কঠিন, কিন্তু তার চেয়ে হাজারগুণ কঠিন স্বাধীনতা বজায় রাখা ও স্বাধীনতাকে পুনর্গঠনের কাজে ব্যবহার করা। আজ এই শোকের দিনে অঙ্গীকার করছি, সেই হাজারগুণ কঠিন কাজ করার জন্যে নিজেদের উৎসর্গ করব। বিহারকে ভারতের চোখের মণির মতো করে গড়ে তুলব। আমাদের সততা সদিচ্ছা নিঃস্বার্থ সেবার সাহায্যে আমরা রাজ্যটিকে দেশের গর্ব হিসাবে গড়ে তুলব। ভারতকে সৎ বিশ্বস্ত ও ধার্মিক মানুষের দেশ করার কাজে আমরা সামিল হব। অন্য দেশকে ধ্বংস করে নয়, তার হাত ধরেই আমরা জীবনের জয়গান গাইব। আমাদের শক্তি একই রকম শক্তিশালী অন্য দেশের সম্ভ্রম আদায় করবে, দুর্বল দেশগুলি আমাদের ভয় পাবে না; আমাদের ওপর আস্থা রাখবে। আমরা সকলেই যদি এমন চিন্তা করি তাহলে অনুগ্রহবাবুর সারা জীবনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে না।

'প্রতিবেশী রাজ্য উত্তরপ্রদেশ থেকে আমি এসেছি। বিহার আমাকে আগন্তুক মনে করতে পারে, কিন্তু বিহার আমার অজানা নয়। বিহারের মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক দিন ধরেই চিনি এবং গুরুজন হিসাবে তাঁকে শ্রদ্ধা করি। অনুগ্রহবাবু আর আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু গতকাল মৃত্যুর ঘণ্টা তিনেক আগে যখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়, তখন তাঁর চোখে খুশির যে ছোঁয়া দেখেছিলাম, তা আমি কোনওদিন ভুলব না। এছাড়া, আরও অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিকে জানায় সুযোগ আমার হয়েছে। আমার মনে পড়ছে, জামিয়া মিলিয়ার গোড়ার দিকের কথা। যখন ব্রিটিশ শক্তির ভয়ে মানুষ আমাদের সমর্থন করতে শঙ্কিত হতো। সে সময় হাকিম আজমল খানের সঙ্গে বিহারে এসেছিলাম। বিহার সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল। জামিয়া মিলিয়া নাম করা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু প্রথম দিকের কঠিন দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে। বিহার তখন আমাদের পাশে ছিল। আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ না থাকলেও, আমি মনে করি বিহার ভারতের প্রাণকেন্দ্র। প্রাচীন ইতিহাসে দেখতে পাই 900 বছর ধরে মগধ মানেই ভারত। প্রাচীনকালের রাজনৈতিক গুরুত্বের নিদর্শনগুলি আজও আছে। শুধু অতীতে নয়, আজও বিহার ভারতের বৃহত্তম রাজ্যগুলির অন্যতম। এ রাজ্যের

---

2. অনুগ্রহনারায়ণ সিনহা বিহারের মন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মতপার্থক্য উত্তেজনাময় ছিল।

প্রশাসন খুবই ভাল। বিহারের মাটির নিচের সম্পদ উদ্যোগীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বিহারের দামোদর কোশি গঙ্গা নদী-পরিকল্পনা যখন সম্পূর্ণ হবে, তখন সারা দেশের ছবি বদলে যাবে। আমাদের সিন্দ্রি ও জামসেদপুর আছে। সংক্ষেপে বলা যায়, বেশ কিছু কাজ হয়েছে; আরও অনেক কাজ করতে হবে। সাহস ও উচ্চাশার প্রয়োজন। বেশি প্রয়োজন সততা ও দক্ষতা ও সহযোগিতার। যতক্ষণ না দেশের প্রতিটি মানুষ খেতে পারছে, প্রত্যেকে বস্ত্র ও আশ্রয় না পাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত নিরলস কাজ করে যাবার প্রত্যয় চাই।

'আমি আশা করি আগামী দিনে দেশের উন্নতিতে বিহার গৌরবজনক ভূমিকা পালন করবে। বিহারের অতীত সম্পর্কে লজ্জিত হবার কিছু নেই। আপনাদের কাছে আমি ঘোষণা করছি, বিহারের উন্নতির জন্যে আমি প্রার্থনা করব, সাধ্যমতো কাজ করব। প্রার্থনা কর্মে সাফল্য আনে। কর্মকাণ্ড প্রার্থনায় অনুপ্রেরণা দেয়।'

হোসেনের কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া পাণ্ডুলিপির অনুবাদ এটি। সম্ভবত ভাষণের প্রাক্কালে ভাষার পরিবর্তন করা হয়েছিল, সেখানে মূল সুরের কোনও পরিবর্তন হয়নি। যে অনুষ্ঠানে এই ভাষণ দেওয়া হয়েছিল, সেখানে কোনও সমালোচনা করা যায় না। সমালোচনা করার কারণ ঘটলে পরে অবশ্যই তা করা যায়। দেশ ও মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলে সমালোচনা আত্মসমালোচনা হয়ে প্রতিভাসিত হয়। সমসমায়িক ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে বিহারের ভূমিকা বড় করে দেখা হয়েছে। নিজের স্বাভাবিক ঢঙেই জাকির হোসেন লিখেছেন, প্রথমবার এমন লেখা হয়েছে তাও নয়, সম্ভবত জেনেশুনেই লেখা হয়েছে। অতীত বা সাম্প্রতিক কোনও ঘটনার উল্লেখ করে তিনি সব সময় চেষ্টা করতেন, মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা বাড়াতে। জামসেদপুর ও অন্যান্য সরকারি প্রকল্পগুলি বিহারে অবস্থিত এবং বিহারের মানুষ সেগুলি তাদের নিজস্ব বলে ভাবতেই পারে।

হোসেন যখন রাজ্যপাল নিযুক্ত হন তখন রাজ্যপালের ক্ষমতা ও ভূমিকা নিয়ে কোনও সাংবিধানিক প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু একজন রাজ্যপালের দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিত্ব রুচি যথেষ্ট ব্যবধান করতে পারে। শ্রীমতী নাইডু যখন উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল ছিলেন, তখন এক রকম অবস্থা ছিল আবার, ড. কে এম মুনসি যখন রাজ্যপাল হন, তখন আর এক অবস্থা। বিহারের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে হোসেন যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। প্রকৃতিগতভাবে তিনি শান্ত এবং দক্ষ মধ্যস্থকারী ছিলেন। রাজনীতি থেকে দূরে থেকেও এই চারিত্রিক গুণের জন্য তিনি রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতাদের ওপর প্রভাব বিস্তার সক্ষম হয়েছিলেন।

আগে থেকে ঠিক করা সাক্ষাৎপ্রার্থীদের তালিকা দেখে হোসেনের ব্যস্ততা বোঝা সম্ভব নয়, তবে তালিকাটি যথেষ্ট ব্যাপক ছিল। সাক্ষাৎপ্রার্থীদের মধ্যে রাজনীতিবিদ প্রশাসনিক আধিকাররিক উপাচার্য অধ্যাপক শিক্ষক লেখক ধর্মীয়

সাংস্কৃতিক সমাজকল্যাণ-মূলক, পেশাদারি সংস্থার প্রতিনিধিগণ, বিদেশি অতিথি, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনরা থাকতেন। প্রায় সব রাজ্যপালের কাছে এ ধরনের সাক্ষাৎপ্রার্থীরা আসেন। একইভাবে আনুষ্ঠানিক ও লৌকিকতাবর্জিত ভোজসভায় যোগ দিতে হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে হয়, বিভিন্ন সভায় ভাষণ দিতে হয়। পার্থক্য যা কিছু, দৃষ্টিভঙ্গিতে। হোসেনের কাছে যে কোনও অনুষ্ঠান ছিল সৌজন্য ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার উৎকর্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যম। আনুষ্ঠানিকতা ও সরকারি আচরণবিধির আড়ালে তাঁর ব্যবহার ছিল আদবকায়দা বর্জিত, বন্ধুত্বপূর্ণ। তাঁর সৌজন্যের হাসি সাক্ষাৎকারকে সহজ সরল ও স্বাভাবিক করে তুলত। রাজ্যপালের এমন ব্যবহার মহিমামণ্ডিত বলে মনে হতো প্রত্যেক সাক্ষাৎপ্রার্থীর। অধিকন্তু সাক্ষাৎপ্রার্থীরা দেখত তাদের বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে তিনি তাদের চাইতে বেশি না হলেও তাদের মতোই ওয়াকিবহাল। অথবা, সাক্ষাৎপ্রার্থীরা যেমন আশা করে তেমন প্রজ্ঞা ও সত্যিকারের অনুসন্ধিৎসা তাঁর আছে, ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানিক সমস্যা অনুধাবন করে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও বা করণীয় কাজ সম্পর্কে উপদেশ দিতে পারেন। স্ব-আরোপিত দায়বদ্ধতার জন্যে কি কঠিন মানসিক চাপের মধ্যে তিনি কাজ করতেন, কেউ তা জানত না। ঘনিষ্ঠ কয়েকজন যারা তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়োজন সম্পর্কে খোঁজ রাখতেন শুধু তাঁরাই জানতেন। অন্যদের চাইতে তাদের হোসেনের সঙ্গে দেখা করার বেশি সুযোগ আছে এমন ধারণা যাতে না হয়, সেজন্যে এঁরা তাঁর সঙ্গে মাঝেমধ্যে সাক্ষাৎ করতেন। আলোচনার সংখ্যা নয়, গুণগত উৎকর্ষতাই অনেকের সঙ্গে মুষ্টিমেয়র পার্থক্য গড়ে দিত। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে কোনও স্বচ্ছ ধারণা না থাকা সত্ত্বেও রাজ্যপাল মন্ত্রী বা খ্যাতনামা ব্যক্তিরা যখন সভায় ভাষণ দিতেন, তখন শ্রোতাদের বলে বোঝাবার দরকার হতো না যে; তারা সুসজ্জিত বাহুল্যমাত্র। শুধু পদের গুরুত্বের জন্যে তাঁকে আমান্ত্রণ করা হয়েছে। বেশি কথা বলাকে হোসেন আন্তরিকতা ও সত্যের অপলাপ বলে মনে করতেন। নিজের বক্তব্য তিনি নিজেই লিখতেন। আমরা শুনি লেখালিখি তিনি খুব অপছন্দ করতেন। কোনও আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে যে উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান, তার জন্যে কিছু বৌদ্ধিক অবদান রাখা তিনি নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করতেন।

শ্রীস্বামী মধুসূদন আচার্য প্রতিষ্ঠিত যোগবিদ্যা সম্বর্ধক মণ্ডলের আবরণ উম্মোচন করেন তিনি 1958 সালের 27 এপ্রিল। আমি যতদূর জানি, তিনি যোগে অনুরক্ত ছিলেন না, যদিও কখনও এর বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। কিন্তু তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থীদের তালিকা থেকে দেখা যায় মণ্ডলের প্রতিনিধিরা একাধিকবার সাক্ষাৎ করতেন। কারণ, ওঁদের কাজের প্রশংসা করলেও তিনি অন্য কোনও যোগ্য ব্যক্তিকে দিয়ে উদ্বোধন করতে বলেন। ব্যর্থ হয়ে, যোগের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি পড়াশুনা করেন। যোগের প্রকৃত সর্বজনীন গুরুত্বের উল্লেখ করে তাঁর বক্তব্য রাখেন। বিশ্বাসের আতিশয্যে

মণ্ডলের উদোক্তরা এইদিকে গুরুত্ব দেননি। 1961 সালে মহাবীর জয়ন্তী অনুষ্ঠানে একই ঘটনা ঘটে। জৈন মতবাদের দার্শনিক পর্যালোচন একজন মুসলিমের পক্ষে যথেষ্ট অস্বস্তিকর। সত্যি কথা বলতে, অধিবিদ্যায় ব্যুৎপত্তি নেই; এমন যে কোনও ব্যক্তির পক্ষেই বিষয়টি খুবই জটিল। আবার এ বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশোনা করলে বোঝা যায় জৈন অধিবিদ্যার প্রভাব মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভাগ্যবানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও, জৈন নীতিশাস্ত্রের সর্বজনীন চরিত্র আছে। একমাত্র হিংসায় উন্মত্ত কিছু ব্যক্তি সে সত্য অস্বীকার করে। সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করলে অহিংসাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। এ বিষয়ে হোসেনের বক্তব্য যারা শুনেছিলেন, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, জৈন মতবাদ একটি বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিশ্বাস বা আচরণ নয়, ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের নৈতিক শক্তি জৈন মতবাদ। আদর্শ ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে এই মতবাদেরও ভূমিকা অসীম।

জীবনকে এমনভাবে দেখলে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মনে জোর পায়। মত-পার্থক্য নিরসনের মধ্যেই শুভবোধের প্রসার ঘটে। ছোটখাটো মতপার্থক্যের উর্ধ্বে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণের সর্বজনীন আবেদনে আস্থা রাখার অর্থ বহু-সাংস্কৃতিক সমাজ বিকাশের নিশ্চিত পদক্ষেপ। হোসেনের কাছে শুভবোধের পরিচর্যা মহাত্মা গান্ধির কাছে তাঁর অহিংসা মন্ত্রের সমতুল্য ছিল। এই শুভবোধে পরিচর্যা সকলে মিলে করতে হবে জীবনের জয়গান গাইবার জন্যে। সরকারি চাকরিতে মুসলিমরা যে বখরা পেয়েছে, মুসলিমদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের বিকাশ ও উন্নতিতে যতটা সরকারি সাহায্য করা হয়েছে, উর্দুর মর্যদা রক্ষা ও প্রসারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির পক্ষ থেকে যে অনুদান দেওয়া হয়েছে; সবই ছিল মুসলিমদের প্রতি এই শুভেচ্ছার প্রতীক। মুসলিম সহ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্যে এই ব্যবস্থা হোসেন সমর্থন করেছিলেন।

মুসলিমদের চাকরি দেওয়া সাধারণভাবে সকলের চাকরি পাবার সঙ্গে যুক্ত। এখানে আলোচনা করার পক্ষে বিষয়টি যথেষ্ট জটিল। এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান খুব কম। কেন্দ্র বা রাজ্যগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে এই সমস্যা সমাধানের জন্যে কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নেই। এমনকী মুসলিমদের নিয়োগ সংক্রান্ত কোনও বিশ্বাসযোগ্য তথ্যও আমাদের হাতে নেই। বেকার একটা চাকরির খোঁজে সবার কাছে সাহায্য চায়। মুসলিম বা অমুসলিম নির্বিশেষে কতজন হোসেন রাজ্যপাল থাকাকালীন বা পরবর্তিকালে তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন, সে তথ্যও জানা নেই। তবে মুসলিমদের শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি সাহায্য চেয়ে পাননি, এমন দৃষ্টান্ত নেই। সকলের এ বিষয়ে জানার কথা নয়। মুসলিম জনগণের কাছে আনুষ্ঠানিক ও সরকারি অনুষ্ঠানে প্রদত্ত তাঁর ভাষণগুলিই হোসেনের সামগ্রিক বিচারের একমাত্র মানদণ্ড।

যে মুসলিমরা নিজেদের প্রকাশ্য ভাষণে হিন্দি শব্দ ব্যবহারে আপত্তি করেন, কার্যত দেশের সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা নিজেদের অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অন্য এক পরিস্থিতিতে তারা বলেন, উর্দুর আবেদন ব্যাপক, অন্য কোনও ভাষার প্রতি বৈরী মনোভাব নেই, এবং ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাষা থেকে সম্পদ আহরণ করেছে। তারা মনে করেন, হিন্দি উর্দুর প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ এবং হিন্দি ভাষা থেকে সমস্ত উর্দু শব্দ বাতিল করেছে; তাদের প্রয়োগ যতই যথার্থ হোক না কেন। হিন্দিভাষী রাজ্যগুলির ভাষানীতি শিক্ষা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে একই ধরনের বৈরীতা সৃষ্টি করেছে বলে তাদের ধারণা। এত সব কিছু সত্ত্বেও; নিজের পরিধির বাইরে গিয়ে হোসেনের হিন্দি ব্যবহারকে তারা বিশ্বাসঘাতকরার সমতুল্য বলে মনে করত। প্রচলিত উর্দু শব্দের পরিবর্তে হিন্দি প্রতিশব্দ ব্যবহার করা সম্পর্কে হোসেন তাঁর মনোভাব গোপন করেননি। 1959 সালের 27 নভেম্বর, পাটনা শহরে উর্দু বইয়ের প্রদর্শনী ও ইদারা-তাহকিয়াৎ-ই-উর্দু পাঠাগার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে হোসেন বলেন :

'এখানে উর্দু সম্পর্কে যে কাজ হয়েছে, সেজন্যে আমি খুব খুশি ও গর্বিত। মায়ের কাছে প্রথম উর্দু শিখি, উর্দু ভাষায় আমার মনের বিকাশ ঘটেছে, এখনও এই ভাষায় আমি ভাবি, এই ভাষার সাহিত্যরসে নিজেকে সমৃদ্ধ করি সাধ্যমতো। এই ভাষার প্রতি আমার দুর্বলতার জন্যে নয়, একজন অনুগত ভারতীয় নাগরিক হিসাবে আমি মনে করি স্বাধীনতার সময় আমরা যে জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলাম, এই ভাষা সেই নতুন জীবনের উন্মেষ। কোন মন্ত্রে এই জীবন অনুপ্রেরণা পাবে? সেই শাশ্বত মন্ত্র হলো বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বিপরীতমুখী সংস্কৃতির সমন্বয়। গঙ্গা ও যমুনার মিলন তৈরি করে ব্যাপক জলপ্রবাহ। এমন একটি সংস্কৃতি যেখানে বাগানের সৌন্দর্য ফুটে উঠবে নানা রঙের ফুলের সমারোহে, বহুবর্ণ ফুল দিয়ে গাঁথা হবে মালা, সেই রঞ্জিত মালা মানুষের গলায় আরও আশ্চর্যসুন্দর হয়ে উঠবে। এমন একটি সংস্কৃতি, যে সাহসের সঙ্গে বলতে পারে, আয়্যারইস গোলাপ এবং আফিঙ ফুলের রঙ ভিন্ন হলেও, তারা প্রত্যেকেই বসন্তের উপস্থিতি ঘোষণা করে, এমন সংস্কৃতি যার সামগ্রিকতা খণ্ডাংশকে হিংসা করে না, শক্তি ও সঞ্জীবনী বলে মনে করে। আমার মনে হয় আত্মপ্রকাশের যে মাধ্যমগুলি ভারতে রয়েছে, তার মধ্যে উর্দুতেই এই মন্ত্র স্পষ্ট ও গভীরভাবে উচ্চারণ করা যায়। সেজন্যেই উর্দুর ইতিহাসের ওপর গবেষণা আমার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণায় সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হবে উর্দু একটি সম্প্রদায় ও ধর্মের ভাষা নয়, কোনও সরকার উর্দুভাষাকে চাপিয়ে দেয়নি অথবা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে কৃত্রিমভাবে এই ভাষাকে তৈরি করা হয়নি। মানুষের, সাধারণ মানুষের ভাষা উর্দু। শান্তি ও মৈত্রীর বাণী সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যে ফকির ও সন্ন্যাসী যায়, তাদের ভাষা এটি। অর্থাৎ উর্দু হলো প্রেম ও ভালবাসার ভাষা,

সহনশীলতা ও শুভেচ্ছার ভাষা। নিজের সম্পদে সমৃদ্ধ ও দরাজ এই ভাষা আকস্মিক বিস্ময়ে সুন্দর নয়, পরিবর্তনে নয় লাজুক, কোনও শব্দকে দূষিত বলে মনে করে না, কোনও ভাবনাকে অস্পৃশ্য বলে ভাবে না।

'উর্দু দেশের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়, যারা এই ভাষায় কথা বলে বা বুঝতে পারে, তারা ছড়িয়ে আছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। জাতীয় সংহতির প্রশ্নে এই ভাষার গুরুত্ব অসীম। কিন্তু সাম্প্রতিক ইতিহাসে অনেক জটিলতা দেখা দিয়েছে। কেউ বলছেন উর্দু মুসলিমদের ভাষা, কেউ বলছেন বিদেশি ভাষা। বাস্তব হলো, এই ভাষা শুধু মুসলিমদের ভাষা নয়, বিদেশি তো নয়ই। উর্দু শুধুমাত্র মুসলিমদের ভাষা হলেও আমাদের স্বাধীন জাতীয় জীবনে কোনওভাবেই কলঙ্কিত হবে না। এদেশে যারা বাস করে, যারা দেশটাকে নিজের দেশ বলে ভাবে, যারা আমাদের সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, তারা সবাই আমাদের ভাই, আমাদের সহযোদ্ধা। তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটলে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, তার মঙ্গলে আমাদের মঙ্গল। যে ভাষায় আমরা গোটা আর্য সমাজের সাহিত্য পাই, যে ভাষাকে ইংরাজরা নিজেদের ধর্মীয় প্রচারে পরিপূর্ণ ভাবে ব্যবহার করেছে, সেই ভাষাকে শুধু মুসলিমদের ভাষা বলে আখ্যা দেওয়া সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া যা সৎ ও সঠিক নয়।'

সংকটে নিজের রাজ্যের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাজ্যপালের অংশ নেওয়া উচিত নয়। সময়ই তিনি নিজের সিদ্ধান্ত নেবেন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন, এমন আশা করা হয়। রাজনৈতিক নেতাদের দ্বন্দ্বে দীর্ণ কোনও রাজ্য যদি সংকটে না পড়ে, তাহলে বুঝতে হবে নেপথ্যে কোনও শক্তি কার্যকরীভাবে শান্তি বজায় রাখছে। পাটনায় নিযুক্ত একজন প্রশাসনিক আধিকারিক আমায় বলেন, হোসেনের মতো ব্যক্তিত্ব বিহারের মতো জায়গায় অচল। তিনি বলেন, গঙ্গার একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘাটের অধিবাসীরা তার কাছে অভিযোগ করেন, যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা এই ঘাট পরিদর্শন করেতে এসেছেন তাদের প্রত্যেকের কাছে ঘাট সংস্কার করার আবেদন করা সত্ত্বেও, কোনও কাজ করা হয়নি। ফেরার পথে হোসেন বলেন, তিনিও এমন অসুবিধার মুখে পড়েছেন। প্রত্যেকে এত তৎপরতার সঙ্গে তাঁর সঙ্গে একমত হন যে, তিনি কিছু বলতে পারেন না। কিছু করতেও পারেন না। সম্ভবত একমাত্র বিহার বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) বিষয়ক আলোচনার সময় তিনি নিজেকে কার্যকরীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। এই খসড়া প্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সরকারি বিভাগে পরিণত করার চেষ্টা হয়েছিল। এ বিষয়ে তিনি যা ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে দু রকম কথা শোনা যায়। প্রথম বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি রাজ্যপাল থাকাকালীন এই খসড়া প্রস্তাব নিয়ে অগ্রসর না হবার জন্যে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন। দ্বিতীয় মতে, তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলেন, এই প্রস্তাব হুবহু অনুমোদিত হলে, তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন। কেননা, বিবেকের তাড়নায়

তিনি এমন একটা প্রস্তাবে সম্মত হতে পারছেন না। যে-ভাবেই তিনি নিজের মত প্রকাশ করে থাকুন না কেন, বিহার সরকার দুঃখের সঙ্গে খসড়া প্রস্তাবে পরিবর্তন করতে বাধ্য হন; ফলে, প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের সুযোগ অনেক সীমিত হয়ে যায়।

উপরাষ্ট্রপতি হয়ে জাকির হোসেন দিল্লি চলে আসার দু তিন বছর পরে রাঁচির একটি উদ্যান আমি দেখতে গিয়েছিলাম মনে পড়ছে। আগাছাভর্তি বাগানটিকে তৃষ্ণার্ত ও অবহেলিত মনে হচ্ছিল। আমি জানি সাহিত্য প্রসারে যে অনুদান তিনি দিয়েছিলেন, তার সম্পূর্ণ ব্যবহার করা হয়নি। রাজনৈতিক নেতাদের এবং দলগুলির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, তিনি চলে আসার পর তাঁর সামান্য প্রভাব ও কার্যকরী ছিল না। রাঁচি ও জামসেদপুরে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়। তা সত্ত্বেও এমন অনেক বাগান ছিল, যেখানে অন্যান্য ফুলের সঙ্গে 'জাকির হোসেন গোলাপ'-ও ফুটতো, এমন অনেক মানুষ ছিলেন যাদের হৃদয়ে তাঁর ভালবাসা ও ব্যক্তিত্ব সদাজাগ্রত ছিল। ঋতু পরিবর্তনে যার সজীবতা একচুলও নষ্ট হয়নি। একজন মানুষের পক্ষে সমাজের চরিত্র বা সামাজিক জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। সীমিত সময় রাজ্যপালের পদে আসীন একজন ব্যক্তির পক্ষে তা আরও দুরূহ। কিন্তু, হোসেন সম্পর্কে বলা যায়, দয়া মমতা উদারতা সকলের প্রতি শ্রদ্ধার সংমিশ্রণে আদর্শ ভারতীয় ব্যক্তিত্বের একটি চিরস্থায়ী মূর্তি গড়তে, সম্ভাব্য সব কিছুই তিনি করেছিলেন।

দুই : উপরাষ্ট্রপতি

1962 সালের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় প্রধানমন্ত্রী তাঁর ইচ্ছাপূরণের সুযোগ পেয়ে গেলেন। এই পদে অন্য প্রার্থীদের নাম অনুমান করা অপ্রয়োজনীয় ছিল। প্রধানমন্ত্রী মনস্থির করে ফেলেছিলেন। 13 মে হোসেন উপরাষ্ট্রপতি রূপে শপথ গ্রহণ করেন। বিহারে তৈরি ভিতের ওপর তিনি তাঁর ভারতীয় ভাবমূর্তিকে ভারতবর্ষের ভাবমূর্তিতে প্রসারিত করেন। রাজ্যপালরূপে তিনি ভারতের রাজধানী থেকে দূরে ছিলেন, কিন্তু উপরাষ্ট্রপতি হয়ে তিনি জনগণ ও জীবনের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে ফিরে এলেন।

মৌলানা আজাদ রোডে সরকারি বাসভবনে গুছিয়ে বসতে তিনি কিছু সময় নেন। চোখ জুড়োনো ধূসর রঙের ছোঁয়ায় ঘর ভরিয়ে দেন শ্রীমতী রত্না ফেবীর। বাগানের ব্যাপারে তিনি বিভিন্ন লোকের সঙ্গে কথা বললেও, বাগান সাজানোর দায়িত্ব ছিল পি ডাবল্যু ডি-র হাতে। নিখুঁত স্বভাবের মানুষ ছিলেন তিনি। তাই

চেয়েছিলেন বাগানে যেন কোনও আগাছা, বিশেষত ঘাস না থাকে। আগাছা পরিপূর্ণভাবে তুলে না ফেললে খুব তাড়াতাড়ি সমস্ত বাগানময় ছড়িয়ে যাবে। হোসেন বাগানের সমস্ত মাটি খুঁড়ে, তা ভাল করে চেলে নিয়ে, ভাল মানের ঘাসের চাপড়া দিয়ে ঢেকে দিতে নির্দেশ দেন। জমি খুঁড়ে মোথা গাছের মূল পুরোনো পদ্ধতিতে আলাদা করে, মাটি সমান করে দেওয়া হয়। পূর্তদপ্তর এটুকুই প্রয়োজনীয় ও সম্ভব মনে করেছিলেন। হোসেন সন্তুষ্ট হননি, তিনি কি চান তা পুনরায় বুঝিয়ে দেন। পূর্তবিভাগ পুনরায় জমি খোঁড়ে এবং সমস্ত আগাছার বীজ ও শিকড় দূর করা হয়েছে বলে তাদের আশ্বাস, মেনে নেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। হোসেন পূর্তবিভাগের ওই আধিকারিককে বাগানো ঢুকতে না দেবার নির্দেশ দেন। তিনি আমার সামনে নির্দেশ দেন। তাঁর কানে-কানে বলা হয়, পূর্তবিভাগের ওই আধিকারিক তাঁর কথা শোনার জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছে। অবশেষে, হোসেনকে মেনে নিতেই হয় যে তাঁর নির্দেশ যথাযথভাবে পালিত হয়েছে এবং, আগাছাশূন্য সুন্দর বাগানই তিনি দেখতে পাবেন। কিছুদিন পর বাগানের মালি তাঁকে জানায় দুগাড়ি সার পাঠিয়ে তার কাছে চল্লিশ গাড়ির রসিদ চাওয়া হয়েছে। রসিদ না দেখায় সংশ্লিষ্টপক্ষ মালিটিকে কালো-তালিকাভুক্ত করে।

সংবিধান অনুযায়ী উপরাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার সভাপতি এবং প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধিত্ব করেন। পদমর্যাদায় তাঁর স্থান রাষ্ট্রপতির পরেই এবং এই পদে সরকারী ও কূটনৈতিক নিয়ম মেনে তাকে কাজ করতে হয়। সংবিধানে উপ-রাষ্ট্রপতির সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা বলা নেই। যেমন, তিনি কোন প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক হবেন, কোন খেতাবি পদ অলংকৃত করবেন, কোন সমিতির সভাপতি হবেন, কোন সভার বক্তৃতা করবেন, কোন বইয়ের ভূমিকা লিখবেন, বা কোথায় কোন বার্তা পাঠাবেন, কোন সভার উদ্বোধক ও বক্তা হবেন বা কোন বিয়ের আসরে উপস্থিত থাকবেন। এক কথায়, তাঁকে সকল অন্ধবিশ্বাসের শিকার হতে হয়। কারণ, অন্তত দিল্লিতে প্রচলিত বিশ্বাস, যে ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকেন না, তা একবারেই গুরুত্বহীন। নাছোড়বান্দাদের এই আমন্ত্রণ কতটা আটকাবেন তা তাঁর নিজের ওপর নির্ভর করে, তবে আশা করা যায় যে তাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করা হবে। হোসেনের ব্যক্তিগত মাধুর্য তাঁকে আকাঙ্ক্ষিত শিকার হিসাবে চিহ্নিত করে।

রাজ্যসভার সভাপতি হিসাবে কাজ করার সময় তিনি সহ-সভাপতি শ্রীমতী ভায়োলেট আলভার সাহায্য সব সময় পেতেন এবং শ্রীমতী আলভা তাঁর প্রতি বিশেষ ব্যক্তিগত আনুগত্য বোধ করতেন। কিন্তু প্রশ্নোত্তরের পর্বে তাঁকে সভা পরিচালনা করতে হতো এবং তাঁর কাছে তা ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। সংসদের আচরণবিধি ভাঙতেই যে সাংসদের আগ্রহ ছিল, জোর করে তাদের তিনি সংযমী

করতে পারতেন না। কখনও কখনও কোনও নির্দেশ দেবার জন্যে তাঁকে টেবিলে হাতুড়ি পিটিয়ে বা যারা চিৎকার করছে, তাদের চাইতেও জোরে চিৎকার করতে হতো। যাঁরা তাঁকে চেনেন, কেউই ভাবতেই পারতেন না। অবস্থা আয়ত্বের বাইরে গেলে যে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত তিনি নিতেন, তা অবশ্য নিরপেক্ষই হতো। তাঁর রাজনৈতিক আনুগত্য ছিল প্রকাশ্য। তিনি বিরোধীপক্ষকে মন খুলে কথা বলার অধিকার দেওয়া পছন্দ করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, বুদ্ধির উৎকর্ষতা ও প্রত্যয় জন্মানোর ক্ষমতা না থাকলে, সংখ্যাধিক্য নানা অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমার মনে আছে, কোনও অনুতাপ না করেই তিনি বলেছিলেন, শাসক দলের মন্ত্রী ও সাংসদরা প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে নিজেদের যথেষ্ট প্রস্তুত করে রাখে না। দুজন বিরোধী সাংসদের নাম করে তিনি বলেন, এরা যথেষ্ট দক্ষ এবং শাসক দলের কোনও সদস্য তাদের যোগ্য নয়।

কূটনীতিক হিসাবেই হোসেন সব চেয়ে ভাল দেশ সেবা করেন। দেশের যে ভাবমূর্তি তিনি তৈরি করেন, তা পাকিস্তান ও চিন ছাড়া সব দেশের প্রশংসা পায়। ভারত-চিন যুদ্ধের কারণ ব্যাখ্যা করা এখানে সমীচীন হবে না। প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও চৌ-এন-লাই এর মধ্যে আপাত-গভীর বন্ধুত্বের পঞ্চশীল নীতির প্রতি আনুগত্য এবং অন্যদেশগুলিকে তা মেনে চলার অনুরোধ করা সত্ত্বেও এ যুদ্ধ এড়ানো যায়নি। ঘটনা প্রমাণ করে পাকিস্তানের শত্রুতা তার ব্যাধিবিশেষ। শুধু ঘৃণা থেকেই মনে হয় ভারতবর্ষ শত্রু। কিন্তু তার চেয়ে বেশি শত্রু হলো যারা নিজের দেশে সম্মান ও মর্যদা নিয়ে বাস করছে সেই ভারতীয় মুসলিমরা। কারণ হিন্দু সরকার কর্তৃক মুসলিম নিপীড়ণ এই অভিযোগ ও প্রচারকে তারাই প্রত্যাঘাত করতে সক্ষম। ভুট্টো ও তার সহযোগীরা মনে করতেন, সুযোগমতো এই সমস্ত ভারতীয় মুসলিমদের অগ্রাহ্য অপমান এমনকী প্রত্যাঘাত করা উচিত। ভুট্টোর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদলকে ভারতীয় আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করা হয়। ভোজসভায় হোসেনের ডান দিকে বসেছিলেন ভুট্টো এবং বাঁ দিকে এক আই. সি. এস আধিকারিক। ভুট্টো হোসেনের সঙ্গে একটি কথাও না বলে, সারাক্ষণ পূর্ব পরিচিত সেই আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলেন। আমি ডানদিকে দুজনের পরে বসেছিলাম। আমি লক্ষ করি, হোসেন নির্বিকার মুখে কোনও দিকে না তাকিয়ে ধৈর্য ধরে ভোজ সভায় সারাক্ষণ বসে থাকেন। অবাক হয়ে ভাবছিলাম, কেন তাঁকে এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য উদ্যোক্তরাই জবাব ভাল দিতে পারেন। এর কিছুদিনের মধ্যে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। ভারতীয় মুসলিমরা সেনাবাহিনীতে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন যা পাকিস্তানের ঘৃণার আগুনে আরও ঘৃতাহুতি দেয়। ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতীয় মুসলিমদের দেশপ্রেম এই উত্তেজনা প্রশমন করতে পারে না।

কিন্তু এই অন্ধকার দিকটি ছাড়া ছবির উজ্জ্বল রঙও আছে। হোসেনের কূটনীতিতে কিছু জাদু ছিল। কারণ এর মাধ্যমে শুধু আন্তরিক শুভেচ্ছাই প্রকাশ করে না, ঘটনার বিশ্লেষণে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান এবং ফুল লতা গাছ জীবাশ্ম পাথর স্ফটিক চিত্রকলা সুন্দর হস্তাক্ষর সাহিত্য বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে তাঁর আগ্রহও সকল কাজে নিখুঁত হবার বাসনা প্রকাশ করে। বিদেশি কূটনীতিক যিনি মিতভাষী, দক্ষতায় অন্যের প্রশংসা করেন এবং মনের ভাব গোপন রাখার জন্যে শব্দচয়নে সতর্ক থাকেন, তিনি জেনে খুশি হতেন হোসেন শুধু দেশের চিন্তাতেই উৎসাহী ছিলেন। তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করতেন, তাঁর দেশ সম্পর্কে হোসেন তাঁর চাইতে বেশি জানেন। ফুল গাছ পাথর ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে তার অগাধ জ্ঞান ছিল। ভারত পরিদর্শনরত বর্মার প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর দেশের ফুল নিয়ে প্রশংসা করলেন : 'এ্যামহার্স্টিয়া ফুটলে চমৎকার দেখায়, তাই না?' প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই জবাব দেন, হ্যাঁ এবং সাক্ষাৎকার শেষে বর্মার দূতাবাসের আধিকারিকদের গাছটির ফুল সম্পর্কে তাঁকে বিশদ জানাতে হয়। হোসেনের জন্যে কিছু চারা গাছ পাঠাবার নির্দেশ দেওয়া হয়। উত্তর-আফ্রিকা থেকে তিনি বামন প্রজাতির ডালিম গাছ আনান। তিনি বলেন, আমি এক শোভাযাত্রায় যাচ্ছিলাম। যেতে-যেতে দেখলাম কতকগুলো গাছে ডালিমের মত কুঁড়ি ফুটেছে। আমি পাশের লোকদের গাছটির নাম জিজ্ঞেস করলাম। তারা বলল গাছগুলি বামন-ডালিম। ভারতে জন্মাবে কি-না জানাতে চাওয়ায় তারা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে। আমি এত সতৃষ্ণ নয়নে গাছগুলি দেখছিলাম যে তারা ফিরে যাবার সময়, কিছু বীজ ও চারাগাছ দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। ভ্রমণরত একদল রুশ বিজ্ঞানী তাঁর পাথর ও জীবাশ্মর সংগ্রহ দেখে অবাক হয়ে যান এবং দেশে ফিরে উরাল অঞ্চলে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার স্ফটিক দিয়ে তৈরি একটি গাছ তাঁকে পাঠিয়ে দেন। 1966 সালের জুলাই মাসে তিনি আফগানিস্থান যান এবং সেখানে সুন্দর হস্তাক্ষরবিদদের খোঁজ করেন। তাঁর সংগ্রহে তাদের লেখা কবিতার বই ছিল। যে কোনও উপায়ে তিনি ভিনদেশি প্রতিনিধিদের অনুভব করতে বাধ্য করতেন যে, তাদের এমন কিছু সম্পদ আছে যা বিশ্বের সমস্ত সংস্কৃতিবান মানুষ প্রশংসা করে।

কূটনৈতিক আলোচনায় আমাদের বন্ধুত্ব ও সদিচ্ছার নিদর্শন হিসাবে আমরা আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, শান্তির জন্যে আমাদের উদ্যোগ, অর্থনৈতিক উন্নতিতে আমাদের সহযোগিতা, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিই। আমাদের বিদেশ দপ্তরের এই প্রবণতার জন্যে হোসেন দুঃখ প্রকাশ করতেন। অন্য দেশগুলি তাদের উদ্দেশ্য সাধনে যতটা সোচ্চার, আমরা তার চেয়ে বেশি সোচ্চার। 1963 সালে ইথিওপিয়া, সুদান ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে ভ্রমণের প্রাক্কালে হোসেন আমাকে বলেন, তাঁর বক্তৃতার খসড়াটি বিদেশমন্ত্রক তৈরি করেছিল এবং তাতে, এই সব দেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক সম্পর্কের

ক্ষেত্রে এমন একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করা হয়েছে যে, ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশ করতে এবং সৌহার্দ সত্য এবং গভীর কূটনৈতিক কারণে সেই বক্তৃতা তাঁকে পুনরায় লিখতে হয়। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার জন্যে তাঁকে পি. এইচ. ডি ডিগ্রিতে সম্মানিত করা হয় এবং এই বক্তৃতা আরব-দুনিয়ার সঙ্গে ভারতের সুষম সম্পর্কের নিদর্শন।

কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তার প্রতিবেদনে হোসেনকে একজন শিক্ষক হিসাবে উল্লেখ করেন। হোসেন সেই বক্তব্যের রেশ ধরেই তাঁর ভাষণ শুরু করেন: 'বহুকষ্টে অর্জিত স্বাধীনতার ভিত্তিভূমির উপর জাতীয় মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে ব্যাপৃত সমাজে, একজন শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে আমি বলতে চাই। সমাজের নৈতিক উন্নয়নের জন্যে তাঁকে সচেষ্ট হতে হবে। জাতীয় মূল্যবোধের রক্ষকর্তা তিনি। ব্যক্তিত্ব ও সাংস্কৃতিক গুণাবলির মাধ্যমে ছাত্রদের সেই মূল্যবোধে উজ্জীবীত করতে হবে। তাঁকে সমাজের প্রতিভূ হয়ে সহানুভূতির সঙ্গে তরুণদের প্রয়োজন এবং তাদের সহজাত গুণগুলি উপলব্ধি করে, মূল্যবোধগুলিকে তাদের অনুভব করানোই একজন শিক্ষকের মূল লক্ষ্য। ঠিক কুঁড়ির মতোই অপরিণত ও বেড়ে ওঠা এই জীবনগুলি নিয়েই তাঁর প্রধান কাজ। খেয়ালখুশি চরিতার্থ করার জন্যে কাগুজে ফুল নয়, এই কুঁড়িগুলিকে পরিপূর্ণ ফুল হয়ে ফুটে ওঠার জন্যে তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন। নৈতিকভাবে স্বশাসিত ব্যক্তিত্ব তৈরি করাই তাঁর লক্ষ্য ও প্রচেষ্টার শেষ কথা। শিক্ষক প্রভু নন। বিশ্বাস ভালবাসা ও শ্রদ্ধার মধ্যে বেড়ে ওঠতে তাকে সাহায্য করতে হবে। অসীম ভালবাসা ও ধৈর্যের সাহায্যে তিনিই পারেন ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করতে। তিনি মানুষকে অন্যের সঙ্গে আনন্দে পথ চলতে ও উদ্দীপনার মধ্যে কাজ করতে শেখান। তিনি সকল কাজের মধ্যে বুদ্ধি বাস্তব-নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্ব অনুভব করতে পারেন ও বুদ্ধিগত কাজকে উদ্দেশ্যপূর্ণ দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। তিনি মানুষকে অতীত মানসিক সম্পর্ক, বর্তমানের সমস্যা ও আগামিদিনের আকাঙ্ক্ষার নিরীখে একসূত্রে বাঁধতে পারেন।

'ভারতীয় ও আরব শিক্ষক সম্পর্কে এই হলো আমরা ধারণা। আমি মনে করি, তাঁরা এই তিনটি কর্তব্য, ত্রিমুখী সুযোগ সম্পর্কে সচেতন।'

'ভারত, মিশর ও আরব দেশগুলির অতীত ইতিহাস থেকে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ছাত্রদের তিনি অনেক সচেতন করে তুলতে পারেন। ইতিহাসের প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই ভারত ও মিশরের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং বিশ্বসভ্যতার জনক এই দুই দেশে, এমন বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যাদের মধ্যে চমকপ্রদ মিল রয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব 8000 বছর আগে নীলনদের তীরে গড়ে ওঠা সভ্যতা ও সিমলা পাহাড়েরর পাদভূমি হতে আরব সাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত সিন্ধু উপত্যকায় গড়ে

ওঠা সভ্যতার মধ্যে বহু মিল ছিল। মহেঞ্জোদড় ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত পুঁতি ও অর্ধবৃত্তাকার গলার হার, ষাঁড়ের পায়ের মতো পায়াযুক্ত চৌকি, ছোট পুঁতি ও ঝিনুকাকৃতি চামচ প্রভৃতি প্রমাণ করে যে, এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে মিশরের ব্যবসায়িক ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান দৃঢ় ছিল। যদি আলেকজাণ্ডারের মতো ব্যক্তি নীলনদের উৎস ভারতবর্ষের কোথায় হবে মনে করতে পারেন, যদি মেগাস্থিনিস ভারত ও মিশরের সেচ-ব্যবস্থার মধ্যে মিল খুঁজে পান, মুহাল্লাবি যদি কনৌজকে 'ভারতের কায়রো' আখ্যা দিতে পারেন, তবে তাদের এই পর্যবেক্ষণের ঐতিহাসিক করণ ছিল এবং তা প্রমাণ করে সমসাময়িক চিন্তার পরিপ্রেক্ষিত। আরব সাগরের কূলে ব্রোচ, সোপরা, রোকরকা, কল, শ্রীপুর প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় বন্দরগুলির সঙ্গে মিশরের ঘনিষ্ঠ যোগযোগ ছিল। খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রীক-মিশরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীতে একজন গ্রীক-মিশরি নাবিকের লেখা 'অ্যা সিম্যানস্ গাইড' বইটি ভারত ও মিশরের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের দিকে আলোকপাত করে। প্রাচীন তামিল কবিতাতেও ভারত ও মিশরের মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তির উল্লেখ আছে। ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রাপ্ত মিশরির মুদ্রা এই দেশে তাদের বাণিজ্য ও বসবাস প্রমাণ করে। কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়াতেও বহু অবস্থাপন্ন ভারতীয় ব্যবসায়ী বাস করতেন। প্রাচীনকালে ভারত থেকে মশলা সুগন্ধী ওষধিলতা রঞ্জক পদার্থ মুক্তা মূল্যবান পাথর মসলিন নীল হাতির দাঁত চিনামাটির বাসন কচ্ছপদের খোলা প্রভৃতি রপ্তানি করা হতো। ছ'শ বছর আগে দিল্লির সুলতানদের পরিধেয় বস্ত্রের যোগানদার ছিল মিশর।

'প্রাচীনকাল থেকেই ভারত ও মিশরের মধ্যে কূটনীতিক সম্পর্ক ছিল। মিশরিয় কূটনীতিককে মৌর্য রাজসভায় পাঠানো হতো, ভারতীয় দূত মিশর যেতেন। এই সম্পর্ক বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতের সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের সঙ্গে মিশরের মালিক-অল-নাদিরের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। সে-সময় এই সম্পর্ক শুধু রাজনীতি ও বাণিজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারত ও মিশরের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানও ছিল। খ্রিস্ট জন্মের দু'শ বছর আগে সম্রাট অশোক ধর্ম ও করুণার আদর্শ শিক্ষা দেবার জন্যে একজন সাধুকে মিশরে পাঠিয়েছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আলাউদ্দিন খিলজির রাজত্বকালে, মৌলানা শামসুদ্দিন নামে জনৈক মিশরিয় পণ্ডিত ইসলামি নবিদের ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রচারের জন্যে ভারতে একটি কেন্দ্র স্থাপনের জন্যে এদেশে আসেন।

'এমন ফলপ্রসূ আদানপ্রদান শুধু মিশর নয়, সারা আরব-দুনিয়ার সঙ্গেই ছিল। এই যোগাযোগের সুদূরপ্রসারী সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার জায়গা এটা না হলেও, একটির উল্লেখ না করে আমি পারছি না। ইসলামের অগ্রগতি সম্পর্কে ভারতের উদ্দেশ্যে আরব, দুনিয়ার ভবিষ্যৎবাণী এটি। ভারতীয় জীবন যাত্রার ওপর এর প্রচণ্ড প্রভাব পড়ে এবং তা এক নতুন মাত্রা সংযোগ করেছিল। ধর্ম

রাজনীতি ভাষা ও সাহিত্যের ওপর এ প্রভাব ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রথম শান্তি ও শুভেচ্ছার একজন প্রবক্তা সমগ্র জাতিতে সম্বোধন করার সাহস দেখিয়েছিলেন। ইয়া আয়ুহন্নাস বলে তিনি সম্বোধন করতেন। এই বার্তার বিশ্বজনীনতা এবং ভারতীয়দের একাত্ম হবার সহজাত গুণ মিলে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অবস্থা তৈরি করেছিল। ভারতীয় উপমহাদেশ দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভাগ হবার পরেও প্রায় সাড়ে চার কোটি মুসলমান নাগরিক ভারতে বাস করেন। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ ভারত। তারা এক সৃজনশীল সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত, যার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ আত্মবিকাশ সম্ভব। ইতিহাসে দেখা যায়, মুসলিমরা হয় শাসক নয় অমুসলমান দ্বারা শাসিত। এখানে, ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রে সাড়ে চার কোটি মুসলমান দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে মিলে মিশের ক্ষমতার অংশীদার। আমি মনে করি এই পরিস্থিতিতে এক মূল্যবান সাংস্কৃতিক সমন্বয় গঠন করতে তারাও অংশীদার হবে। আমি ভেবে আশ্বস্ত বোধ করছি যে, সেই মহান নবীর বাণীকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করার কাজে কেউ অযথা প্রতিক্ষা করবেন না। তিনি শুধু আরবদের নন, 'সারা বিশ্বের কাছে আর্শীবাদস্বরূপ'। বিপদে তিনি মানুষকে সতর্ক করে দিতেন। মানবজাতির মঙ্গলে তিনি ছিলেন উদ্যোক্তা। আমি মনে করি, একজন শিক্ষক আগামী প্রজন্মের সঙ্গে তার পূর্ববর্তী প্রজন্মের সেতু। ভারত-আরব সম্পর্ক অতীতের চেয়ে এখন অনেক উষ্ণ। স্মরণাতীত কাল থেকে দুটি দেশ শান্তির পথের দিশারী, সে কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। মনে রাখা দরকার, কায়রো ও আলেকজন্দ্রিয়াতে কালিকটের ব্যবসায়ীদের কার্যালয়ে ছিলো। জেনে ভাল লাগে, আরব-দুনিয়া, মিশর যার শীর্ষে অবস্থিত; কয়েক শতাব্দী ধরেই ভারত ও পাশ্চাত্যের যোগাযোগ রক্ষা করছে এবং ভারত ও আরবের মধ্যে ভাব বিনিময়ের ফলে বিশ্বের জ্ঞান ও সংস্কৃতির ভাণ্ডার আর সমৃদ্ধিলাভ করেছে। ভাবলে দুঃখ হয়, যে কোনও রকম রাজনৈতিক আধিপত্য, অর্থনৈতিক শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদী হিংস্রতা ছাড়াই পরস্পরকে সমৃদ্ধ করার এই কাজ আর কয়েক শতাব্দী চালানো যেত। হ্যাঁ, আমাদের অতীত বিস্ময়কর কিন্তু অনেকখানি সময় আমরা পেরিয়ে এসেছি এবং দুর্ভাগ্যবশত মাঝখানে রয়েছে এক নিষ্ফল অন্ধকারময় বিচ্ছেদ। এই সময়ের কোনও সুখস্মৃতি নেই। কিন্তু মহান জাতীয় সংগ্রাম আমাদের দুই দেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটিয়ে বর্তমান কর্মকাণ্ডে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার জন্যে ঐক্যবদ্ধ করেছে। আমরা একই নিষ্ঠুর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদাবনত ছিলাম, এর কর্মবিনাশকারী ক্ষমতা আমাদের জানা আছে। একে পরাস্ত করে আমরা উল্লসিত। আমাদের জাতীয় জীবনকে আমাদের মতো করে গড়ে তোলার দায়িত্ব এখন আমাদের ভাগ করে নিতে হবে। আমরা চাই সুখি সুন্দর ও শোষণহীন জীবন গড়তে, এবং এশিয়া ও আফ্রিকা, তথা সমগ্র বিশ্বের জনগণের শান্তি, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে।'

এটা স্পষ্ট যে হোসেনের আদর্শ ছিলো পারস্পরিক বোঝাপড়ার উন্নতি ঘটানো। কথাটির যে আন্তর্জাতিক পরিভাষা আছে সে অর্থে নয়, বরং জার্মান দর্শনে যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেইভাবে, অর্থাৎ কেউ অন্যকে বুঝতে চাইলে তার সঙ্গে কল্পিত মিল খুঁজে পায়, অন্যকে জানার মধ্য দিয়েই নিজেকে জানা সম্পূর্ণ হয়। এই বোঝাপড়া আন্তর্জাতিক রাজনীতির লক্ষ্য নয়, শুধু তার বিবেচ্য হতে পারে যিনি নিজের স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন। হোসেন ভারতের যে ভাবমূর্তি গড়তে চেয়েছিলেন, তা কোনও আবেগহীন, আত্মকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান অর্জন করতে পারত না। এই ভাবমূর্তি ভারতবর্ষ ও তার সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়া সম্পর্কযুক্ত দেশগুলির দ্বারা যৌথভাবে প্রস্তুত। এইভাবে বোঝার ইচ্ছাকে বাড়ানো যায়, কিন্তু সদিচ্ছা সাধারণ স্বার্থ আবিষ্কারের ওপর নির্ভর করে না; করে পরস্পরকে প্রশংসা করার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে জানার ওপর।

রাজ্যপাল ও উপরাষ্ট্রপতি থাকাকালীন হোসেন বহু সমাবর্তন সভায় ভাষণ দিয়েছেন[3]। মানসিক চাপের মধ্যে লেখার ফলে সেগুলিতে তাঁর মনের ভাব ভাসাভাসা প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তির ওপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলির সমন্বয়ে মননশীলতা, চারিত্রিক আদর্শ ও ইচ্ছার দ্বারা ব্যক্তির বিকাশের ওপর তিনি জোর দেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি সাধারণত মানসিক ও চারিত্রিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং সর্বোচ্চ মূল্যবোধগুলির কাছে নিঃশর্ত সমর্পণের মাধ্যমে আত্মোপলব্ধির পথ নির্দেশ করতেন। 1967 সালের 29 এপ্রিল মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসবে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেখানেও একজন সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রনেতা হিসাবে তিনি একই সমস্যার ওপর আলোচনা করেন ও ব্যক্তির গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

'আমরা যখন ভারতবর্ষে একজাতি রাষ্ট্র তৈরি করার চেষ্টা করছি, আপনারা তা ইতিমধ্যে তৈরি করেছেন; যা গোটা দুনিয়ায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং এই জাতিরাষ্ট্রের প্রকৃতি-এর গভীর উদ্দেশ্য ও অগ্রগতি সম্বন্ধে সব সময় আমাদের আলোচনা করা উচিত। আপনার চিন্তা ও কাজের গতিপথ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনাকে-সহানুভূতি ও বিবেচনার সঙ্গে জাতিরাষ্ট্রের প্রকৃতি ও কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করতে হবে কারণ এর উৎস হচ্ছে জাতীবোধের এক সাধারণ অনুভূতি ও ব্যক্তি ও রাষ্ট্রে মধ্যে চরম সম্পর্কের সহজাত পরিচিতি। এই পরিচিতি আইনের কাছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রবল ও স্পষ্ট ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ থাকে। সাধারণ স্বার্থের দাবি যেগুলি অন্য উপায়ে পাওয়া সম্ভব নয়; সেগুলি প্রতিষ্ঠার জন্যেই জাতিরাষ্ট্রগুলি সৃষ্টি হয়েছে। একাধিক জাতি ও সংস্কৃতির মানুষ নিয়েও অনেক জাতি রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে।

---

3. 'গতিশীল বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক সংগ্রহে অধিকাংশই প্রকাশিত হয় 1965 সনে।

এই সমস্ত জাতিরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বিভিন্ন জাতির সাধারণ স্বার্থগুলির সুরক্ষা ও সমন্বয় করা। একই জাতিত্ব-বোধের প্রতীক স্বরূপ, জনগণের ইচ্ছায় গঠিত জাতিরাষ্ট্রও আছে। সেখানে এই নীতি তাদের শক্তিশালী ও ঐশ্বর্যশালী করবে। অবশ্য সব জাতিরাষ্ট্রগুলির উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য এক নয়, এবং সবাইকে নিজ উপায়ে তার ভাগ্য নির্ধারণ করতে হবে।

'আমরা প্রায় সব সময়েই মনে করি যে জাতিরাষ্ট্র আমাদের সব সমস্যার সমাধান করেছে। কিন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়ের নিরিখে ন্যায়সংগত প্রশ্ন দেখা দিয়েছে; যতটা দাবি করা হয় ব্যবস্থাটি ততটা ফলপ্রসূ কী না, অথবা শক্তিগুলির নীতিবোধের দিক থেকে সংকটপূর্ণ বিষয় সমাধান করতে সমর্থ কী না। বস্তুত, এমন অনেক রাষ্ট্র আছে যারা শক্তির খেলা ও বস্তুসুখের আশায় মগ্ন আছে এবং সেখানে নীতিবোধের কোনও গুরুত্বই নেই।

'এর মানে কী জাতিরাষ্ট্রের নৈতিক বিচারবোধ থাকবে না, বা থাকা উচিত নয়, অথবা তা নৈতিক বিচারের অধিকারের বাইরে, এবং তা বিচার করার ক্ষমতা কী আর কারও নেই? তা যে নয়, আশা করি সবাই তা মানবেন। নীতিবোধকে অগ্রাহ্য করে প্রাথমিকভাবে কিছু সুবিধা পাওয়া গেলেও শোষণ ও অবিচার শীঘ্রই রাষ্ট্রের ওপর প্রত্যাঘাত হানে এবং শেষ পর্যন্ত আর কেউ তাকে রোধ করতে পারে না; রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতার বাড়াবাড়ি ও অবিচার রোধ করার অধিকার ও শক্তি কার আছে? প্রশ্নের জবাব একটাই : সূক্ষ্ম অনুভূতি ও অদম্য নৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ সেই নাগরিক, যিনি নৈতিক মূল্যবোধের জন্যে রাষ্ট্রের স্বার্থে রাষ্ট্রকে অস্বীকার করতে পারেন। কিন্তু এই নাগরিক একক ব্যক্তি এবং তিনি নাগরিক গোষ্ঠীর সদস্য। সুতরাং তার বিবেক ও শিক্ষার সমস্যা আলোচনা করার আগে আমাদের তার অবস্থান পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

'এই জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে রাষ্ট্রনায়ক অভিযাত্রী জলদস্যু সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাবিদ বিজ্ঞানী ঐতিহাসিক কবি সকলেরই অবদান আছে। কখনও তারা একসঙ্গে কাজ করেছে, কখনও বা তাদের ভেতরের বিরোধ উদ্দেশ্যে সফল হতে অংশীদার হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন আব্রাহাম লিঙ্কন রাষ্ট্রকে নৈতিকতার দিকটি গ্রহণ ও সফল করতে বাধ্য করেন। কেউ বা নৈতিকতাকে রাষ্ট্রের স্বার্থের উপযোগী করে তৈরি করেন আর কেউ মনে করেন রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রশ্নে নৈতিকতা অযৌক্তিক ব্যাপার। প্রত্যেকেই জাতিরাষ্ট্রের চরিত্রের ওপর তার ছাপ রেখে গেছেন। অমাদের মতো আপনাদের ইতিহাসও এই সব ব্যক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ। আমরা উভয়েই তাদের অনেকের প্রশংসা করেছি। বিশেষত, যারা পথপ্রদর্শক ও আমাদের জাতীয় জীবনে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন; তাদের প্রশংসা ভবিষ্যতেও করব। কিন্তু কৌতুহলের বিষয়, প্রত্যেক অগ্রসর ও উন্নত জাতিরাষ্ট্রগুলিতে সমগ্র চিন্তা প্রতিষ্ঠান ও আচরণকে

এমনভাবে সংগঠিত করা হয়েছে যে, প্রতিটি নাগরিক প্রশ্নাতীতভাবে তা গ্রহণ করবে। আমি স্বীকার করি, গণতন্ত্রে অন্তত দ্বিমত পোষণ করার অধিকার শুধু তত্ত্বে নয়, মাঝেমাঝে বাস্তবেও মেনে চলা হয়। কিন্তু, অধিকাংশ একক ব্যক্তির পক্ষে এই ক্ষমতার ব্যবহার করা সম্ভব নয়; কারণ তার বিপরীতে থাকবে পুরস্কার ও তিরস্কারের সম্পত্তি, বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলির অসীম ক্ষমতা ও প্রচারমাধ্যমগুলির প্রচণ্ড প্রভাব। এবং প্রায়ই সাধারণ মানুষের এই সব বাধা অতিক্রম করে নিজেকে প্রমাণ করার মতো নৈতিক সাহস ও বুদ্ধি থাকে না।

'তবু আমাদের মনে রাখতে হবে এই ব্যক্তি শুধুমাত্র বিশ্বের এক ভগ্নাংশও নয়। সে সমস্ত মনুষ্যধর্ম, তার ভবিষ্যৎ আশা, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তার কারণেই যে গঠনতন্ত্রের মধ্যে সে বাস করে, তার মধ্যে নিহিত গুণগুলির সমালোচনামূলক পুনর্মূল্যায়ন সর্বদাই করা উচিত। চিন্তাশক্তিহীন ও প্রতারক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মেনে নিয়েছে বলেই কোনও ব্যক্তির বুদ্ধিগত ও নৈতিক সততাকে অপরিবর্তনীয় বলে মেনে নেওয়া অন্যায় ও অনুচিত।

'জাতিরাষ্ট্র গঠনকালে যখন নতুন অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়, তখন এই চিন্তার জনকরা এর সীমিত উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগের মধ্যে যে অদম্য প্রাণশক্তি ছিল তার বিকল্প কিছু করতে পারেননি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ জাতিরাষ্ট্র ও তার অর্থনীতির সহজাত মূল্যগুলির বিশ্বাসকেই আদর্শস্বরূপ গণ্য করতেন। খুব অল্পসংখ্যক লোকই এর খারাপ বা অশুভদিকগুলির বিরুদ্ধে নৈতিক ও নান্দনিক প্রতিবাদ জানান। ঐতিহাসিকরা অতীতের দিকে গর্বভরে চেয়ে দেখছেন যে দারিদ্র্য অজ্ঞতা অসুখের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে জাতিরাষ্ট্র এবং জ্ঞানপ্রসারে বাধাদানকারী বর্তমান এবং ক্ষমতা ও সম্মানের অবস্থানের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তার সঙ্গে যুদ্ধ করে সে পথ করে নিচ্ছে। তারা বহু-সরল, সময়ে ক্ষতিকারক সংস্থায় ও উৎকট দেশপ্রেম ও জাতীয় গর্বের মনোভাব লালন করতেন। জাতিরাষ্ট্রের ভিত্তিকে দৃঢ় করতে এবং পূর্ণ ও অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাগুলির মধ্যে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রিত করতে এর প্রয়োজন ছিল। শুধু দেশের অর্থনীতি সুস্থ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতির সঙ্গে ও যুক্ত; এমন কোনও নতুন ও বিভ্রান্তকর সমস্যা তাঁরা নিজেরা তৈরি করেননি।

'তুলনামূলকভাবে নতুন এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তির স্থান কোথায়? আমরা যখন এই নতুন সভ্যতার মূল্যায়ন করি, তখন দেখি যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সে লাভবান হলেও, ক্ষতিও তার প্রচুর হয়েছে এবং সবচেয়ে বড় ক্ষতি, সে তার নৈতিক পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে। আমরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছি, এই ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির অগ্রগতিকে আমরা সরিয়ে দিতে বা পরিবর্তন করতে পারব না। যদিও এর ফলে হয়তো শান্তি ও আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া অসম্ভব হবে, কিন্তু দানবীয় যন্ত্রের আবিষ্কারে মানবজাতি

ধ্বংস হয়ে যাবে। যদিও আমি মনে করি না, তবুও শারীরিক ধ্বংসের বিপদ এড়ানো সম্ভব হলেও মানুষের ব্যক্তিত্ব ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সাংস্কৃতিক সুফলগুলি ধ্বংসের বহু রাস্তা আছে। আমাদের জীবন, আমাদের অর্থনীতি প্রযুক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং উন্নত দেশগুলিতে আমরা প্রযুক্তি দানবের শক্তির অধীন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে খর্ব করার উদ্যোগ সর্বদাই চলছে এবং জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাকে অন্যদের সমান হবার জন্যে প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হচ্ছে। আমাদের কর্মচিন্তা ও অনুভব একই রকম হবে এবং আমাদের যা প্রশংসা করতে বলা হবে, তাই প্রশংসা করব। বিজ্ঞানের শক্তিশালী ও জাদুকরি উদ্ভাবনী ক্ষমতার কাছে আমরা অসহায় হয়ে পড়ি। আনন্দ ও সুখের অর্থ ব্যাখ্যা করার জন্যে, আমরা নিরীহ প্রাণীর মতো দল বেঁধে একে অপরকে অনুসরণ করব এবং পেশাদারি ব্যবসায়ীর অদ্ভুত অমার্জিত রুচির সন্তুষ্টির জন্যে চাতুর্যের সঙ্গে নতুন নতুন রাস্তা বের করব। গড় ব্যক্তির কোনও স্বাতন্ত্র্য ও আত্মিক পরিচয় নেই, এমন কিছু নেই যা তাকে অদ্বিতীয় বলে ভাবায়। মানুষের মধ্যে কোন রহস্য নেই, তাকে বোঝা যায় সে দুঃখী এবং চতুর। তারই তৈরি চতুর যন্ত্রের সাহায্যে যে পরিচালিত হয়। আমি হয়তো একটু বাড়িয়ে বলছি, কিন্তু অধিকাংশ স্ত্রী পুরুষ সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য। কিন্তু এজন্যে তাদের দায়ী করা যায় না, কারণ এই পরিবেশে এমনই হবে।

'আমাদের ঐতিহ্যপূর্ণ মহৎ সৃষ্টিগুলি এবং সমকালীন প্রকাশের দিকে তাকিয়ে দেখুন। বেশি-বেশি করে মানুষের চরম বাস্তববাদী মূল্যায়ন করে ব্যক্তিকে অবলুপ্ত করার কাজে হাত মিলিয়েছে শিল্প ও সাহিত্য। এক সময়ে বিশ্বাস করা হতো, ঈশ্বর নিজের আদলে মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং শিল্পের নামে তাকে বিকৃত, সৌন্দর্যহীন, অর্থহীন ভাবে টুকরো-টুকরো করা হচ্ছে। সাহিত্য মানুষকে প্রতারিত করছে তার ভেতরের অসারতা ও প্রাচীন স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাগুলির ব্যর্থতা সম্বন্ধে, যাদের স্বকীয় বৈরীতা অস্বীকার করা হয়েছে। যেহেতু, এটাই সর্বাধুনিক 'কেতা' এবং সংজ্ঞানুযায়ী সর্বাধুনিকই হচ্ছে সর্বোত্তম, সুতরাং তৎক্ষণাৎ গ্রহণীয়। তার নিজের চেয়ে বেশি গভীরভাবে কিছু দেখা সম্পর্কে, তাকে সতর্ক করে দেওয়া হয় এবং বিশ্বকে সে ভাসা-ভাসা দেখে, বলা হয় প্রগতি শিল্প ও সাহিত্যকে মানুষের আরও কাছে নিয়ে এসেছে এবং বহু উৎপাদনের কোনও শেষ নেই। পরিমাণ ভাসিয়ে দিচ্ছে গুণগতমানকে এবং সব বস্তুরই চটজলদি কফির মতো নিজেকে প্রস্তুত হবার আশা! এই নতুন পৃথিবী ও নতুন সভ্যতা গড়ার পিছনে ব্যক্তিকে অবশ্য উচ্চ মূল্য দিতে হয়েছে।

'এইভাবে ব্যক্তি-ধ্বংস চলতে থাকলে আমাদের ভবিষ্যৎ কি হবে? এই পথের শেষে যে সর্বনাশ অপেক্ষা করছে, তার আভাস সর্বগ্রাসী শক্তিগুলির উত্থানের মধ্য দিয়েই আমরা বুঝতে পারি। যদি ব্যক্তিমানুষ নিজেকে জনতার একজন ছাড়া আর

কিছু কল্পনা করার শক্তি হারায়, নিজের সৃষ্টির সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা হারায়, এমনকী ঐতিহাসিক শক্তিগুলির সঙ্গে সংগ্রামের দায়িত্ব নেবার শিক্ষা বা প্রস্তুতি না থাকে, তবে গণতন্ত্র কি নিরাপদ থাকবে?

'শিক্ষকদেরই এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। তাঁরাই ঠিক করবেন যে তাঁরা নেতৃত্ব দেবেন, না বাইরের শক্তিগুলির চাপে যে অগ্রগতি ঘটছে তার থেকে পিছিয়ে থাকবেন। বর্তমান অবস্থায় শিক্ষাই এ কাজ করতে পারে, এবং ভবিষ্যৎ অনুমান করা ও প্রয়োজনে অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে পরিশ্রম করাও শিক্ষকের কাজের অংশ। যে শক্তিগুলি এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে ও চালু রেখেছে, তাদের যদি কোনও মূল্য দিতে হয়, তবে তা শুধুই চালু আছে বলে দেওয়া যায় না। কোন শিক্ষাকে মানুষের ভেতরের অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কহীন বাইরের বস্তু বলে ভাবা যায় না। নিঃসন্দেহের বিশ্বের বহু কাজ করার জন্যে শিক্ষা আমাদের প্রস্তুত করে এবং এই কাজের শিকড় নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধকে অনুসরণ করলে তবেই, তা অর্থবহ হয়। অন্য কথায় শিক্ষা সংগঠিত হয় মূল্যবোধ অনুসন্ধানের উদ্দীপনা, প্রতিকূলতা অবস্থাতেই সাহসী সমর্থন ও যতদূর সম্ভব, সমস্ত কাজে তার প্রকাশের মাধ্যম। এই মূল্যবোধ নিজেদের জন্যে ও অপরের জন্যে বহাল থাকবে। শিক্ষা এই কাজে ব্রতী হলেই মানুষ নিজের জীবন তার প্রতিষ্ঠান, এককথায় সমস্ত রাষ্ট্রকে নৈতিক উদ্দেশ্য দান করতে পারে।

'এই ব্যাপারে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দায়িত্ব অনেক বেশি। তাদের জাতিরাষ্ট্রের মতো তাদের স্থানও সবার ওপরে এবং অন্য দেশের শিক্ষকরা নেতৃত্বের জন্যে অনেক সময়ই তাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তাদের গুণগুলিকে সম্ভবত অনুকরণ করা হবে এবং দোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। যদি বিভ্রান্তিবশত প্রতিবেদশনশীলতাকে সচেতনতার লক্ষণ বলে মনে করা হয় তবে বর্তমান সামাজিক কাঠামোয় সমস্ত দাবি বুদ্ধিগত সামাজিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধের স্বাধীন ও উদ্দেশ্যপূর্ণ বিবেচনা ছাড়াই মেটাবার চেষ্টা করা হয়। ফলে, শিক্ষা সমাজের দাস হয়ে পড়ে। এটা গভীর চিন্তার বিষয়। শিক্ষা সম্বন্ধে তাদের ধারণা যদি এমন হয় যে, গভীরে প্রোথিত এক অধ্যাত্মবাদী সংস্কৃতির সঙ্গে বৈষয়িক সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটে এবং সেই নতুন আদর্শে থাকবে দৃঢ় নৈতিক চরিত্র, যা ব্যক্তিকে নতুন করে গড়ে তুলবে এবং আত্মার সত্যিকারের স্বাধীনতার প্রতিনিধি হবে গণতন্ত্র।

'আমার মনে হচ্ছে আমার দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা হতাশাপূর্ণ। কিন্তু আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি, গঠনমূলক রাজনৈতিক প্রচেষ্টা এবং বিশ্বাস ও তারা প্রয়োগের দ্বারা যা আমরা অর্জন করেছি, তাকে বিন্দুমাত্র খর্ব করা বা অমর্যদা করার কোনও ইচ্ছা আমার নেই। কিন্তু এখনও এত বিপদ রয়েছে যে, ছবিটার উজ্জ্বল দিকটার দিকে চেয়ে আমরা সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। এক বিশ্বের ধারণা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক

ও মানসিক কার্যের পরিধিকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। সুতরাং গভীর দায়িত্বের সঙ্গে পরবর্তী পদক্ষেপগুলি নেওয়া উচিত। সমাজের ভবিষ্যৎ গঠনপ্রণালী, রাষ্ট্রের ভিতরের পরিকাঠামো এবং মানবিক সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধ নিহিত আছে বলে, এক রাষ্ট্রে সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের সম্পর্ক কি হবে; সে সম্পর্কে স্পষ্ট ছবি আঁকার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। এই মূল্যবোধগুলি ততখানি গুরুত্বপূর্ণ হবে যা ব্যক্তির বিবেক ও আত্মিক অনুভূতি থেকে জন্ম নিলেও যার বৈধতা বিশ্বজনীন। শুধু ব্যক্তি নয়, সমগ্র মানবজাতি, শিক্ষা নয় অন্য সকল প্রকার প্রভাব যা উদ্দেশ্যগুলিকে রূপ দেয় তাদের সকলের পক্ষে এটা এক চ্যালেঞ্জ।

'জাতিরাষ্ট্রের কতকগুলি দিক, বিশেষত যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তা চলছে তার প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। আমি শুধু দুই দেশের মানুষের সমস্যা সম্বন্ধেই নয়, বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরের রীতিনীতির সৌহার্দমূলক স্বীকৃতি সম্বন্ধেও অবহিত আছি বলে ব্যক্তির মর্যদা সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে চাপ দিয়েছিল এবং স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে নানা ধরনের সাহায্য করেছে। ভারতের সমৃদ্ধির জন্যেই তাদের এই প্রচেষ্টা। গণতান্ত্রিক রীতিনীতি স্বাধীনতার মূল্যবোধ, শান্তি ও ন্যায়ের জন্যে একত্র অনুসন্ধানের প্রতি সাধারণ আনুগত্যের জন্যে ভারতীয়রা আমেরিকাবাসীদের সঙ্গে ভাবগত আত্মীয়তার সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু স্বীকার করা ভাল কখনও কখনও ভুল বোঝাবুঝি বা মতভেদ দেখা দেয়। আমেরিকাবাসীদেরও একটা ক্ষোভ আছে যে, যথেষ্ট উদার হওয়া সত্ত্বেও তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ করা হয়। স্বীকার করা উচিত যে বিশ্বের সব দেশের উদ্দেশ্য মিশ্র হতে বাধ্য। ভারতীয়দের দিক থেকেও প্রভুত্বের ভয় ছিল এবং বাস্তবই হোক বা কল্পিত হোক, কোনও প্রভুত্ব অর্জনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ সদ্য ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত একটি জাতির পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। গণতন্ত্র দু দেশের মধ্যে শক্তিশালী বন্ধন কিন্তু, আমেরিকার শিল্প ও অর্থ সম্পদের প্রাচুর্যে উদারতা থাকলেও, ভারতীয়রা স্বাভাবিকভাবে আতঙ্কিত হতে পারে। এই ভুল অনুমানের কারণ যদি আমরা দূর করতে চাই; তবে রাজনীতি অর্থনীতি ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনার স্তরকে আরও উন্নত করতে হবে। মনে ছাপ রাখে, এমন কাজ উন্নতির চাহিদার সঙ্গে সব সময় তুলনা করলে, সাম্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করা যায় না। সমান উন্নতমানের জীবনযাত্রা আমাদের পরস্পরকে কাছে আনতে বা একত্র করতে পারে না। নিজেদের প্রতি বিশ্বস্তা, অন্যের জীবনযাত্রার প্রতি সৃজনশীলতা এবং নারী ও পুরুষের সমান অধিকার বোধ এ কাজ করতে পারে। তারপর আমরা একত্রে নম্রতার সঙ্গে আমাদের ঈশ্বর ও বিবেকের সামনে দাঁড়াতে পারি এবং আমাদের জীবন ও কাজকে পূর্ণতার জন্য সংগ্রামের প্রকাশ হিসাবে প্রতিজ্ঞা করতে পারি ....।'

যে সব ব্যক্তি তাঁদের জাতিরাষ্ট্রের নৈতিক পরিচয় পাবার প্রচেষ্টা করেছিলেন, সমকালীন আন্দোলন ও পরিস্থিতি ভারতবর্ষ সহ সর্বত্র তাদের সরিয়ে দিয়েছে। বিশিষ্ট উদাহরণ হিসাবে মহাত্মা গান্ধি ও জওহরলাল নেহরুর নাম করতে পারি; কিন্তু প্রায়শই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও গুণাবলির উল্লেখে মনে হতে পারে, তাঁরাই একমাত্র উদাহরণ। উদাহরণের বিশ্বাসযোগ্যতা দিতে এমন ব্যক্তিত্বের সন্ধান করতে হবে যাদের স্থান সবার ওপরে নয়, কিন্তু তাদের প্রভাব সর্বস্তরে ছড়িয়ে আছে। যা আরও উঁচু প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ। ইউসুফ মেহেরালি সম্পর্কে হোসেনের বর্ণনা শুনে মনে হয় যে তিনি তত্ত্বগত ভাবে যা মেনে নিয়েছেন, সেই ব্যক্তিকেই তিনি অধিকার করতে পেরেছিলেন।

'ইউসুফ মেহোরালীকে একজন খাঁটি ভারতীয় হিসাবে বর্ণনা করতে পারলে আমি সুখি ও সন্তুষ্ট হতে পারতাম, কিন্তু ভয় হচ্ছে আমি যা বলতে চাই তা বোধহয় কেউ বুঝতে পারবে না। তাকে হিন্দু বলতে পারি না কারণ, জন্ম তার মুসলিম পরিবারে। তাকে একজন মুসলিম বলতে পারি না কারণ, ধর্মীয় পরিচয়কে তিনি অস্বীকার করতেন। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে একজন সৎ মুসলিমের যে ছবি আঁকা হয়, তা এমন সৎ মুসলিমকে দেখামাত্র জীবন্ত হয়ে ওঠে। সেই ছবিকে তার সমস্ত রঙের সুষম উজ্জ্বলতায় বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। আমি একটা খসড়া দাঁড় করাতে পারি মাত্র।

'পুরানো সংজ্ঞানুযায়ী একজন সৎ মুসলিম হবেন নদীর মতো উদার, সূর্যের মতো বদান্য ও পৃথিবীর মতো অতিথিপরায়ণ। বিপদে ডাকলে তিনি সাড়া দেন। অসহায়ের প্রয়োজন পূরণ করেন। মানুষের দুঃখ ও প্রচেষ্টার মধ্যেই তাঁর দুঃখ ও প্রচেষ্টার উৎপত্তি। তিনি তাদের মধ্যেই বাস করেন এবং তার জন্যে সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করেন। যারা তাঁর ক্ষতি করেন, উদারতা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে তিনি তা পরিশোধ করেন। একজন সৎ মুসলিম বন্ধুত্ব অনুশীলন করেন, কারণ বন্ধুত্বের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক প্রকাশ পায়। একজন সৎ বন্ধু হিসাবে তিনি সেই সব সামাজিক গুণের অনুশীলন করেন যেগুলি তার অনুগামীদের প্রিয়, যেমন সুন্দর ব্যবহার, কথোপকথন, বিতর্ক ও অপরকে বিশ্বাস করানোর ক্ষমতা এবং শিল্প ও সাহিত্যকে উপভোগ করা, মানুষের গভীর বিশ্বাস আছে এবং স্বর্গীয় মহিমা প্রকাশিত হয় যে রীতিনীতির মাধ্যমে; সেগুলিতে অংশ গ্রহণ করা। সাম্যকে অনুশীলন করা তার কাছে কোনও আদেশ পালন নয়, তার সহজাত দ্বিতীয় স্বভাব যা অবদমিত করা যায় না। একজন সৎ মুসলিম শুধু আল্লাকেই ভালবাসেন; কিন্তু এমনভাবে বাসেন যে তিনি যাদের মধ্যে বাস করেন তারা ভাবে তিনি তাদেরই ভালবাসেন।

'এই সব গুণ থেকে কি ইউসুফ মেহেরালীর চরিত্র বোঝা যায়? যদি বোঝা যায়, তবে তিনি একজন সৎ মুসলিম ছিলেন এবং আমরা যদি তাঁকে স্মরণে রাখি

সেই মানুষ হিসাবে যিনি আমাদের ভালবেসেছিলেন, এবং যাঁকে আমরাও ভালবেসেছিলাম; তাবে তাঁকে অস্বীকার করা যায় না।"[4]

এর অনেকটাই হোসেন সম্পর্কে প্রযোজ্য। তাঁর মধ্যে শুধু বন্ধুত্বের উচ্চাদর্শই ছিল না। বন্ধুত্বের আদানপ্রদানকে বাস্তবায়িত করার জন্যে তিনি নিজের বুদ্ধি, সহজাত সৌন্দর্য ও উদারতা ব্যয় করতেন। বন্ধুরা অভিযোগ করতেন যে তিনি তাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছেন এবং দৈবাৎ তাদের সঙ্গে দেখা হলে, তিনি দুঃখের সঙ্গে নিজের অপরাধ স্বীকার করতেন। তিনি মনে করতেন কূটনৈতিক আচরণবিধি ছাড়াও তাঁর পদমর্য্যাদায় তিনি খোলাখুলি যাকে পছন্দ, তাকে নির্বাচন করতে পারতেন না। যারা তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী, তাদের সঙ্গে যতটা কম সম্ভব পক্ষপাতহীন ভাবে তাঁকে দেখা করতে হতো। সাধারণ ও দর্শনার্থীদের কিছু অনুরোধ বা অভিযোগ তাঁকে শুনতে হতো। এর মধ্যে রাজনীতিক এবং দায়িত্বহীন বিভিন্ন পদে কর্মরত বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও ছিলেন। তাঁর কাছে নিজেদের হতাশা জানিয়ে তারা হতাশামুক্ত হতে চাইতেন। যনি নিজের সৌজন্য, উদারতা ও ধৈর্যকে নষ্ট করতে চান না, নিজেকে রক্ষা করার জন্যে তিনি অন্য পথ খুঁজতেন। কিন্তু হোসেনের কাছে এটা ছিল চ্যালেঞ্জ এবং তিনি হার মানতে চাইতেন না। কখনও কখনও আমার সঙ্গে দেখা হলে বলতেন, হাসিটা তার মুখের এক অংশে আটকে গিয়েছে অথবা দিনরাত হাসার ফলে তাঁর চোয়াল ব্যথা হয়ে গিয়েছে, কখনও এতো দমে যেতেন যে, বলতেন তাঁর কোন বন্ধু নেই।

স্ব-আরোপিত বাধ্যতামূলক সৌজন্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই সব ব্যক্তির খোঁজ করতেন, যাদের সঙ্গে তাঁর রুচির মিল ছিল অথবা যাদের প্রতিভা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেশের জীবন ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে পারত। বহু লেখক পণ্ডিত কবি চিত্রকর বাদ্যকার ও বাগান সম্পর্কে উৎসাহী ব্যক্তিরা, তাঁকে শুধু তাঁকে মহত্ত্বের জন্যে নয়, তাদের নিজেদের কাজ ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে যে উদ্দীপনা তাঁরা পেয়েছিলেন, তার জন্যে তাঁকে মনে রাখবেন। এই সৃজনশীল ক্ষমতাগুলির জন্য প্রশংসার চাইতেও এটা জরুরি ছিল। তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুসুলভ মনোভাব আত্মনির্ভরতাকে শক্তিশালী করে। স্বীকৃতি পাবার উপযুক্ত ব্যক্তি ছাড়াও এমন ব্যক্তিরা ছিলেন, যাদের এরকম কোনও খেতাব ছিল না। আমি দিল্লি মহাবিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে জানি যাঁর উদ্ভিদবিদ্যার গবেষণায় যথেষ্ট উৎসাহের ফলে হোসেনের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটে এবং কয়েক মিনিট কথাবার্তার ফলেই ধারণা জন্মে যায়, যে উদ্ভিদবিদ্যার পরীক্ষানিরীক্ষার ব্যাপারে হোসেনের যথেষ্ট দখল

4. রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন—উৎকর্ষতার অনুসন্ধান। এ. জি. নুরানি। পপুলার প্রকাশন। মুম্বাই পৃ : 88-89

আছে এবং সর্বশেষে, কিন্তু সংখ্যায় খুব কম নয়; এমন অনেক ব্যক্তি ছিলেন যাদের সঙ্গে অনেক আগে থেকেই হোসেনের পরিচয় ছিল এবং নিজেরা এগিয়ে এসে ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা জানানো তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না; সমস্ত সমাবেশেই এই সমস্ত ব্যক্তিরা দূরে দাঁড়িয়ে তাঁকে অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে দেখতেন। হোসেন অবশ্যই তাদের উপস্থিতি বুঝতে পারতেন এবং যাঁরা স্বীকৃতি চাইতেন, তাঁদের প্রতি কর্তব্য করার সময় তাঁর ছবির চারপাশে ঘুরে বেড়াত এবং উপ-রাষ্ট্রপতি হবার আগের পরিচিত কাউকে দেখতে পেলে, বন্ধুভাবে এগিয়ে গিয়ে করমর্দন করতেন, কখনও বা বুকে জড়িয়ে ধরতেন।

তিনি রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন এরকম ঘটনার নজিরও আছে। আমার মনে আছে, 1969 সালের 9 মার্চ, তিনি আবার বাগান দেখতে আসেন। তাঁর পূর্বপরিচিত মালিটি সেদিন ছুটিতে ছিল এবং রাষ্ট্রপতির চলে যাবার সময় সে ফিরে আসে। রাষ্ট্রপতি আমাকে 'লোকটি কোথায়' জিজ্ঞাসা করেন। তাঁকে দেখার জন্যে যে জটলা হয়েছিলো তার মধ্য থেকে আমি তাকে ডেকে পাঠাই। রাষ্ট্রপতি তাকে দেখতে পেয়ে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করেন।[5]

এত সব গুণ থাকা সত্ত্বেও হোসেন কিন্তু তীক্ষ্ণ সমালোচক ছিলেন। আমি জানি না কজন আমার মতো ভাগ্যবান ছিলেন, কিন্তু যখনই আমি তাঁর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতে গিয়েছি, তার বেশিরভাগ সময়ই তিনি আমার কাছে জমে থাকা বেদনা ব্যক্ত করেছেন। বহু ব্যক্তি যাঁরা নিজেদের জন্য স্বীকৃতি, পদোন্নতি বা আরো ভাল সুযোগ চাইতেন, তাঁরা আত্মপরীক্ষার প্রয়োজন অনুভব করতেন না দেখে, তিনি বিশেষ দুঃখ পেতেন। তাদের যা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে বা যা তাদের দিতে অস্বীকার করা হয়েছে, এমন ফর্দ তৈরি করলে, প্রবণতা বা গুণ হিসাবে যা তারা চাইছে, তা পাবার অধিকারও তাদের বিবেচনা করা উচিত।[6] অবশ্য অনেককেই তাদের কাজ ও পরিকল্পনার জন্য তিনি প্রশংসা করতেন, অনেককে তিনি স্নেহ করতেন। কিন্তু তাঁর পদমর্য্যাদা থেকে উপকৃত হবার বা তাঁর কাছ থেকে সাহায্য

---

5. ভি. পি. অগ্নিহোত্রীর লেখা 'মানুষ জাকির হোসেন'—যুবকদের জন্যে জাকির হোসন স্মৃতিরক্ষা কমিটি ও সারা ভারত বয়স্কাউট কর্তৃক প্রচারিত।

6. এই প্রসঙ্গে হোসেনের বলা একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ম্যাট্রিক পাশ এক তরুণের অধ্যবসায়ের মাধ্যমে নিজের উন্নতি করার চেষ্টায় হোসেন মুগ্ধ হন। ছেলেটি চাকরি খুঁজতে এসে প্রধান মালির সহকারী হিসাবে নিযুক্ত হয়। একদিন হোসেন প্রতিটি গোলাপ চারায় নাম লেখা কার্ড ঝুলিয়ে দিতে বলেন প্রধান মালিকে। সেই তরুণ, সমস্ত গোলাপের নাম জেনে নিয়ে শুদ্ধ বানানে সেই নাম লেখা লিখতে শুরু করে। কয়েকদিন পর হোসেন অবাক হয়ে দেখেন, প্রতিটি গোলাপ চারার গায়ে নাম লেখা আছে সঠিক বানানে।

চাইবার লোকের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। যাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল তাদের তিনি তিনভাগে ভাগ করেছিলেন : একদল; যারা চাইত তিনি যেন তাদের জন্যে কিছু করেন, একদল; কিছুই চাইত না এবং সংখ্যায় খুবই নগণ্য, তৃতীয় দলটি তাঁর উৎসাহ ভাগ করে নিত এবং তাঁর জন্যে কি করা যায় চিন্তা করত। শুধু তারা কি করেছে সেই জন্যে নয়, মানুষের স্বভাবের ওপর তাঁর বিশ্বাসকে ধরে রাখতে সাহায্য করেছে বলেই, এই শেষোক্ত দলটির কাছে তিনি কৃতজ্ঞ।

অনেক অনুষ্ঠানে হোসেন এবং নেহরুকে আমি একসঙ্গে দেখেছি। প্রধানমন্ত্রীকে বেশ হালকা দেখাতো। তিনি তাঁর পদের যোগ্য অবশ্যই ছিলেন এবং জনগণের ইচ্ছা তা অনুমোদন করেছিল। তাঁর সম্মান ছিল এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরিস্থিতির প্রয়োজনে প্রয়োগ করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা তাঁর ছিল। তিনি যথেষ্ট শিক্ষিত ও ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁর মধ্যে উৎসাহ ও সহানুভূতি ছিল। তাঁর মুখ ও হাসি লক্ষ-লক্ষ মানুষকে আকর্ষণ করত। এটা প্রায় অপরিহার্য ছিল যে তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং যতদিন চাইবেন সেই পদে বহাল থাকবেন। হোসেন ছিলেন অভিজাত চরিত্রের মানুষ এবং এমন একটা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারের পদ থেকে উপরে উঠেছিলেন, যার স্বীকৃতি পেতেই কয়েক দশক লেগেছিল, কিন্তু উপরাষ্ট্রপতিরূপে তিনি অবশ্যই তাঁর পদমর্য্যাদার যোগ্য ছিলেন, যেন তিনি এই জন্যই জন্মেছিলেন। একটু দূর থেকে দুজনকে দেখে আমার মনে হতো, প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে লম্বা হওয়ার জন্যে এবং কূটনৈতিক রীতি অনুযায়ী পদমর্য্যাদায় উচ্চতর স্থানে থাকার জন্যে হোসেন বেশ অস্বস্তি বোধ করতেন।[7] সরকারি অনুষ্ঠানে কোনও কিছু বিনা বিচারে মেনে নেওয়ার শিক্ষা তাঁর ছিল না, সব সময়ই লোকে তাঁর কাছে কি আশা করছে, সে সম্পর্কে সচেতন থাকতেন এবং লক্ষ্যণিয়ভাবে চেষ্টা ব্যাতিরেকে তা পূরণের জন্যে সচেষ্ট থাকতেন। সুতরাং তাঁরা দুজন যখন একত্রে থাকতেন, তখন বয়সে কয়েক বছরের ছোট হোসেন অনভিজ্ঞ থাকার চেষ্টা করতেন। যখন তাঁরা যৌথভাবে কোনও সভা পরিচালনা করতেন তখন দ্রুত সিদ্ধান্ত আসার জন্যে তিনি সঠিক ও গ্রহণযোগ্য পরামর্শ নিয়ে ক্লান্ত প্রধানমন্ত্রীকে তৎপর করার জন্যে সর্বদাই চেষ্টা থাকতেন। হোসেন যদি রাজনীতিতে প্রবেশ করতেন তবে তিনি যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সর্বদাই সহমত হতেন ভাবলে, বেশি ভাবা হবে। তাঁরা যে পদ অলংকৃত করেছিলেন, সেখানে ছবির মতো জুটি, স্পষ্ট ও আকর্ষক বৈপরীত্যের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন।

---

7. তিনি একবার আমার কাছে অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার খুবই অসুবিধাজনক। যতবার টেলিফোনে সাক্ষাৎকারের সময় চাওয়া হয়, ততবারই বলা হয় প্রধানমন্ত্রী আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। তিনি বিব্রত বোধ করতেন, কারণ এর অর্থ প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দেওয়া।

এই সমন্বয়ের বিভিন্ন পরিবর্তনশীলতায় নিজেকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় মৃত্যু—1964 সালের 27 মে প্রধানমন্ত্রী নেহরু আমাদের ছেড়ে চলে যান। প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর চিতাভস্ম সঙ্গমে বিসর্জন দেওয়ার সময় হোসেনের ভাষণের প্রতিটি ছত্রে তাঁর বেদানর প্রকাশ ঘটেছে।

ত্রিমূর্তি ভবনে নেহরুর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণসভার উদ্‌বোধন করেন হোসেন। নেহরুর মৃত্যুর পর শোকাহত হয়ে লেখা আমার এক সহকর্মী মহম্মদ খালিকের লেখা একটি কবিতা আমি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কবিতাটি সত্যিই সুন্দর ছিল। ভাষণের শেষে হোসেন সেই কবিতাটি আবৃত্তি করতে আমি অবাক ও গর্বিত হয়েছিলাম। প্রায় তিরিশ বছর আগের এক মুশায়ারার কথা আমার মনে পড়ে গেল, যখন তিনি গোণ্ডার কবি আসগরের একটি গজল আবৃত্তি করার জন্যে হঠাৎ উঠে দাঁড়ান। কবি নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু হোসেন গজলটি পাঠ করেছিলেন, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল দুর্বল ও সুরহীন গলায় কবি কবিতাটির প্রতি সুবিচার করতে পারবেন না। গভীর আবেগে তিনি কবিতাটি পাঠ করে কবিতাটির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও তাঁর স্বরসম্পদের প্রকাশ ঘটায়। 'আমার পূজার বাসনা পূরণে আমি ঈশ্বরের করেছি সৃষ্টি' এই পঙ্‌ক্তিটি তিনি যে সুর ও ভঙ্গিতে আবৃত্তি করেছিলেন, তা আজও আমার স্মৃতিতে অম্লান।

তিরিশ বছর পরে অসুস্থতা ও বয়সের ভারে স্বর নষ্ট হলেও, হারিয়ে যাওয়া বেশ কিছুটা ছিল, ছিল সেই উত্তাপ যা দিয়ে তিনি আসগরের গজল আবৃত্তি করেছিলেন।

আইআন-ই-গালিব-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের সময় তাঁকে শেষবারের মতো সাধারণের সামনে আবৃত্তি করতে দেখেছিলাম। সেগুলি ছিল গালিবের দুটি জনপ্রিয় গজল। তাঁর আবৃত্তি প্রমাণ করেছিল যে, কবিতার প্রতি সত্যিকারের ভালোবাসা বহুব্যবহারে জীর্ণ হওয়া কবিতাকে নতুন জীবন দিতে পারে।

নেহরুর উত্তরাধিকারী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন বা 1966 সালে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর উত্তরাধিকারী নির্বাচন রাজনৈতিক ঘটনা এবং এগুলির সঙ্গে হোসেনের সরাসরি যোগ ছিল না। তিনি বুঝতেও পারেননি যে, প্রধানমন্ত্রী পদে শ্রীমতী গান্ধির নির্বাচন তাঁর উন্নতির দ্যোতক। তিনি 1964 সালে আলজিরিয়া ও মরক্কো, 1965 সালের মে-জুন মাসে কুয়েত, সৌদি-আরব, জর্ডন, তুর্কি ও গ্রীসে এবং 1966 সালের জুলাই মাসে আফগানিস্থানে শুভেচ্ছা সফরে যান। তিনি এই পদে থাকাকালীন শেষ দিন পর্যন্ত 'ভারতীয় ও ভারতের' ভাবমূর্তিকে আরও সুস্পষ্ট ইতিবাচক নির্মিত দিতে নীরবে কাজ করেছেন।

তিন : ভারতের রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যাবে না তা পরিষ্কার নয়। কিন্তু একটি রাজনৈতিক দল যখন কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষমতায় আসীন তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটি আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়। 1967 সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় কংগ্রেস দলের মতপার্থক্য ও উত্তেজনা এত তুঙ্গে উঠেছিল যে, কংগ্রেস প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে যথেষ্ট বিলম্ব হয় এবং বিরোধী দলগুলি, যারা হোসেনকে সবচেয়ে যোগ্য প্রার্থী বলে মনে করছিল তারা নিজেদের প্রার্থী দিতে মনস্থ করে।

কেন্দ্রে কংগ্রেসের গরিষ্ঠতা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কয়েকটি রাজ্যনেতৃত্বের মতপার্থক্যের জন্যেই এই বিলম্ব যুক্তি হিসাবে সম্পূর্ণ সঠিক না হলেও সর্বজনগ্রাহ্য ছিল। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তীক্ষ্ণ ও প্রকাশ্য সমালোচনা করেন। ফলে মনে করা হয়, তিনি অবসর নেবেন। তিনিও তাঁর ইচ্ছা গোপন করেননি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির বিরোধী কংগ্রেসি গোষ্ঠীর তরফ থেকে তাঁকে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। এই চক্রীরা কতদূর ইন্দিরা-বিরোধী ছিলেন, তা একমাত্র ইন্দিরা গান্ধি বলতে পারেন কিন্তু এরা এমন একজন রাষ্ট্রপতি চাইছিলেন যিনি পদমর্যাদাকে নিজের ক্ষমতা ও শক্তি সংহত করার কাজে ব্যবহার করতে পারেন। কতটা সত্য জানা নেই, তবে এ কথা প্রচার করা হয়, ড. রাধাকৃষ্ণন দ্বিতীয়বারের জন্যে উপরাষ্ট্রপতি পদে থাকবেন না; তবে রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁকে মনোনীত করা হলে কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি সেই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এই সময় তার মনোনয়ন নিয়ে বেশ কয়েক সপ্তাহ আলোচনা হয় রাজনৈতিক দলগুলির মতবিরোধের জন্যে। যাঁরা হোসেনকে পছন্দ করেন না, তাঁরা এসময় তাঁর সম্পর্কে ভিত্তিহীন কুৎসা প্রচার করেন। শেষ পর্যন্ত, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির জয় হয় এবং কংগ্রেস সংসদীয় দল 10 এপ্রিল হোসেনকে নিজেদের প্রার্থী বলে ঘোষণা করেন। 26 এপ্রিল যখন নির্বাচনী প্রচার তুঙ্গে হোসেন তখন আমেরিকা পরিদর্শনে যান এবং নির্বাচনের তিনদিন আগে দেশে ফিরে আসেন। যদিও দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে মত দেবার কথা কিন্তু কার্যত তা হয়নি। ফলাফলে দেখা যায়, দলীয় প্রার্থীরূপে নয়, হোসেন ভোট পেয়েছেন ব্যক্তিগত মহিমায়। নির্বাচনের মাহাত্ম ছিলো এখানেই। হোসেন প্রায় লক্ষাধিক ভোটে জয়ী হন। সংসদের সেন্ট্রাল হলে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি দায়িত্ব নেন 1967 সালের 13 মে। শ্রী ভি.ভি. গিরি উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।[8]

---

8. হোসেনের সঙ্গে শ্রী গিরির খুবই হৃদতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। 1959 সালে গিরি যখন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল; তখন তাঁর অতিথি হিসাবে তিনি একমাস নৈনিতালে ছিলেন।

পরবর্তিকালে একটি বিবৃতিতে হোসেন বলেন : 'গণপ্রজাতন্ত্রী ভারতের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রপতি পদে আমাকে নির্বাচিত করে যে আস্থা আমার ওপর জ্ঞাপন করা হয়েছে, তার জন্যে আমাদের জনপ্রতিনিধি, জনগণ, সমগ্র জাতির প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।'

'জাতি এই গুরু দায়িত্ব একজন সামান্য শিক্ষকের ওপর ন্যস্ত করেছেন যিনি আজ থেকে সাতচল্লিশ বছর আগে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলিকে জাতীয় শিক্ষার স্বার্থে উৎসর্গ করেছিলেন। এটা অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনে শিক্ষা প্রধানতম মাধ্যম, এবং জাতীয় মানউন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ দ্ব্যর্থহীনভাবে সেই সত্যের স্বীকৃতি এই সম্মান, বলে আমি মনে করি।

'আমার ওপর যে আস্থা প্রকাশ করা হয়েছে তার উপযুক্ত হবার নিরবিচ্ছন্ন প্রচেষ্টা চালাবো, এ প্রতিশ্রুতি আমার জনগণকে দিতে পারি। জনসেবার কাজ মহাত্মাজির পায়ের কাছে বসে শুরু করি এবং তিনিই আমার পথপ্রদর্শক এবং অনুপ্রেরণাদাতা।

'আমার জীবনে গান্ধিজির শিক্ষাকে অনুসরণ করার জন্যে সবসময় চেষ্টা করেছি। একটি সত্যিকারের সৎ জীবন ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠার জন্যে গান্ধিজির নিরলস সাধনা করেছেন। জনগণের সেবা করার যে নতুন দায়িত্ব আমি পেয়েছি তার মাধ্যমে জনগণকে নিয়ে গান্ধিজির স্বপ্ন রূপায়নের চেষ্টা করব। দুর্বল ও অবহেলিত মানুষের জন্যে সক্রিয়ভাবে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা করব, ভারতীয় জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করব, সত্য ও অহিংসার ওপর নির্ভর করে শান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের পরিবেশ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবো। গান্ধিজি এই অবস্থাকে রামরাজ বলেছিলেন।

'চারদিকে বিবাদ। আমার লক্ষ্য হবে আমাদের জনগণকে একত্রিত করা, যাতে তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যে কঠিন কাজ আমাদের সামনে পড়ে আছে; তার মোকাবিলা করতে পারে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে চরম দুর্দশা চলছে সে সম্পর্কে আমি সচেতন। খাদ্যঘাটতি আঞ্চলিক অসুখে পরিণত হয়েছে। আমাদের জনগণের সমৃদ্ধির শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।

'আমাদের জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার কঠিন কাজে পুনরায় নিজেদের উৎসর্গ করি। এই কাজে আমি নিজেকে পুনরায় উৎসর্গ করব এবং আগামিকাল সকাল সাতটার সময় আমি রাজঘাটে সেই মানুষটির সমাধিক্ষেত্রে যাব যিনি আমাকে প্রথম মানুষের সেবা করার পথ চিনিয়েছেন এবং নিজেকে দেশবাসীর সেবায় নিয়োগ করব।

'আমি আশা করি আমাদের দেশকে শক্তিশালী ও জনগণকে সুখী করার জন্য আপনারা প্রত্যেকেই নিজেকে পুনরায় উৎসর্গ করেন। এ কাজ করার জন্য ঈশ্বর যেন আমাদের প্রত্যেককে শক্তি দেন।'[9]

সুদেৎসে জিতাং নামে একটি জার্মান সংবাদপত্র ভবিষ্যৎবাণী করেছিল, নতুন রাষ্ট্রপতি স্বাধীন রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করবেন এবং সম্ভবত অনেকেই আশা করেছিলেন তিনি নিজেকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করবেন। তিনি হয়তো তাই করেছিলেন, কারণ মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিতেই দ্বন্দ্ব প্রকাশ হয়ে পড়ে। যে পরিস্থিতির মধ্যে তাঁকে কাজ করতে হতো সে বিষয়ে কোনও নথিপত্র পাওয়া যায়নি। তিনি মাঝে-মাঝে আমাকে বলতেন, তাঁর অভ্যাসমতো তিনি এমনভাবে কথাবার্তা বলেন যে, শ্রোতাকে অনুমান করতে হয় এবং এভাবেই তিনি সংবিধানপ্রদত্ত মহান দায়িত্ব পালন করছেন। তবে তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের পক্ষে সম্পর্কহীন হয়ে থাকা সম্ভব হয় না। আমরা মনে করতে পারি, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সংহতির বাতাবরণ তৈরি করা তিনি নিজের দায়িত্ব বলে ধরে নিয়েছিলেন। নির্বাচনের পর তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সারা জীবন ধরে দেশের সেবা করার জন্যে তিনি সমগ্র জাতির শ্রদ্ধা ভালবাসা ও শুভেচ্ছা অর্জন করেন।[10] কোনও সন্দেহ নেই এগুলি প্রধানমন্ত্রীর মনের কথা। তাঁকে জিতিয়ে আনার জন্যে প্রধানমন্ত্রী যথেষ্ট করেছিলেন। তাঁকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করে প্রধানমন্ত্রী আনন্দ পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব কাজের ঢঙের মতো তার নিজস্ব কিছু ভাবনাও ছিল। তিনি হোসেনের কথা শুনতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কাছে বা কংগ্রেস দলে, তাঁর বিরোধীদের কাছে হোসেনের কথা শোনা বা না শোনা, যথেষ্ট পার্থক্যের সৃষ্টি করত।

রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সন্দেহ নেই, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও কোনও সাড়া পড়েনি কারণ, সংবাদমাধ্যম বিষয়টি জানতে পারেনি। অনেক এও জানেন না যে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার পরই তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। এর পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সুপারিশে একের পর এক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের প্রতি বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে যাবজ্জীবন দণ্ডাজ্ঞা প্রয়োগ করেন। কিন্তু বিতর্কের সৃষ্টি হয় যখন হোসেন শ্রীঙ্গেরীর শঙ্করাচার্য ও মুনি সুশীলকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 13 মে স্টেটসম্যান পত্রিকায় একটি প্রতিবেদনে বলা হয় :

'জগদ্গুরুর পাদদেশে ফুল ও ফলের নৈবদ্য দিয়ে জাকির হোসেন বলেন, 'আপনার আর্শীবাদ প্রার্থনা করছি।' শঙ্করাচার্য নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির মাথায় হাত রেখে আর্শীবাদ করেন।

---

9. এ. জি. নুরানি। রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন : উৎকর্ষতার অনুসন্ধান। পৃ 104
10. ওই।

'আশীর্বাদপর্বের পর ড. হোসেন ও স্বামীজি দশ মিনিটের মতো নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করেন। এরপর স্বামীজির পা স্পর্শ করে তিনি শ্রদ্ধা জানিয়ে সেখান থেকে বিদায় নেন।

'জৈন মুনি সুশীলকুমারের আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে ড. হোসেন তাঁর আশ্রমে যান।

'ড. হোসেন সাধারণ একটি শতরঞ্জি ওপর বসেছিলেন। মুনি বসেছিলেন কাঠের চৌকির ওপর। তাঁরা দুজনে পাখাবিহীন একটি ঘরে প্রায় মিনিট কুড়ি ছিলেন।'

এই প্রতিবেদনে তথ্যবিকৃতি ছিল। জাকির হোসেন স্বয়ং এক বন্ধুকে বলেন, তিনি শঙ্করাচার্যের পায়ের কাছে ফুল দিয়েছিলেন। কিন্তু কেন তিনি ওখানে গিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে একটি কথাও বলেননি। জিজ্ঞেস করে আমি কোনও জবাব পাইনি. তাঁর অভিব্যক্তি দেখে আমার মনে হয়েছিল তিনি চাইছেন, আমি যেন নিজের মতো করে কারণটা ব্যাখ্যা করি।

তিনি কি রাধাকৃষ্ণানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন, যিনি শঙ্করাচার্য দিল্লি এলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন? তিনি কি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জনে আগ্রহী হয়েছিলেন? লোকে যাকে দেবতা বলে ভাবে এমন মানুষকে শ্রদ্ধা জানাবার অভ্যাস কি তাঁরা ছিল? প্রশ্নগুলির কোনও একটির সদর্থক জবাব আংশিক সত্য ছিল। ঘটনাটি, রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার পর তাঁর চিন্তাভাবনার পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। এই ধারণা কম বিশ্বাসযোগ্য ছিল তাঁর কোনও পরিবর্তন হয়নি; আমার এই মতের তুলনায়।

1920 সালে তাঁর বন্ধুরা মহাত্মা গান্ধি সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করেন। সেই থেকে তাঁর মন তিক্ত হয়েছিল। আমার মনে হয় শঙ্করাচার্যের কাছে যাওয়ার সঙ্গে এই ঘটনার যোগ আছে। মুসলিমদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকার বজায় রাখার জন্যে তখন থেকে তিনি যথেস্ট সাহসে নিজেকে তুলে ধরেন। হিন্দুদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকারকে মুসলিমদের স্বীকার করা উচিত বলে, তিনি মনে করলেও। তাঁরা তা করতে অস্বীকার করেন। সন্দেহ নেই এর মানসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ ছিল শুধুমাত্র উগ্র হিন্দু প্রতিক্রিয়াশীল কিছু ব্যক্তি নন, বেশ কিছু শিক্ষিত রাজনীতিবিদ মুসলিমদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতেন। সবচেয়ে প্ররোচনামূলক ছিল এই বক্তব্য, হিন্দুদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মুসলিদের অস্বীকার করা কম অপরাধ নয় বরং মুসলিম মহত্ত্বের পরিপন্থী হৃদয়ের কাঠিন্য ও হিংস্রতা সবসময় মুসলিম ঐতিহ্যবিরোধী। একজন সাধারণ মানুষ

হিসাবে, জামিয়া মিলিয়ার উপাচার্য হিসাবে, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে মুসলিমদের এই দৃষ্টিভঙ্গি পালটাবার জন্য হোসেন সম্ভাব্য সব চেষ্টাই করেছিলেন। হিন্দু জীবনযাত্রার প্রতি রাজ্যের প্রধান হিসাবে তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশের প্রথম সুযোগ আসে বিহারের রাজ্যপাল নিযুক্ত হবার পর। এজন্যে মুসলিমরা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই মনে করতেন এমন গুরুত্বপূর্ণ পদের সুযোগ নিয়ে মুসলিমরা যে সমস্ত অধিকার দীর্ঘদিন ধরে দাবি করছেন, সেগুলিকে তিনি স্বীকৃতি দিতে পারতেন। তিনি যখন উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, তখনও এমন আশা করা হয়। অপরদিকে অমুসলিমরা তাঁর প্রশংসা করতেন এবং তাঁর ওপর আস্থা রাখতেন; কারণ তাঁরা মনে করতেন প্রকৃত মুসলিম মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্ব করতেন তিনি। দেশের মানুষের মন থেকে হিংসা দূর করার জন্যে তাঁর গুরু গান্ধিজি অনশন করেছিলেন। কিন্তু তিনি কি করবেন? সেজন্যে, নিজ সম্প্রদায়ের হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি শঙ্করাচার্য ও মুনি সুশীলকুমারের সঙ্গে দেখা করেন। সাধারণভাবে মুসলিমরা বিরক্ত হয়েছিল, কারও কারও মধ্যে ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ দেখা দিয়েছিল, বেশ কিছু মুসলিম ঘোষণা করেছিলেন তাঁর প্রতি তাঁরা সমস্ত শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছেন। ইদ প্রার্থনায় যোগ দেবার জন্যে যেদিন তিনি প্রথম জামা মসজিদে গেলেন, সেদিন তাঁর চারপাশে প্রচুর মানুষ জড়ো হয়, আলিঙ্গন করার জন্যে। এমন আন্তরিক সৌভ্রাতৃত্বের প্রকাশ তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করে, কিন্তু সমালোচনা অব্যাহত থাকে। নির্বাচনের প্রায় এক বছর পর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। জনৈক মুসলিমদের লেখা একটি নোংরা চিঠি পেয়ে তিনি খুব বিচলিত ছিলেন : 'মানুষ এখন জিভের ঝাল মেটাচ্ছে!' তিনি আমায় বলেন। তারপর গালিবের একটি কবিতা আবৃত্তি করেন :

> সত্যি কথা বলার জন্যে অজ্ঞরা
> আমার ওপর গায়ের ঝাল মেটাচ্ছে;
> হে ভগবান! বিচারকরা কী প্রাণদণ্ড
> ও ফাঁসির দড়ি বর্জন করেছে?

দেশের সর্বোচ্চ পদে আসীন হয়েও হোসেনের শুরুটা ভাল যায়নি। দুঃখের বিষয়, ক্রমানুসারে এই ঘটনা প্রথমে ঘটেছিল। তাছাড়া, অন্যভাবে শুরু করলে, হোসেনকে ভুল ব্যাখ্যা করা হতো। উচ্চাশা পূরণ হলে বলে আনন্দ করার লোক তিনি ছিলেন না। গুরুত্বপূর্ণ পদপ্রাপ্তি সম্পর্কে যদি তাঁর কোনও উচ্চাশা কখনও

থেকেও থাকে; সম্মানবৃদ্ধির অর্থ সব সময় তাঁর কাছে আনুষ্ঠানিক মর্যাদার সঙ্গে ব্যক্তিগত নম্রতার,[11] ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির সঙ্গে বিচারের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা, সর্বোচ্চ পদপ্রাপ্তির সচেতনতার সঙ্গে নিজের সমীবদ্ধতা ও জনগনের ক্ষতি সংমিশ্রনের দায়বদ্ধতা বোঝাতে। এই দায়বদ্ধতা সফলভাবে পালন করার মধ্য দিয়ে তাঁকে আলাদাভাবে চেনা যায়। যে জন্যে তিনি সারা জীবন পরিশ্রম করেছেন, সেই প্রকৃত ভারতীয় হিসাবে তিনি নিজেকে তৈরি করতে সমর্থ হন।

পাতিয়ালার পাঞ্জাবি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরু গোবিন্দ সিং ভবনের শিলান্যাস করতে গিয়ে 1967 সালের 27 ডিসেম্বর প্রদত্ত ভাষণটি প্রকৃত ভারতীয় মূর্তি গড়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যেন একটি গদ্য কবিতা। এটি লেখার সময় তিনি কেঁদে ফেলেন, শ্রোতারাও চোখের জল ধরে রাখতে পারে নি।[12] হৃদয়-উজাড়ী শাশ্বত ভালবাসা এবং প্রেমিকের চোখের জলে মুক্তার নিদর্শন ছিল লেখাটি।

'আজ আপনাদের মধ্যে আসতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে। গুরু গোবিন্দ সিং ভবনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। অমৃতসরের দরবারসাহেব ভবনের শিলান্যাস করেন ঈশ্বরপুত্র হজরৎ মিয়াঁ মির ওয়ালি; এ কথা শুনে লজ্জায় আমি মরে যাচ্ছি। এ ধরনের কাজের সঙ্গে আমার মতো পাপীর নাম যুক্ত হয় কি করে? স্বর্গীয় পৃথিবীতে ধূলার কী সম্পর্ক?

"ঠিকই, কিন্তু বিশ্বাসের পৃথিবীতে মহান ব্যক্তির মহত্ত্ব সাধারণ মানুষের ভুল সংশোধনের কাজে লাগে; এই মহান পদে আমার আন্তরিক সংহতিবোধ এবং কাজ করার ইচ্ছায় হয়তো, আপনারা অনুগ্রহ করে সন্ন্যাসী সান্নিধ্যে আমায় নিয়ে এসেছেন। উপাচার্য মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছেন, যে দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন, আমি যেন সেই কাজে সীমিতভাবে হলেও সফল হই, এই কামনা করি।

---

11. তাঁর মেয়ে সাইদা আমায় জানিয়েছিল যে 1969 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইনফ্লুয়েঞ্জা আক্রমণ থেকে সেরে ওঠার পর ডাক্তার তাঁকে সামান্য হাঁটাহাটি করার কথা বলেন। সে সময় ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও এ ডি সি সহ কয়েকজনের সঙ্গে তিনি বাগানে বেড়াতে বের হন। ভ্রমণপথে যেখানেই বসার জায়গা পাওয়া গেছে, সেখানে তাঁকে সামান্য বিশ্রাম নেওয়ার অনুরোধ করা হয়। সেই অনুরোধ না শুনে তিনি একনাগাড়ে হেঁটে বেড়ান এবং গাছগাছালি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। ঘরে ফিরে আসার পর তিনি বিশ্রাম নিয়েছেন কিনা জানতে চাওয়া হলে, তিনি বলেন, 'কেমন করে বিশ্রাম নেব'? কোথাও চার পাঁচজনের বেশি বসার জায়গা ছিল না অথচ আমার সঙ্গে আটজন ছিল।'

12. 6 জুলাই 1969; ইলাসট্রেড উইকলি অফ ইণ্ডিয়া।

'একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশংসনীয় কাজে হাত দেবার জন্যে আমার হৃদয় উজাড় করা অভিনন্দন গ্রহণ করুন। অন্য যে কোনও জায়গার চাইতে আমাদের দেশে ধর্ম সম্পর্কে তুলনামূলক শিক্ষা ভালভাবে সংগঠিত করা যায়। অথচ অন্যত্র এ বিষয়ে অনেক কাজ হয়েছে, আর আমরা সবে শুরু করছি। কিন্তু আমি নিশ্চিত আমরা শুরু করলে দ্রুত উন্নতি করব। বিবিধের মাঝে মিলন, পরমতসহিষ্ণুতা এবং সংহতি আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আমাদের দেশ, আমাদের জীবন এইভাবেই গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশ, আমাদের জীবন সম্পর্কে কিছু ধারণা দেবে এই ভবন। একজন ভারতীয় দেশের সঙ্গে তার সম্পর্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে তখনই, যখন সে নিজের দেশ, নিজের ঘর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়। মাতৃক্রোড়ের উষ্ণতা ও আরাম শিশুর ঘর, যখন সে বড় হয়, তখন বাবা-মা যেখানে থাকে সেটাই তার ঘর। পরে গোটা গ্রাম বা পার্শ্ববর্তী শহর তার বাড়ি বলে মনে হয়। এরপর তার পারিপার্শ্বিক যে গাছগুলোকে সে চিনতে শিখেছে, পাখির কলতান, জন্তুজানোয়ার, যে মানুষের মুখ প্রত্যহ দেখতে অভ্যস্ত, সবই—তার বাড়ির আসবাব হয়ে ওঠে। কালক্রমে এই ঘর শুধু মাত্র পার্থিব দ্রব্যে নয়, ভাব ও ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন মানুষ তাদের মানসিক ও আত্মিক শক্তিকে নিয়োজিত করে গড়ে তোলে সংস্কৃতিকে। বিশ্বাস শিল্পকলা সাহিত্য ইতিহাস মানুষের বাণী, তাদের কাজের স্মৃতি ইত্যাদি বহু কিছু মিলিয়ে গড়ে ওঠে সেই বাড়ি। এরপর আসে বাড়ির সামনে বাগিচার কথা। গোটা দেশ সেই বাগিচা। দেশের মানুষ একই পরিবারের সদস্যের মতো বাড়িটিকে মনে করে। রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্র নীতিবোধ ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি চালিত মানুষের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক সম্পদ নিয়ে সেই বাড়ি বিকশিত হয়। মায়ের কোল, গ্রাম শহর, নিকটবর্তী ছোট ছোট পাহাড়, ছোট নদী, তারপর প্রদেশ, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা একই বিশ্বাসের মানুষ, ধীরে ধীরে সেই বাড়ির চৌহদ্দিতে প্রবেশ করে। হিমালয় ও বিন্ধ্য, গঙ্গা ও যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, কৃষ্ণা, কাবেরী, বদ্রিনাথ ও রামেশ্বরম, দ্বারকা ও পুরি, রাম ও কৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ ও ভগবান মহাবীর, শঙ্করাচার্য ও রামানুজ, অশোক ও আকবর, নানক, কবির, গোবিন্দ সিং, আজমিরের মৈনুদ্দিন খাজা নাজিমুদ্দিন, সুরদাস, তুকারাম ও মীরাবাঈ, কালিদাস ও তুলসিদাস, গালিব ও আনিস, ভাল্লথিল বা রবীন্দ্রনাথ, গান্ধি ও আবুল কালাম, জওহরলাল নেহরু সহ আরও অনেককে নিয়ে গড়ে ওঠে সেই বাড়ি। মায়ের কোলে একটি শিশু যে আনন্দ উষ্ণতা সান্ত্বনা শক্তি পায় এরাও তা দিতে পারে। এই বৃহৎ পরিবারে সেই একই অনুভূতি, একই ভালবাসা, হৃদয়ে দেশের সেবা করা ও দেশকে রক্ষা করার আকাঙ্ক্ষা যা একমাত্র মাতৃসেবার সঙ্গে তুল্য বিরাজ করে। আমি আশা করি, গুরু গোবিন্দ-ভবন আপনাদের মনে এবং চিন্তায় জাতীয়তাবোধ জাগরিত করবে। আমার

বিশ্বাস আছে, যারা এখানে কাজ করবেন এবং এখান থেকে যারা উপকৃত হবেন, সবাই যে মহান ব্যক্তির নামে এই ভবন তাঁর মহত্ত্ব ও ব্যক্তিত্ব অর্জন করবেন।

গুরু গোবিন্দ সিং-এর জীবন ত্যাগ পরিশ্রম শিক্ষামূলক কাজকর্ম সামরিক জ্ঞান সাংগঠনিক দক্ষতা, শৌর্য, দয়া এবং অতলস্পর্শী ভালবাসার ইতিহাস। কি অপূর্ব বীরত্ব এবং শৌর্যে তিনি কঠিন সমস্যাসমূহের মোকাবিলা করেছিলেন সে কথাও উল্লেখযোগ্য। যদি কেউ ভাবেন পরিশ্রম ছাড়া সাফল্য পাওয়া যায়, তবে এই জীবনকাহিনী তাকে মনে করিয়ে দেবে, সহজে কখনও সুন্দর মহৎ জীবন পাওয়া যায় না। গুরু গোবিন্দর মতো সাহসী ব্যক্তিত্বময় মানুষ বেশি জন্মান না, তিনি ভগবানের কাছে নিজের সব কিছুই উৎসর্গ করেছিলেন, আলোর দিশারী তাঁর বাবা, তাঁর প্রিয় সন্তানেরা। সন্তানের চেয়ে প্রিয় সাহসী সহযোদ্ধা, সব কিছুই তিনি উৎসর্গ করেছিলেন। জীবনের অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি ভবঘুরের জীবন যাপন করেছিলেন। অনেক কষ্ট তিনি নির্মোহ ও আনুগত্যহীনতাকে দীর্ঘদিন সহ্য করেছিলেন এবং শেষ নিবেদন হিসাবে, নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। কোনও কিছুই তার পর্বতদৃঢ় সাহস ও মনোবলে ফাটল ধরাতে পারেনি। যে কোনও বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে উদ্দেশ্য সাধনে এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির ইচ্ছা ইতিহাস অপূর্ণ রাখে না। পার্বত্য রাজাহারদের ধারাবাহিক শত্রুতা, চক্রান্ত, বিরোধিতা, হিংস্রতা স্থানীয় আধিকারিকদের অপদার্থতা, গর্বিত মুঘল সম্রাটের অজ্ঞতা; এ সব কিছুর বিরুদ্ধে তাঁকে সিংহ বিক্রমে লড়াই করতে হয়েছিল। তিনি এমন এক সম্প্রদায়ের মানুষ তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যারা যা কিছু ভাল, যা কিছু সত্য তা রক্ষা করবে, হিংস্রতা ও নিপীড়ণ থেকে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে রক্ষা করবে, যারা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হবে এবং একমাত্র সেই ঈশ্বরের কাছেই নিজেকে সমর্পণ করবে, অন্য কাউকে ভয় করবে না। তারা সত্যিকারের বিশ্বাসী হবে। প্রতিষ্ঠিত হলো খালসা। চিরস্থায়ী যার অবদান। এই অবদানের জন্যে তার নাম ইতিহাসে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। শুধু ইতিহাসের পাতায় নায় মানবজাতির হৃদয়ে তার নাম অম্লান হয়ে থাকবে। মানুষের মনে জাগবে উচ্চ আশা, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, ভগবানের প্রতি আস্থা। তারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।

'যতদিন মানুষের মনে দ্বেষ ও হিংসা থাকবে, যতদিন মানুষ অন্যায় ও অবিচারে বলি হবে, যতদিন শক্তিমানের ক্ষমতা মানুষের বিবেককে শুদ্ধ করে রাখবে, যতদিন রাজনৈতিক কাজকর্মে অন্যায় ও নীতিহীনতা থাকবে, যতদিন ধর্মীয় গোঁড়ামি থাকবে, ততদিন সারা পৃথিবী গুরু নানক ও তাঁর যোগ্য শিষ্য গুরু গোবিন্দ সিংকে ভুলতে পারে না।

'আপানারা এই প্রতিষ্ঠানের নাম গুরু গোবিন্দ সিং-এর নামে রেখেছেন। তাঁর চারিত্রিক গুণে এই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম অনুপ্রাণিত হোক।'

উপ-রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের তুলনায় রাষ্ট্রপতির প্রকাশ্য মত প্রকাশের সুযোগ অনেক কম। এমনকী ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তাঁকে অনেক কৌশলী হতে হয়। কিন্তু যে কোনও ভারতবাসীকে বলা যায়, তিনি তাঁর দেশের আশা ভরসা। এই প্রশস্তি রাজনৈতিকভাবে খুব কার্যকরী হতে পারে অন্য কারও কোনও ক্ষতি না করে। যদি তা কোনও রাজ্য সম্পর্কে বলা হয়। তিনি বিহারকে ভারতের হৃদ্‌পিণ্ড বলেছিলেন। আমি শুনেছি, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীকে বলছেন, তার রাজ্য ভারতের আশার প্রতীক। অতি সম্প্রতি মহীশূরের এক মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সময় একই প্রশস্তি তাঁর রাজ্য সম্পর্কে করেন। আন্তর্জাতিক তামিল সম্মেলনে তাঁর ভাষণ প্রত্যেক তামিলকে তাদের ভাষা সংস্কৃতি ও দেশপ্রেমের জন্যে গর্ববোধ করতে শেখাবে। একথা প্রমাণ করার জন্যে যথেষ্ট দলিল আমার হাতে নেই, তবু একজন উত্তরের রাষ্ট্রপতি যখন দক্ষিণের সাংস্কৃতিক অবদানের প্রশংসা করেন তখন, উত্তর-দক্ষিণ মতপার্থক্য দ্রুত কমে আসে।

তিনি যদি পূর্ণ মেয়াদ রাষ্ট্রপতি থাকতে পারতেন তা হাল তাহলে তাঁর বিদেশ ভ্রমণ ভারতের ছবি বিদেশে সার্থকভাবে তুলে ধরতে সাহায্য করত। 1968 সালে সোভিয়েত ভ্রমণ তাঁর বহুদিনের আশা পূর্ণ করে। ওযাপর্নার সোমবার্টের ছাত্র হিসাবে তিনি অর্থনৈতিক উন্নতি ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে ব্যাপক চর্চা করেন। যার ফলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও মার্কসবাদের পিছনে বাস্তব সত্যকে বুঝতে তাঁর সুবিধা হয়েছিল। মনেপ্রাণে তিনি একটি সমবায়ী সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গড়তে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু হালকা কথাবার্তা, ভ্রান্ত পরিকল্পনা, প্রয়োগে গাফিলতির জন্যে তা বাস্তবায়িত হয়নি। সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে আমাকে কোনওদিন কিছু বলেননি। আবার আমি জানি তাঁর আদর্শ সম্পর্কে কোনও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। তিনি কখনও সোভিয়েত রাশিয়ার আশ্চর্যজনক সাফল্য সম্পর্কে কোনও সন্দেহ প্রকাশ করেননি। যদিও মার্কসবাদকে তিনি পরিপূর্ণভাবে মেনে নিতে পারেননি। যে সোভিয়েত বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতরা ভারতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তিনি তাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। ভারত সোভিয়েত মৈত্রী ও সহযোগিতার প্রশ্নে রাজনীতিবিদদের চাইতে অনেক বেশি কথা বলেছিলেন তিনি।

সরকারি ও কূটনৈতিক অনুষ্ঠান ছাড়া তিনি বেশিরভাগ সময় সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করতেন। এর ফলে তাঁর ওপর খুব চাপ পড়ত। কিন্তু খুব দ্রুত তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতেন। প্রায়ই আক্ষেপ করে বলতেন, তাঁর কোনও বন্ধু নেই; কিন্তু সব সময় তিনি মহত্তম কিছু খুঁজে বেড়াতেন এবং কোথাও তা দেখতে পেলে তার প্রশংসা করতেন[13]। গোলাপ-প্রিয় হোসেনের অনুরাগী ছিলেন অসংখ্য।

13. 1968 সালের অক্টোবর মাসে নেপাল থেকে ফেরার সময় ভারতীয় দূতাবাসের সচিব ও ধোপার হয়ে রাষ্ট্রদূতের কাছে সুপারিশ করেন।

শ্রীমতী কান্তা ডোগরা তাঁর ব্যক্তিগত ঘরগুলি ইকাবনা পদ্ধতিতে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিতেন। শিল্পীরা সব সময় তাঁর কাছ থেকে সৃষ্টিকার্যে অনুপ্রেরণা পেতেন। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট আয়োজিত বইমেলা উদ্‌বোধন করার জন্যে তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়। ঘুরতে-ঘুরতে তিনি হালকাভাবে জানতে চান মাকতবা জামিয়া প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছে কিনা। অংশ নিচ্ছে শুনে, তিনি মাকতবার স্টলে যান এবং তাঁদের বই সাজানোর পদ্ধতি এবং স্টলের সৌন্দর্যবিন্যাস দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। এই প্রকাশনা বিভাগ সহ জামিয়া মিলিয়া তৈরি করার কথা হয়তো তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল। স্মৃতি ভারাক্রান্ত মনে তাঁর চোখে আনন্দের অশ্রু দেখা দিল।

আমার মনে আছে 1947 দাঙ্গার সময় জামিয়া মিলিয়া ছেড়ে চলে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। সে সময় হোসেন আমাকে বলেছিলেন, আমরা সব কিছু এমন ভাবে রেখে যাব, যাতে যারা দখল করবে তারা যেন ভাবতে পারে আমরা প্রত্যেকটা জিনিসই ভালবাসতাম। দুজন সহকারী সহ আমার ওপর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল বাগানের গাছগুলিকে সুন্দর করে ছাঁটার জন্যে। যেখানেই তিনি কিছুদিনের জন্যে বাস করেছেন, সেখানেই এই নীতি অনুসরণ করেছেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ও উপাচার্যের বাড়ি, ওকলায় নিজের বাড়ি, পাটনা রাজভবন, 6 মৌলানা আজাদ রোডের বাংলো, সর্বত্রই এই নীতির প্রয়োগ দেখা যায়। এমনকী যেখানে কোনও কিছুরই অভাব নেই, সেই রাষ্ট্রপতিভবন তাঁর সময়ে ভিন্ন দেখতে লাগত। বাগানের প্রতিটি গাছে গৃহকর্তার পরিচর্যার ছাপ ছিল, বিভিন্ন ধরনের গোলাপগাছের বিন্যাসে অপূর্ব সমারোহ ছিল, লতানো ফুলগাছে এবং জীবাশ্ম সহ বাগানের চাকচিক্য অনেক বেড়ে গিয়েছিল। উত্তর দিকের করিডোরে পুরোনো আমলের ছবিগুলির পাশে নতুনভাবে সাজানো হয় সুন্দর হাতের লেখার কারু-কাজ।

1969 সালের 3 মে হোসেন অনেক সুস্থ বোধ করছিলেন। কয়েকদিন আগে আসাম ও উত্তর পূর্বাঞ্চল ভ্রমণজনিত ক্লান্তিতে তিনি ভুগছিলেন। দিনের কাজ স্বাভাবিকভাবেই শুরু করেন। নিয়মমাফিক পরীক্ষার জন্যে তাঁর চিকিৎসকদের আসার কথা। সকলে এগারোটার মধ্যে তাঁরা এসে গেছেন। হোসেন চিকিৎসকদের একটু অপেক্ষা করার অনুরোধ জানিয়ে বাথরুমে গেলেন। চিকিৎসকরা অপেক্ষা করছেন, কিন্তু তিনি আসেন না। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে অধ্যাবসায়ের সঙ্গে তাঁর সেবা করে আসছে ইশাক। সে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করে। কোনও সাড়া না পেয়ে সে দেয়াল বেয়ে উঠে ঘুলঘুলি দিয়ে দেখতে পায়, তার প্রভু দরজার সামনে পড়ে আছে। দরজা খোলার সময়ই তাঁর মৃত্যু হয়। চিকিৎসকরা আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু জীবনস্পন্দন আর ফিরে আসেনি। দুঃখের খবর প্রচারিত হলো; রাষ্ট্রপতি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

জীবনের অন্ধকারের পরেই প্রভাতের খবর আসে
মোমবাতির পলতের আড়ালে সূর্য হাসে।

সারা দুনিয়া শোকস্তব্ধ। রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদায় তাঁর মরদেহ শায়িত। সমস্ত রাষ্ট্রের বিশিষ্ট, হাজার হাজার স্বদেশবাসী শেষশ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন। দুদিন পরে সামরিক মর্য্যাদায় শেষকৃত্য অনুষ্ঠান পালিত হয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি শৃঙ্খলার কথা বলতেন; তাই জনসমুদ্র সে-দিন সুশৃঙ্খল ছিল। ভারতে, এমনকী মুসলিম ইতিহাসে এই প্রথম, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে ব্যাপক সংখ্যক মহিলা, মুসলমান রীতি অনুযায়ী তাঁর কবরে তিন মুঠি মাটি দান করেন। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে মানবিক উৎকর্ষতা এবং ঐক্যবদ্ধভাবে ধর্মীয় আচরণ ও শ্রদ্ধা জানানোর আদর্শ প্রচার করতেন। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে মানুষ সেই আদর্শকে বাস্তবায়িত করেন।

জামিয়া মিলিয়া প্রাঙ্গণে তাঁকে কবর দেয়া হয়েছে প্রায় 100 ফুট ব্যপ্ত প্রাকৃতিক ভাবে উন্নীত সমতল স্থানে। পর্বদিকে আছে একটি বিদ্যালয়, উত্তরে মসজিদ এবং পশ্চিমে একটি পাঠাগার। এর থেকে সুন্দর আর কোনও জায়গা হতে পারে না। জীবনের পক্ষে, মনের বিকাশ যা কিছু অর্থবহ, জ্ঞান ও প্রার্থনার পক্ষে সহায়ক চার ধারে, সেই সব কিছু নিয়ে তিনি চিরশান্তিতে শায়িত। □□

Lasertypeset at Laser technograph, Calcutta and printed at India International Press, New Delhi-110028